অনীক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ৩-৪

যোগাযোগ (হাতে ও ডাকে):
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ :
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহক-সংক্রান্ত : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫
৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী।
কলকাতা ৭০০ ০০৯
(ডাক যোগাযোগের জন্য নয়)

❑মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

ভারতীয় কৃষির চরিত্র ও গ্রামীণ সমাজ

আজকের পুঁজিবাদী সমাজকে অপরিবর্তিত রেখে বা কিছু মাজাঘষা করেই মানুষের মুক্তি সম্ভব —এমন কথা কোনো যুক্তি-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সমাজ-পরিবর্তনের আবশ্যিকতার ও সেজন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে ওঠে। আর সেটাই হচ্ছে সমস্যা! কারণ কোনো সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সেই সমাজ সম্পর্কে সম্যক গভীর উপলব্ধি গড়ে তোলা দরকার— যে কাজটা শুধুমাত্র সেই দেশের সমাজ-সচেতন মানুষেরা, বিশেষত ওই লক্ষ্যে অনুশীলনরত বিপ্লবীদের পক্ষেই করা সম্ভব, এবং সেটা বিপ্লব-সফল অন্য কোনো দেশের অনুকরণ করে সম্ভব হতে পারে না। তাহলে, আমাদের দেশে বহু দিন আগেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেতো।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজকে উপলব্ধি করতে গেলে সুনিশ্চিতভাবেই প্রাথমিক গুরুত্ব পেয়ে যায় কৃষির প্রশ্নটি। কারণ এখনও আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি মানুষ কৃষির সাথে সম্পর্কিত, এবং গত দুই দশকের বিশ্বায়ন কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি সংকটগ্রস্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রটিই। তাই ভারতীয় কৃষির চরিত্র কী—এই প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক বিভিন্ন সময়ে বার বার নতুন করে সামনে এসেছে। বিগত ষাটের দশকের ব্যাপক গণআন্দোলনের অভিঘাতে এবং এই প্রশ্নে সদ্য-বিভাজিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রেক্ষিতে বিতর্কটি প্রায়োগিক রাজনীতি ছাড়িয়ে অ্যাকাদেমিক জগতেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। আবার নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় 'আধা-সামন্ততন্ত্র' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক গড়ে ওঠে। এবং অতি সম্প্রতি বিশ্বায়নের দুই দশকের পটভূমিকায় ভারতীয় কৃষির অন্তর্নিহিত পুঁজিবাদী উপাদান সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে কিনা, তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুধুমাত্র সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে অনুশীলনরত কর্মীদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই, তা আবার ছড়িয়ে পড়েছে সমাজ-সচেতন মানুষদের মধ্যে, বিশেষত অ্যাকাডেমিক মহলেও।

এই পটভূমিকাতেই অনীক এই বিশেষ সংখ্যাটির পরিকল্পনা করেছে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাবার লক্ষ্যে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক' কৃষির যে ব্যাখ্যা উঠে এসেছিল, দু'দশক সংস্কার কর্মসূচি চলা সত্ত্বেও সেই ব্যাখ্যারই ধারাবাহিকতা। আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ভারতে কৃষিতে মূলত পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে একটি অভিমত হচ্ছে আধা-সামন্ততন্ত্রেরই স্বাভাবিকভাব বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রণোদনায় পুঁজিবাদে রূপান্তর ঘটেছে। এর আরেকটি রকমফের হচ্ছে আধা-সামন্ততন্ত্র ক্রমশ পুঁজিবাদের কাছে হটে গেলেও, সংস্কার-কর্মসূচির চাপে পুঁজিবাদের বিকাশ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রাসঙ্গিক আরেকটি অভিমত হচ্ছে কোনোদিনই ভারতে আধা সামন্তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল না, অর্থাৎ প্রথম থেকেই পুঁজিবাদী বিকাশ প্রধান ভূমিকা নিয়ে এসেছে। এই সবগুলি দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতই আমরা বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমরা শুরু করেছি অ্যাকাদেমিক ক্ষেত্রে সত্তরের দশকের প্রাসঙ্গিক বিতর্কের অন্যতম পথিকৃৎ অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ীর তখন প্রকাশিত একটি লেখা দিয়ে। তাঁকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম লেখাটিকে 'আপডেট' করার জন্য। কিন্তু ওই বিষয়ে অনেক দিন চর্চার বাইরে থাকায় তিনি তা করতে চান নি, কিন্তু আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি 'সংযোজন' লিখে দিয়েছেন। সেটিও আমরা প্রকাশ করছি।

পরবর্তী লেখাটি প্রখ্যাত কৃষি-অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়েকের। তাঁর বক্তব্য: ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ছাপিয়ে যাবার যে ধীরগতি প্রবণতা ১৯৬০-১৯৯০ সময়কালে এগিয়ে যাচ্ছিল, এখন নয়াউদারবাদী আর্থিক নীতি ও মন্দার ভারে তা বন্ধ হয়ে গেছে। ষাটের দশকে ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে গড়ে ওঠা তীব্র বিতর্ক পরবর্তীকালে স্তিমিত হয়ে এলেও সম্প্রতিকালে তা বাস্তবের অভিঘাতে নতুন করে যে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, নিজের প্রাসঙ্গিক অবস্থানের ব্যাখ্যা-সহ তার বিবরণ মিলবে সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের লেখায় ।

ভারতীয় কৃষিতে 'আধা-সামন্ততন্ত্র'এর প্রাধান্যই গত দু'দশকের সংস্কার কর্মসূচি সত্ত্বেও [illegible]

গেছে বলে সিদ্ধান্ত টেনেছেন গুরুপ্রসাদ কর, চিত্তরঞ্জন দাস ও কার্তিক পাল তাঁদের লেখায়। প্রদীপ সিং ঠাকুর মূলত একই অবস্থান থেকে বক্তব্য রাখলেও ভারতের কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্য দিকে রামচন্দ্রনের মতে, সত্তরের দশকে সিপিআই(এমএল)-এর ভারতকে একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করাটাই ভুল ছিল—কেননা তার আগেই সদ্য-উদ্ভূত নয়া ধনীকৃষক-কৃষিবুর্জোয়া শ্রেণী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে, যা আসলে ছিল একটি বিশেষ চরিত্রের পুঁজিবাদী বিকাশ। পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান দ্রুততার সঙ্গে নয়া-উপনিবেশের আওতায় সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির অনুপ্রবেশের পুঁজিবাদী রূপান্তর বাস্তবায়িত হয়েছে, কেবল কোনও কোনও অঞ্চলে কিছু সামন্তবাদী অবশেষ অবশিষ্ট থেকে গেছে। আর অভিনব সিংহের বক্তব্য মাও সেতুং-এর 'আধা-সামন্ততন্ত্র'-এর তত্ত্ব কোনোদিন ভারতে প্রযোজ্য ছিল না, পুঁজিবাদই ছিল বাস্তবে মূল ভূমিকায়।

আর সুকান্ত রায়ের বক্তব্য, যে সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থের তাগিদে ও অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামন্তবাদকে টিকিয়ে রেখেছিল, সেই সাম্রাজ্যবাদই আজ সেই একই কারণে সামন্তবাদকে ভেঙে বিশ্বায়িত বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থের তাগিদে ভারতের মতো দেশে পুঁজিবাদকে প্রাধান্যের ভূমিকায় নিয়ে এসেছে।

অন্যদিকে বিগত সত্তর-আশির দশকে 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি'র অন্যতম স্বীকৃত প্রবক্তা রতন খাসনবিশও মনে করছেন, ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যতম পার্থক্যসূচক বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে তা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় কৃষিতে এখনও অংশত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি— অর্থাৎ ভূমিসংস্কারের, ভূমিহীনদের জমি বণ্টনের দায়িত্ব যে রয়ে গেছে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

সমগ্র বিতর্কটি যদি সমাজ-সচেতন মানুষদের, বিশেষত সমাজ-পরিবর্তনকামী-কর্মীদের একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে তবে সেটাই হবে এই সংখ্যাটির সার্থকতা।

সব মিলিয়ে, সংখ্যাটিতে মূল বিষয়বস্তুটি কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিচার অবশ্যই করবেন পাঠকেরা।

মূল বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারের এই বিশেষ সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি কবিতা ও গল্প। তাছাড়া আছে ঘটনাপ্রবাহ, সমসাময়িক নানা বিষয়ে ছোট প্রবন্ধ। সমস্ত লেখক ও পাঠকদের সাথে সাথে বিজ্ঞাপনদাতা ও প্রেসকর্মীবন্ধুদেরও আমরা সংখ্যাটি প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনীক ৫০

আগামী বছর 'অনীক' পঞ্চাশ বছরে পা দিচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়কালে সময়ের পরিবর্তনের সাথে 'অনীক'ও অনেক পাল্টেছে। আবার একই সঙ্গে অনীক সময়কেও বুঝবার ও প্রভাবিত করার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। ফলত গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রকাশিত 'অনীক'-এর সংখ্যাগুলি অনেকটাই হয়ে উঠেছে এই দীর্ঘ সময়কালের ক্ষুদ্র একটি চলমান দর্পণ। সেকথা মনে রেখেই আমরা আগামী বছর একে একে সম্ভবত চারখণ্ডে প্রকাশ করবো পঞ্চাশ বছরে 'অনীক'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার নির্বাচিত সংকলন। সেজন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করবো, এবং তাঁদের অনেক কম দামে খণ্ডগুলি দেবার ব্যবস্থা করবো। আগামী বছরের শুরুতেই আমরা, আশা করছি, সে-সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারবো।

স্বভাবতই আমরা এ-ব্যাপারে সমস্ত গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করবো।

সম্পাদকমণ্ডলী, অনীক

হায় স্বাধীনতা!

আজ থেকে দু'দশক আগে যে মনমোহন সিং-এর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল আমাদের দেশে নয়াউদারবাদী তথা বিশ্বায়নী অভিযানের সূচনার তূর্যধ্বনি, গত ১৫ আগস্ট দিল্লির লাল কেল্লা থেকে তাঁর কণ্ঠেই আবার ধ্বনিত হলো সেই অভিযানের সাম্প্রতিক আগ্রাসী উল্লম্ফনের বিজয়বার্তা। না, 'পবিত্র' স্বাধীনতা দিবসের সেই ভাষণে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মিলবে না এদেশের স্বাধীনতাকে প্রকৃতই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সামান্যতম ইঙ্গিত, বরং মিলবে দেশের স্বাধীনতার আরো বেশি করে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও কর্পোরেট পুঁজির পদতলে সমর্পণের স্পর্ধিত শপথ।

এবং সবচেয়ে বড়ো লজ্জার কথা, সেই ভাষণে তাঁদের সেই কর্মকাণ্ডের হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি নিয়ে তিনি ক্রমাগত সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে মিছে কথা বলেছেন, বলেই চলেছেন। তাঁর দাবি: বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে দেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোটা জরুরি, আর সেজন্য আরো বেশি বেশি করে ভারতকে বিদেশি পুঁজির চারণভূমি করে তুলতেই হবে। সেই লক্ষেই গৃহীত সাম্প্রতিক সরকারি পদক্ষেপগুলি— যেমন, খুচরো ব্যবসায়ে ৫১ শতাংশ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ, ডিজেলের দামবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাস থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার প্রভৃতি (এগুলোর সঙ্গে যোগ করুন দেশের মানুষের পেন্সন ও বিমার টাকাকে বিদেশি পুঁজির আওতায় নিয়ে আসা প্রভৃতি ভাষণ-পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিও)—নেওয়া ছাড়া তাঁদের কোনো গত্যন্তর ছিল না। এখন একটু কষ্ট স্বীকার করলেও আখেরে দেশের আমআদমি উপকৃতই হবেন, কেননা প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেই তাদের চাকরি বাড়বে, আয় বাড়বে, সরকারের জনহিতকর কার্যকলাপের সুযোগ বাড়বে—অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির অর্থে উন্নয়ন দ্রুতগতি হলেই সেই সমৃদ্ধি চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন: 'টাকা গাছে ফলে না'; সরকারের রাজস্ব-ঘাটতি আরো বেড়ে গেলে সর্বনাশ হবে, সেজন্যই তাঁর সরকার জনতার পক্ষে কষ্টকর এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই কি? ২০১১-১২ সালে ভারতের রাজস্ব-ঘাটতি ছিল মোটামুটি ৫.২২ লাখ কোটি। আর সে বছরেই মনমোহনের সরকার কর্পোরেট সেক্টরের ধনকুবেরদের সংকট থেকে বাঁচাবার দন্য মোট অনুদান দিয়েছে ৫.২৮ লাখ কোটি টাকা। স্পষ্টতই ধরা পড়ছে, মনমোহন যে শুধু মিথ্যে কথা বলেছেন তাই নয়, তিনি ব্যাপক আমআদমির স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেও কর্পোরেট পুঁজির সেবা করতে বদ্ধপরিকর!

যে প্রশ্নটি তিনি প্রতিনিয়ত এড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে: তাঁদের বহু-বিজ্ঞাপিত সেই উন্নয়নের ফলটা আসলে কারা ভোগ করছে বা ভবিষ্যতে করবে! পৃথিবীর প্রতিটি, বিশেষত ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা কিন্তু একটাই : তাঁদের ব্যাখ্যামতো উন্নয়নের হার বৃদ্ধির অন্য নামই হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রমাগত সর্বনাশ। সরকারি তথ্য থেকেই কিন্তু ধরা পড়ছে যে, গত কুড়ি বছরে প্রবৃদ্ধির হার যদিও ক্রমশ বেড়েছে (সারা দুনিয়াতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় শুধু চীনের পরেই), কর্মসংস্থানের হার কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কমছে। আরও মনে রাখতে হবে মানব উন্নয়নের সূচকের বিষয়ে এই উন্নত প্রবৃদ্ধির হার বিশিষ্ট দেশের স্থান সারা পৃথিবীর ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৩৪ তম স্থানে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বৈষম্যও। তাহলে?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও উচ্চতর পদাধিকারী একমাত্র ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মাত্র দু'মাস আগে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিকে পুরো নস্যাৎ করে দিয়ে জাতির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন: "(সমৃদ্ধি) চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্বসমূহ মোটেই আসলে গরীবদের ন্যায়সঙ্গত আকাbWাকে পুরণ করতে পারে না। আমাদের অবশ্যই ভারতের অভিধান থেকে দারিদ্র্যকে মুছে দিতে হবে।" প্রণববাবু নয়াউদারবাদী সংস্কার কর্মসূচির বিরোধী— এরকম অপবাদ তাঁর শত্রুরাও কোনো দিন দিতে পারে নি। তাঁর বিরুদ্ধে মনমোহন-আলুওয়ালিয়া-চিদাম্বরম তিন দুষ্টচক্রের তথা বিশ্বব্যাংকের ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামারও অভিযোগ ছিল এটাই —তিনি যথেষ্ট দ্রুত গতিতে সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর করতে সক্রিয় ছিলেন না। তাই তাঁকে 'প্রমোশন' দিয়ে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়াটা এই তিন চক্রীর পক্ষে খুবই জরুরি ছিল।

এবং এখানেই নিহিত রয়ে গেছে মূল প্রশ্নটি: কেন মনমোহনরা এভাবে রাতারাতি প্রায়-উন্মত্ত হয়ে উঠলেন সমস্ত সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য? এই কারণেই কিন্তু ২০০৪-এর ভোটে বিজেপি জোট হেরে গিয়েছিল। মনমোহনদের কি সেই আশংকা নেই! সত্যিই নেই। শাসকদলের যারা একটু ধীরেসুস্থে সইয়ে সইয়ে সংস্কার করতে চাইছিলেন— প্রণব ছাড়াও সোনিয়া, দিগ্বিজয়, জয়রামরা—পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের কথা ভোটের কথা মাথায় রেখেই তাদের সব কিছু ঠিক করাটা জরুরি ছিল। দুষ্টত্রয়ীর সে কথা ভাবার দরকার নেই, কারণ তাদের অ্যাজেন্ডা সম্পূর্ণ অন্য : যেভাবেই হোক বিশ্বব্যাংকের প্রদর্শিত পথে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা। আর ঠিকই তো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সদাসর্বদা নিজের মার্কিন দেশের স্বার্থরক্ষায় তৎপর, তাঁরা কেন অন্য পথে যাবেন! তাই, এঁরাও মার্কিন দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। দেশের স্বাধীনতা? হাঃ!


ভর্তুকি ওঠাও, জ্বালানির মূল্য বাড়াও, পেনশন ফাটকায় লাগাও, FDI লাও, দেশকে আমাদের হাতে তুলে দাও!
পুঁজিপতিদের কাছে আলাদীন!
২০১২


বানিজ্যিক মিডিয়ার কাছে 'লায়ন কিং'

শিল্পী : ঋতুপর্ণ বসু

স্বপ্ন ৮

শঙ্খ ঘোষ

দৌড়োতে দৌড়োতে আসছি আর মুখে বলছি 'সাবধান, সাবধান'
কিন্তু কিসের থেকে সাবধান তা জানি না ঠিক
শুধু বুঝতে পারছি কোনো একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে কোথাও
সবাইকে তা বলা দরকার এখনই।
নগর পুড়ছে। দেবালয়ে কী হচ্ছে তবে?
ব্যস্তসমস্ত ঢুকে পড়ি সেখানে।
দেখি ছোটো ছোটো মেয়েরা দলে দলে নাচছে, গাইছে:
'দেবতার মন্দির অঙ্গনতলে'
অঙ্গের ভঙ্গিতে তাদের আঁচল উড়ছে
তালে তালে তালি দিচ্ছে দেবীমূর্তি
আর মেয়েদের আঁচলের উড়ন্ত উর্ধ্বসীমায়
লেলিহান জ্বলছে আগুন
বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে পোড়া গন্ধ
চামর দোলাতে দোলাতে হেসে যাচ্ছে হেসেই যাচ্ছে পুরোহিতরা।

কথা

সব্যসাচী দেব

কথা হয়েছিল আকাশের নীচে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে
সে কথা এখনো ভুলিনি শুধুই মিছিল কোথায় হারাল!

আকাশে কি মেঘ! হতেও তো পারে। পুরোটাই রোদে উজ্জ্বল
এমনটা হয় কখনো কোথাও! মেঘেও সম্ভাবনা—

আগামী দিনের চকিত আভাস! শুধু ভয় হয় ইশারা
বুঝতে যদি বা ভুল করে কেউ! যদি মনে হয় এই বেশ

যেটুকু পেলাম, তাই যথেষ্ট, স্বস্তির বড়ো পাওয়া নেই
দিন শেষ হলে আবেশে অতীত চেটেই কাটাব সন্ধ্যা।

ভয় হয় যদি শ্লথ জড়তায় মগজের কোষে ঘুণ ধরে
তখন কি শুধু স্মৃতিকে আগলে খুঁজে পাবে ঠিক রাস্তা!

সে কথা এখনো মনে থাকে যদি, তবু সে তো কিছু বলে না
মানে নেই তার, কোথাও যায় না, ঠিকানাবিহীন ওড়াউড়ি

আকাশের রং যেমনই হোক না, কথা তো কেবল শব্দ
মিছিলে যদি না মিলে যায় তারা, যাকে বলি সেও অচেনা...

চিলি স্টেডিয়াম

ভিক্টর হারা*

অনুবাদ : ভাস্বতী ঘোষ

শহরের এই ছোট্ট প্রান্তরে আমরা পাঁচহাজার মানুষ।
পাঁচহাজার জন আমরা
আরো কতজন আছে
সমস্ত শহরে,
গোটা দেশে

দশ হাজার হাত
যা পারে জমিতে
বীজ বপন করতে
কারখানার বৃদ্ধি ঘটাতে।
আরো কত মানুষ
ক্ষুধায়, ঠাণ্ডায়, আতঙ্কে, ব্যথায় জর্জরিত!

আমরা ছয়জন এখন মহাশূন্যে তারার মাঝে বিলুপ্ত।
একজন মৃত, আর একজন অকথ্য পিটুনির শিকার।
বাকি চারজন চেয়েছিল মৃত্যু
চেয়েছিল মুক্তি, সন্ত্রাসের কবল থেকে
দেয়ালে মাথা ঠুকিয়ে।
সৈন্যবাহিনীর রণকৌশল নিখুঁত
রক্ত তাদের পদক
নরহত্যা বীরত্বের চিহ্ন।
হে ঈশ্বর, এই কি সেই পৃথিবী যা তুমি গড়েছিলে
সাত দিন ধরে?
আমাদের কমরেড-প্রেসিডেন্টের রক্ত
বোমার চেয়েও জোড়ালো।
হে সংগীত
তুমি কী ভীষণ বিকৃত রূপে উচ্চারিত হও
যখন আমায় গাইতেই হবে
আমার প্রত্যক্ষ এই সন্ত্রাসের কথা
আমি চোখে দেখিনি কিন্তু
অনুভব করেছি যা কিছু আমার অনুভূত।

* চিলির কবি-গণসঙ্গীত শিল্পী ও 'নতুন সংস্কৃতি' আন্দোলনের পুরোধা ভিক্টর হারা ৩৯ বছর আগে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সামরিক জুন্তার হাতে চিলি স্টেডিয়ামে শহিদ হয়েছিলেন। বন্দীদশায় তার শেষ কবিতা/গানটি সহবন্দীদের মাধ্যমে পাচার হয়ে বাইরে এসেছিল— যা আজ "চিলি স্টেডিয়াম" নামে খ্যাত। ইংরেজি অনুবাদ পিট সীগারের, তিনি এটি গেয়ে থাকেন।

পাঠশালা বৃত্তান্ত

অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই।
—রামপ্রসাদ

১

এখন তাঁর পাঠশালায়
নতুন পাঠক্রম
বোল ফোটাচ্ছে মুখে
ফুল ফোটাচ্ছে গাছে

শেখাচ্ছে
কাকে কী বলতে হয়
কী নামে ডাকতে হয়
কী ছাপ মারতে হয়
কার পিঠে কখন
এই সবকিছু

পদস্থ আমলা
প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি
বুদ্ধিজীবী
অধ্যাপক-শিক্ষকরাও এখন
মনোযোগী শ্রোতা
অতিবাধ্য ছাত্র

তেমন কোনো পরীক্ষা নেই
পরীক্ষায় পাশ-ফেল নেই
তবে পদোন্নতি আছে
পুরস্কার সম্মাননা আছে
কমিটির সদস্যপদ আছে
জলপানি আছে

তাঁর পাঠশালা এখন
শতপদী, লক্ষপদী হয়ে
চষে ফেলছে
শহর থেকে গ্রাম

২

তাঁর দন্তরুচিকৌমুদির পরশে
সূর্য করোজ্জ্বল হয় তাঁর
ভ্রূভঙ্গিতে বদলে যায় মুহূর্তেই
মেঘ-রৌদ্রের গড়ন
আবহাওয়া

শাড়ির আঁচলে তাঁর
বন্দেমাতরম
আর হাওয়াই চটির নিচে
চাপ চাপ রক্ত

প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে
সেই রক্ত
চটাক চটাক শব্দে
উঠে আসে,
লেপ্টে যায় কাপড়ে
সমস্ত পোষাকে
তারপর তাঁর সঙ্গেই পৌঁছে যায়
পাঠশালায়,
পাঠশালার পাঠক্রমে

৩

পাঠশালার পাঠক্রমে
শিক্ষিত আমলা পুলিশ
অধ্যাপক শিক্ষক
বুদ্ধিজীবী
তর্কপ্রিয় উদ্ধত ছাত্ররা
অবলীলায় শিখে যাচ্ছে
অম্বিকেশকে কী বলতে হয়
ধর্ষিতাদের কী বলতে হয়
শিলাদিত্যের পিঠে
কী ছাপ মারতে হয়
বিরোধীদের টুঁটির কোনখানে
চেপে ধরতে হয়
বিরুদ্ধতার মুখে
প্রশ্নকারীর মুখে কীভাবে
কোন মাহেন্দ্রক্ষণে
চাবুক মারতে হয়—
এই সবকিছু

৪

পরিবর্তনের বাঙলার আকাশে এখন
হাঁস আর কচ্ছপের চেনা কাহিনী
উড়ে বেড়াচ্ছে

নিচে খলখল করছে কালের রাখাল...

আশ্রয় দেবে কোন দেশ

বিশ্বজিত সেন

জন চার্নকের শহরকে এখন
চার নখে ছেঁড়া হচ্ছে
পঞ্চম নখটা অবশ্যই গান্ধীবাদী
সে অযথা রক্তপাতে
বিশ্বাস করে না।

কেবলই শুনতে চায় রামধুন
বাকি চারটে নখ বলে- "ধুন ধুন
ধুনে দে ধুনুরী
বস্তি খালি করা, চুরমার কর দরমার বেড়া, ভাতের হাঁড়ি
লীলাদিকে* কথা দেওয়া আছে
শহর তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া চাই-ই চাই
তিনিই তো বাস্তবে মালকিন
আমরা এতদিন খেয়ে বসে জিরিয়ে গড়িয়ে
কাটিয়ে দিয়েছি বেশ
কিন্তু এবারে তো
কথা রাখতে হয়!"

পঞ্চম নখ বলে "হায় ইতিহাস, হায় রে সময়
হায় দরিদ্র, তোর দুর্গতি
তার কি রয়েছে কোনো শেষ?
ভাগ্যই যখন বিপরীত, তখন তোকে
আশ্রয় দেবে কোন দেশ?"

* লীলা চার্নক

চতুর্দশপদী

বিশ্বনাথ গড়াই

যখন কথারা আর কথা নয়, শান্ত প্রতিবাদ
ক্রমাগত নতশির আবেদন তীক্ষ্ণ ও ধারালো—
তখন চোয়াল-চাপা মান-অভিমানে কার আলো
নিয়তির মতো ঝোলে, নেমে আসে একরতি চাঁদ!
যখন শপথ নিংড়ে মাঠঘাট পেরিয়ে আকাশ
দিগন্তে ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি— বাধাহীন—শূন্যে অপলক—
তখন তোকেই চিনি, ভালোবাসা, প্রিয় হেমলক:
যদি মৃত্যু হয়, তোকে সব দেবো, এখনি যা চাস।

অজান্তে নির্মিত হচ্ছে সাগরসুষমাহীন দ্বীপ—
যেখানে গাছের রঙ বৃষ্টিহীন মেঘেদের চেয়ে
কিছু উজ্জ্বল, কিন্তু পক্ষিদল আশ্চর্য সবুজ—
লোভ নয়, ক্ষোভ নয়, চোখ ঘুরে ঘুরে বিপ্রতীপ
এক কোণে অচঞ্চল— কথাগুলি দ্রুত আসে ফিরে—
ভালোবাসা নিজেকেই ভালোবসে, এতটা অবুঝ!

ছড়া

সৃজন সেন

বিশ্বায়নের যুগে —
স্বাধীনতার বললে কথা
মরতে হবে ভুগে।

বিশ্বায়নের সত্য —
হতেই হবে বিশ্বপ্রভুর
একনম্বর ভৃত্য।

(খেয়াল রেখো তবে)
ছদ্মবেশী ভৃত্যরাও
মাঝে মাঝে প্রভুর নিন্দায়
হয়তো মুখর হবে।

এ সময়
অচিন্ত্য সুরাল

এ সময় কবিতার নয়
আশ্বিনেও গুমগুমা কালো মেঘ
হাত তুলে রাস্তায় লোক চলে
অভুক্ত হাঁড়িয়া আমানির বাটি
ধরে আছে, পড়ে আছে পাশে
গুলি-খাওয়া মানুষের তাজা লাশ নিয়ে

সোরেন, মাহাতো আর
সাধু খাঁ বা আমিরুল নামে
একই লোক বারে বারে হয়ে ওঠে লাশ
গুলি খায় একই লোক তবু
আদালতে মামলার পৃথক ফাইল

'সাক্ষী নম্বর তেরো'— খেঁকুরে গলায়
আদালত হাঁক পাড়ে, চাপরাশ-পরা
ফাইলবাহক— হঠাৎ পগারপার স-ফাইল।
আজ ভোরে জেনেছে সে
তার কলেজগামী ছেলে ভুল কিম্বা
ঠিক পথে গিয়েছে জঙ্গলে
এ সময় কবিতার নয়
এখন ফাগুনে আগুন ঝরে
পলাশের নয়, রাইফেল নলে।

রাতের পাঁচালি
বিপুল চক্রবর্তী

এই যে সময় আমেরিকাময়
ঘিরেছে তোমায় আর ঘিরেছে আমায়

আমেরিকা টিক্‌টিক্ ঘড়ির কাঁটায়
আমেরিকা সল্টলেকে, গড়িয়াহাটায়

আমেরিকা চক্‌চকে পকেটের পেনে
আমেরিকা জিনস্-কাট্ প্যান্টে-জামায়

আমেরিকা আমাদের ওঠায় নামায়
আমেরিকা দাড়ি-গোঁফ-মুন্ডু কামায়

আমেরিকা কোক-এ আর পেপসি-কোলায়
আমেরিকা খুকু আর খোকার গলায়

আমেরিকা হুল্লোড়ে আমেরিকা স্বপনে
আমেরিকা প্রকাশ্যে আমেরিকা গোপনে

আমেরিকা ফ্লাইওভারে, রাস্তার কাজেতে
আমেরিকা আমাদের বার্ষিক বাজেটে

আমেরিকা আমাদের ইকনমি-গাইডে
আমেরিকা, জেনো, ইনটেল্-ইনসাইডে

* * * * * *

ছাড় পেয়ে ছাড় পেয়ে আজ এত দূর
রোজকার রোদ, তবু, চেনা রোদ্দুর

এসো, সেই রোদ্দুরে সেঁকে নিই প্রাণ
সেঁকে নিই আমাদের ব্যথিতের গান

আর, যদি বড় কোনও সমাধান চাও
মগজের থেকে আমেরিকাকে নামাও

পূর্ব ভারতের কৃষিতে আধা-সামন্ততন্ত্রের একটি বিশ্লেষণ

অমিত ভাদুড়ি

আমাদের দেশে আধা-সামন্ততন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে প্রথম যারা অ্যাকাডেমিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, অমিত ভাদুড়ি অবশ্যই তাঁদের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করছি। তাঁকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আজকে তিনি এই অবস্থানকে কীভাবে দেখছেন সেটা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে। উত্তরে তিনি জানান, এ বিষয়ে অনেকদিন তিনি গভীরভাবে চর্চা করেন নি। কিন্তু ছোট একটি প্রাসঙ্গিক অভিমত তিনি পাঠিয়েছেন। মূল লেখার সঙ্গে সংযোজন হিসেবে সেটি আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদকমণ্ডলী, অনীক

এই নিবন্ধে পূর্ব ভারতের কৃষির প্রেক্ষিতে আধা-সামন্ততন্ত্রের ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এর থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ফলাফলও পরীক্ষা করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে যে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলি শেষ পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কালব্যাপী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, সেগুলিও আলোচনা চলাকালীন উত্থাপন করা সম্ভব হবে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ভিত্তি বিশ্লেষণ করতে আমি পর্যালোচনা করব 'উৎপাদিকা শক্তি' এবং 'উৎপাদন সম্পর্কের' আন্তঃক্রিয়াকে, যা ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিবর্গের সচেতন রাজনৈতিক সক্রিয়তার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হতে পারে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক দিক প্রসঙ্গে কোন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না ক'রে, প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করিনা। কোন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে আমরা কোন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারিনা— কোন সমাজব্যবস্থাকে 'বৌদ্ধিক উপলব্ধির' এই সীমাবদ্ধতা বাস্তবিকই বর্তমান। এই নিবন্ধে আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অনুপস্থিত— নিবন্ধের এই দুর্বলতা সম্পর্কে এটাই আমার কৈফিয়ৎ। এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, আমার আশা, কেন আধা-সামন্ততন্ত্র ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এই নিবন্ধ দিতে পারবে।

২

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পূর্ব ভারতের (বিশেষত আমি যেটা চিনি, সেই পশ্চিমবঙ্গে) কৃষিতে চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি ' আধা-সামন্ততন্ত্র' সূচিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলি হলো:

১) ব্যাপক অ-বিধিবদ্ধ ভাগচাষ প্রথা;

২) ক্ষুদ্র প্রজাদের চিরস্থায়ী ঋণগ্রস্থতা;

৩) গ্রামাঞ্চলে 'শাসক শ্রেণীর' চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য— তারা একাধারে জমি-মালিক এবং ক্ষুদ্র প্রজাদের ঋণদাতা;

৪) গ্রামীণ 'বাজারের' বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্র, যেখানে ক্ষুদ্র প্রজাদের প্রবেশাধিকার সীমিত এবং এই প্রকার 'বাজারের' বিচিত্র সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র প্রজাদের অনিচ্ছাকৃত বিনিময়ে জোর করে অংশগ্রহণ করানো হয়।

কীভাবে এই চারটি উপাদান সম্মিলিতভাবে পূর্ব ভারতের কৃষিতে আধা-সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে, তা বোঝার জন্য আমাদের চারটি বৈশিষ্ট্যকে আরো খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

১) ভাগচাষ: ভাগচাষ প্রথা পূর্ব ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে 'আধিয়ারি', 'বর্গাদারি', 'বাটাইদারি', 'কিষাণী' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে, ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গে, কাঁচা হিসাবে অনুমান করা হয়েছে[১], কৃষি শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ ভাগচাষি এবং তারা রাজ্যের মোট কর্ষিত জমির ৪০ শতাংশ চাষ করে। এই রাজ্যে মোটামুটি ২৪/২৫ লাখ বর্গাদার, যার মধ্যে ৮/৯ লাখ স্বত্বলিপিতে আইনত নথিভুক্ত। বাকিরা ইচ্ছাধীন প্রজা (tenant, at-will), ভূস্বামীর মর্জিমতো যখন খুশি উচ্ছেদ হতে পারে।

কাগজপত্রে নথিভুক্ত প্রজারা যথেষ্ট অধিকার ভোগ করে। পশিচমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুসারে, প্রজা চাষের কোন খরচ বহন না করলে উৎপাদনের ৫০ শতাংশ পাবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রজা ৬০ শতাংশ পায়। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০, প্রজা কর্তৃক চাষের খরচ বহন করার ভিত্তিতে, প্রজার ন্যূনতম অংশ ৬০ শতাংশে এবং সর্ব্বোচ্চ অংশ ৭৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। আইনে প্রজাদের বিশেষ উত্তরাধিকার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে এইসব আইনের খুব কমই মূল্য আছে। কারণ গড়ে প্রতি তিনজনের মধ্যে ২ জন প্রজাই অ-নথিভুক্ত এবং সেই কারণে আইনের এইসব অধিকার ভোগ করতে পারেনা। ১৯৭০-৭১ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় দেখেছি, অ-নথিভুক্ত প্রজাদের 'স্বীকৃত' ভাগ সুনির্দিষ্টভাবে ৩৩-৪০ শতাংশের মধ্যে— মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ (বাস্তবিক অনেক প্রজার বিশ্বাস যে এটাই 'আইনসিদ্ধ') এবং অ-নথিভুক্ত প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথাই প্রায় 'আইন'। আমার বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে, বিহারের অনেক স্থানে অ-নথিভুক্ত প্রজাদের অবস্থা সম্ভবত আরও খারাপ। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে মধুবনী জেলার পান্ডাল

ব্লকে "সিপিআই নেতৃত্বাধীন কিষাণ সভা জাতীয় কৃষি কমিশনকে জানিয়েছিল যে, সদ্য সমাপ্ত সেটেলমেন্ট মাঠ জরিপে একজন বাটাইদারের নামও রেকর্ড করা হয়নি। তাদের মতে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কর্মীকেই ভূস্বামীরা 'কিনে নিয়েছিল'। যার ফলে তারা একগুঁয়ে ভাবে কোন ভাগচাষির নাম রেকর্ড করতে অস্বীকার করেছিল।"[২] প্রধানত অ-নথিভুক্ত প্রজাস্বত্বের উপর নির্ভরশীল এই ধরনের ভাগচাষ প্রথাকে আমি আধা-সামন্ততন্ত্রের প্রথম স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করব। সবসময়ে উচ্ছেদের ভীতি সহ অনথিভুক্ত প্রজাস্বত্ব, ভূস্বামীকে প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করে— যেটা উৎপাদন ক্ষেত্রে সামন্ত সম্পর্কের এক বৈশিষ্ট্য।

২) **ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতা**: ক্ষুদ্র প্রজা প্রায় সর্বদা ঋণগ্রস্থ। কৃষির শুখা মরসুমে সে শস্য কর্জ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, ফসল কাটার পরে পরেই তার 'আইনি অথবা স্বীকৃত' অংশ থেকে শোধ করতে হয়। প্রতিকূল সময়ে কর্জ করা প্রতি কিলো শস্যের জন্য গড়ে তাকে দেড় থেকে দুই কিলো শস্য ফসল কাটার পর ফেরত দিতে হয়। এর অর্থ, শস্য-সুদের হার ৪/৫ মাসে ৫০-১০০ শতাংশ। কর্জের এই চরম বিরূপ শর্তের ফলে ক্ষুদ্র প্রজাদের ঘরে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকেনা। ফসল কাটার এক মরসুম থেকে পরবর্তী মরসুম পর্যন্ত টিকে থাকার সমস্যা অতিক্রম করার একমাত্র পন্থা, সাংসারিক ব্যয়ের জন্য পুনরায় কর্জ করা, যতদিন না আর এক মরসুম আসে। এইভাবে, নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের তাগিদে কৃত ঋণের জালে জড়িয়ে ক্ষুদ্র প্রজাদের ঋণগ্রস্থতা ধারাবাহিক ভাবে প্রবহমান। একটা উদাহরণ দিলে পাঠক ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতার অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারবেন। ধরা যাক একজন বর্গাদারের চাষ করা জমিতে ১০০ মণ ফসল উৎপাদন হয় এবং তার ন্যূনতম প্রয়োজন ২৮ মণ। যদি সে উৎপন্নের ৪০ শতাংশ পায়, তাহলে তার আইনসিদ্ধ ভাগ হলো ৪০ মণ। কিন্তু তার অপরিশোধিত পুরনো ১২ মণ কর্জের জেরে, তাকে ফসল কাটার পরে আসল ১২ মণ এবং ১০০ শতাংশ সুদ হিসাবে আরও ১২ মণ পরিশোধ করতে হয়। অতএব, পুরনো ঋণের 'নিষ্পত্তি' করতে ১২+১২= ২৪ মণ পরিশোধ করার পর তার আইনি ভাগ থেকে পড়ে থাকে (৪০-২৪) = ১৬ মণ। যেহেতু তার ন্যূনতম প্রয়োজন ধরা হয়েছে ২৮ মণ, তাকে আবার (২৮-১৬) = ১২ মণ কর্জ করতেই হবে। ফলত, সুদে-আসলে প্রতিবছর শোধ করার পরেও তাকে ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতার চক্রে আবর্তিত হতে হয়। অবশ্য সব ভাগচাষি এতটা ভাগ্যবানও নয়। তারা আরও আরও বেশি ঋণের জালে জড়িয়ে যায়, যা তারা কখনোই শোধ করে উঠতে পারেনা। একটা খারাপ ফলন, অসুস্থতার মতো জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন কিংবা বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে কিছু বাড়তি ঋণ করতে হয় এবং বর্গাদার অসহায়ভাবে ক্রমবর্ধমান ঋণের কবলে পড়ে, যেটা সে কখনোই শোধ করে উঠতে পারেনা। যে কেউ পশ্চিমবঙ্গ অথবা বিহারের বর্গাদারের সঙ্গে কথা বললেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবেন, এই ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতার সমস্যা কতটা গভীর। কৃষিতে আধা-সামন্ততন্ত্রের এটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

৩) **ভোগব্যয়ের ঋণদাতা হিসাবে জমি-মালিকরা**: প্রজার ভোগব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণের জোগান দেন সাধারণভাবে তাদের জমি-মালিকরাই— এটি পূর্ব ভারতের কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের সুনির্দিষ্ট পরিচায়ক। যে ব্যক্তির কাছে ধারাবাহিক ভাবে ঋণগ্রস্থ, তার থেকেই জমি লিজ নেওয়ার ফলে প্রজা বাস্তবত চিরাচরিত ভূমিদাসের স্তরে উপনীত হয়। এই ভাবেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রজাকে সম্পূর্ণত কব্জায় নিয়ে আসে। প্রজা ভূস্বামীর কাছে, ভূস্বামীর যতদিন ইচ্ছা, কমবেশি বাঁধা পড়ে যায়। এর একটা কারণ, কর্জের ফয়সালা না করে সে নতুন কোন মালিকের সন্ধান করতে পারেনা। আর একটা কারণ— 'অনুগত' থাকলে দুঃসময়ে সে ভূস্বামীর থেকে ধারকর্জ করতে পারবে, যে নিশ্চয়তা সে নতুন জমি-মালিকের কাছে পাবে না। কোন এক বিশেষ মালিকের কাছে বাঁধা পড়ার এই সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে কার্যকর থেকে যাচ্ছে, যদিও আইনত অন্য কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতা আছে প্রজার। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিপরীতে (এখানে) শ্রম বাজার ব্যক্তিভিত্তিক, খণ্ডিত রূপ পরিগ্রহ করে; এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্যে কখনোই "পণ্য উৎপাদনের সর্ব্বোচ্চ স্তর"— যেখানে শ্রমও পণ্য হিসাবে বিক্রীত হয়— সেই স্তরে পৌঁছতে পারেনা।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমি-মালিক প্রজাদের নিষ্পেষণের জন্য শোষণের দুইটি রূপ অবলম্বন করে। জমিতে সাবেক সম্পত্তি-সম্পর্কের মাধ্যমে প্রজা শোষণ এবং পাশাপাশি কুসীদবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ। শোষণের এই দুই রূপ যুগপৎ বলবৎ থাকাই হচ্ছে আধা-সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনার অনেকেই প্রত্যক্ষদর্শী। বর্ধমান জেলা প্রসঙ্গে এফ আর ফ্রাঙ্কেলের রিপোর্ট বলছে, "সারা বছরই বর্গাদারকে কৃষিশ্রমিকদের মজুরির জন্য ভূস্বামী প্রদত্ত অগ্রিমের উপর নির্ভর করতে হয়। জমির মালিকরা এই দায় বহন করেনা। আর একটি হলো খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজনে ভোগব্যয় ঋণ। চাষের মরসুমের শেষে ভাগচাষির এক-তৃতীয়াংশ বখরা থেকে এই সকল অগ্রিম প্রথমেই কেটে নেওয়া হয়। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, এই সমস্ত অগ্রিম কেটে নেওয়ার পর ভাগচাষির ভাগে মোট উৎপাদনের ১২ থেকে ১৫ শতাংশ পড়ে থাকে— মোট উৎপাদন একর পিছু ৪/৫ মণ। একজন ভাগচাষি জানায়, পূর্ববর্তী বছরে তার

ভাগ থেকে সমস্ত ধারকর্জ 'মেটানোর' পর আর কিছুই পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত কৃষকদের বেঁচে থাকার জন্য আরও বেশি ধারকর্জ করতে হয় এবং এইভাবেই তারা ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতার অবস্থায় পতিত হয়।''[৩] পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ২৬টি গ্রামে আমার সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাগচাষিদের আইনি বখরা মোটামুটি ৪০ শতাংশ হলেও, জমি-মলিকের সঙ্গে ধারকর্জ 'ফয়সালা' করার পর পরিণামে ১০-১৬ শতাংশ ভাগ পায়। বিহারের কোশি সেচ এলাকার তিনটি জেলায় ড. প্রধান এইচ প্রসাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকেও এই ধারণা দৃঢ় হয়— ''এই এলাকায় ব্যাপক ঋণগ্রস্থতার খবর পাওয়া গেছে... মুঙ্গের জেলায় মোট পরিবারের ৫৯ শতাংশকে ভোগব্যয় কর্জ করতে দেখা গেছে... প্রধানত ভাগচাষি এবং কৃষিশ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত গরিব গ্রামীণ পরিবারগুলি সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের চাপে চড়া সুদে ভোগব্যয় কর্জ করতে বাধ্য হয়। যার ফলে ঋণগ্রস্থতা এখানকার এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং (অধমর্ণরা) আধা-ক্রীতদাসের জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়... কুলাক জমিদাররাই সাধারণত শোষক।''[৪] সংক্ষেপে কুসীদবৃত্তি এবং জমির উপর সম্পত্তির অধিকার, এই দুই শোষণ প্রক্রিয়া— এর সাথে যুক্ত প্রজাস্বত্ব বন্দোবস্ত এবং ভূস্বামীর কাছে প্রজার ঋণদায়, যা কিনা জমি-মালিকদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির ভিত্তি— এইগুলিই পূর্ব ভারতের কৃষি অর্থনীতিকে নিশ্চিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপ দান করেছে।

৪) **গ্রামীণ 'বাজারের' সংগঠন**: ''বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতিতে'' (যেখানে 'ব্যবহার মূল্য' নয়, 'বিনিময় মূল্যই' প্রাধান্য পায়) সংগঠিত বাজার অত্যাবশ্যক এবং এই ব্যবস্থায় বাজারের বিকাশ পণ্য উৎপাদনের সহগামী বৈশিষ্ট্য। এমনকি ছোট একটি শিল্প উদ্যোগের বিপরীতে একটি কৃষক পরিবার তার বেশির ভাগ ভোগ্যদ্রব্য সরাসরি উৎপাদন করতে পারে এবং এই কারণে বাজারি ক্রিয়াকলাপে তার অংশগ্রহণ প্রান্তিক ধরনের। 'ব্যবহার মূল্যের' ভিত্তিতে 'অস্তিত্বরক্ষাকারী কৃষির' ফল এটাই। যাই হোক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ঋণচক্র, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকদের টিকে থাকার কৃষিকেও বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধ্য করে। এটা সেই ধরনের পণ্য উৎপাদন নয় যেখানে মুনাফার আশায় বাজারের জন্য উৎপাদন করা হয়। বরং তারা উৎপাদন করে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনের জন্য— পুরনো ঋণ শোধের তাগিদে। উৎপন্নের বাজারটাও তাই ব্যক্তিগত এবং খণ্ডিত হয়ে যায়, যেখানে দরিদ্রতম কৃষকরা অকিঞ্চিৎকর অংশগ্রহণের জন্য আবার শোষিত হয়। এই ধরনের ''বাজার সম্পর্ক'' আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্যোতক।

সংগঠিত অর্থ-বাজারে প্রবেশাধিকার না থাকায় (কারণ বাঁধা রেখে ঋণ নেওয়ার মতো সম্পত্তি নেই) প্রজারা সম্পূর্ণভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী এবং মহাজনের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অবাধ একাধিপত্যে ভূস্বামী-মহাজনেরা ঋণের শর্তাবলী নির্ধারণ করে। এর ফলে প্রজাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করার স্বাধীনতা কমে যায়। শুখা সময়ে, যখন (কৃষিপণ্যের) দাম স্থানীয় বাজারে চড়া থাকে, তখন তাদের কর্জ নিতে বাধ্য করা হয় এবং ফসল কাটার পর, যখন দাম কম থাকে, তখন শোধ দিতে হয়। প্রকৃত খরচ কতটা হয়, বিবেচনা করুন: ধানের দাম যখন ৬০ টাকা/মণ, তখন বীরভূমের এক কিষাণ কর্জ করলো। আর দাম যখন ২০ টাকা/মণে পড়ে গেল, তখন তাকে শোধ করতে হলো। সুতরাং, কর্জ করা প্রতি ১ কেজি ধানের জন্য, তাকে ৩ কেজি ধান দিয়ে শোধ করতে হলো। অর্থাৎ, এই কয়েক মাসের ব্যবধানে শস্য-সুদের হার দাঁড়াল ২০০ শতাংশ! শুধুমাত্র কর্জ দেওয়ার এবং শোধ নেওয়ার সময়ের হেরফের করে এবং পরিশোধ দেওয়ার পদ্ধতির কারণে জমি-মালিক এই কৌশলটা খাটাতে পারল। ক্ষুদ্র প্রজা সংগঠিত অর্থ-বাজারে (ব্যাঙ্ক, সমবায় ইত্যাদি) প্রবেশ করতে অসমর্থ হওয়ার কারণে কুসীদবৃত্তির শোষণের শিকারে পরিণত হয়। বিদ্যমান ঋণ-চক্রের প্রভাবে, বাজারে যখন দাম কম তখন সে 'বিক্রেতা' আর দাম যখন চড়া, তখন সে 'ক্রেতা' এই হচ্ছে 'অভাবী বিক্রির' ঘটনা, যেখানে প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষকরা দামের ওঠানামার বলি। আর যে শ্রেণী গ্রামাঞ্চলে ঋণ-চক্র চালনা করে, তারাই বাজারে ব্যবসা থেকে মুনাফা করার সুবিধা ভোগ করে।

প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বে, বাজারকে এমন এক অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে কল্পনা করা হয়, যেখানে বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রম-বিভাজনে এবং উৎপাদনের বিশেষীকরণে অগ্রগতি ঘটে। তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদরা এটা ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত, বাজার কী ভাবে, উৎপাদনের বিশিষ্টতা সত্ত্বেও, উৎপাদকদের কাছে পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ বিস্তার করে।[৫] কিন্তু যে পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কৃষকরা সাধারণত অনিচ্ছাকৃত বিনিময়ে অংশ নেয়, সেক্ষেত্রে এসব বলে লাভ কী? ঋণ-চক্র এবং অনিশ্চিত প্রজাস্বত্ব-অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গ্রামীণ ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক বাজার সম্পর্ক। বাজার-সংগঠন গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতিভূ— আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্র বহন করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে গঠিত 'নৈর্ব্যক্তিক' বাজারের সঙ্গে এর খুব কমই মিল আছে। সে কারণে উপর উপর যা ঘটে, সেই বাজারি বিনিময় ও লেনদেন অথবা মুদ্রাব্যবস্থা, কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত নাও দিতে পারে— এসব আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সহগামী বৈশিষ্ট্যও হতে পারে।

সার কথা, ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রধান সামন্ততান্ত্রিক উপাদান পূর্ব ভারতের কৃষিতে বিরাজ করছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রজারা অবিরাম উচ্ছেদ-আতঙ্ক এবং ধারাবাহিক ঋণগ্রস্থতার কারণে এক বিশেষ ভূস্বামীর কাছে বাঁধা পড়ে থাকে। শ্রমের বাজার খণ্ডিত এবং ব্যক্তিতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। অপরদিকে, ঋণ ও উৎপন্নের বাজার এতটাই সংগঠিত, যা গ্রামাঞ্চলের বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ক প্রতিভাত করে, যেটা আবার পর্যায়ক্রমে উৎপন্নের বাজারকে খণ্ডিত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে। অনিচ্ছাকৃত বিনিময় যেখানে ব্যতিক্রম নয়, সেটাই নিয়ম।

৩

পূর্ব ভারতের কৃষিতে আধা-সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা এখনও হয়নি। ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন জমিদারি এলাকায় আধা-সামন্ততন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধেও আমরা খুব কমই জানি। সমগ্র ইতিহাস সম্পূর্ণ না জেনে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য ফলাফল সম্পর্কে অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমি বড়জোর কিছু মতামত দিতে পারি। সেগুলি সবই পূর্ব ভারতের সমসাময়িক কৃষি পরিস্থিতি সম্পর্কিত।

প্রথমত, আধা-সামন্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণত জমির উপর বিধিবদ্ধ সম্পত্তি অধিকার থেকে জাত নয়। অ-নথিভুক্ত প্রজাস্বত্ব এই সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। অপর দিকটি হলো প্রজাদের ভোগব্যয় (এবং অন্যান্য ধরনের 'স্থির' ও 'কার্যকর' মূলধনের) ঋণদাতার ভূমিকা পালন। এর থেকে অনুসিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে 'জমি দখলের' মতো রাজনৈতিক আন্দোলন, যথাযথ অর্থনৈতিক কারণ থাকা সত্ত্বেও, সফল হওয়া কঠিন। গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন না করে, এই সমস্যার মূলে পৌঁছনো সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে দেখা গেছে, ভূমিহীনদের উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টন করার অব্যবহিত পরে জমি 'জোতদার' ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাতে ফিরে গেছে একটি মাত্র কারণে— 'কার্যকর মূলধনের' অভাবে গরিব কৃষকরা চাষ করতে পারেনি। এখানে যেটা জোর দেওয়া প্রয়োজন, কার্যকর মূলধন বলতে চাষের বীজ ইত্যাদি শুধু নয়, ক্ষুদ্র কৃষকদের ন্যূনতম ভোগ্যপণ্য, যেটা চিরাচরিত ভাবে ভোগব্যয় ঋণ হিসাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা যোগান দেয়। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝিয়ে দেয়, পশ্চিমবঙ্গে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকড় কতটা গভীর। আমরা যদি এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে চাই, তাহলে পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্যায়ে, জমি পুনর্বণ্টনের সাথে সাথে স্থির এবং বিশেষত কার্যকর মূলধন যোগানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমি এটা বলতে চাইনা যে, কার্যকর মূলধন যোগানের অভাবই জমি-বণ্টন আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট এক বিচারব্যবস্থা সিলিং অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনেও বাধা দিতে যথাসাধ্য ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, আদালতগুলিতে ইনজাংশানে আবদ্ধ ৬০ হাজার মামলা ইতিমধ্যেই সরকারকে ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুসারে ১৪.৫ লক্ষ একর জমির স্বত্ব পেতে দেয়নি।[৬] এক শ্রেণীস্বার্থ ভিত্তিক প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা, যুক্তফ্রণ্টের সবকয়টি দলের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ— সবকিছু মিলে জমি পুনর্বণ্টন কর্মসূচি ব্যর্থ করেছিল। সে যাই হোক, এই সব ঘটনা সমস্যার কঠোর অর্থনৈতিক সত্যটা আড়াল করতে পারেনা যে 'কার্যকর মূলধন' যোগানের ব্যর্থতাও এর অন্যতম কারণ। এই রকম স্বল্প মাত্রায় জমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে যুক্তফ্রণ্ট কোন রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছিল (অথবা যোগ করতে চেয়েছিল) কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন।

বিদ্যমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া— এটা কৃষি-পশ্চাৎপদতাকে স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী যেহেতু জমি এবং কুসীদবৃত্তি— দুটি (উৎপন্নে মালিকের ভাগ ও প্রধানত প্রদত্ত কর্জের সুদ) থেকেই আয় করে, প্রজাদের আর্থিক দুর্দশা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। ভাগচাষিদের সচ্ছল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে যদি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমাতে হয়, তারা তাও করবে। প্রজার আর্থিক অবস্থা ভালো হলে, তার ভোগব্যয় ঋণের প্রয়োজন কম পড়বে এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে এমন হতে পারে যে জমির উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতা জনিত আয়ের তুলনায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর সুদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। এই সব ক্ষেত্রে নিছক অর্থনৈতিক স্বার্থে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা উন্নত কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহারে রাশ টেনে ধরতে পারে। যদিও বেশির ভাগ ভূস্বামী এত চতুর আর্থিক হিসাবনিকাশ করে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তারা এই ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বোঝে এবং এ থেকেই এই অঞ্চলে 'উন্নত কৃষির' অনুপস্থিতির কারণ অংশত অনুমান করা যায়।

কিন্তু আধা-সামন্ততন্ত্রে শ্রেণী-ক্ষমতার প্রশ্নটা আরও জরুরি। তাদের কাছে প্রজাদের চিরঋণী থাকাটাই যেহেতু মূলত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ক্ষমতার ভিত্তি এবং আমার ধারণা, ব্যাপক অ-নথিভুক্ত প্রজাস্বত্বের সঙ্গে ঋণগ্রস্থ প্রজাদের দারিদ্র্যের গভীর সম্পর্ক আছে— এটা মনে হয় বলা যায় যে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা সচেতনভাবে প্রযুক্তিগত উন্নতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিশ্চলতা ও নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রেখে চিরাচরিত ঋণগ্রস্থতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম রাখার চেষ্টা করবে।

এই হচ্ছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক, যা

উৎপাদিকা শক্তিকে নিগড়ে বেঁধে রাখে। প্রযুক্তি যে সম্পত্তি-সম্পর্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়— এটা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যভাবে বলা যায়, কুসীদবৃত্তি থেকে উদ্বৃত্ত আহরণের রীতি, উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতে উদ্বৃত্ত আদায় এবং উদ্বৃত্তের ব্যবহার এমনভাবে পরস্পর বিজড়িত থাকে যাতে গ্রামাঞ্চলের শাসক শ্রেণীর স্বার্থে কৃষি অনগ্রসরতা কায়েম হয়ে থাকে।

এই কারণে আমার বিশ্বাস, পূর্ব ভারতে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে, যেখানে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা কৃষির উন্নতি সহজে সম্ভব নয়। উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইতিহাসের যে কোন বস্তুবাদী ব্যাখ্যায়, পরিস্থিতি এখন ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য পরিপক্ক।

৪

সচেতন রাজনৈতিক কাজকর্ম ব্যতিরেকে এই প্রকার ঐতিহাসিক পরিবর্তন সামাজিক বিন্যাসেও যথাযথ পরিবর্তন ঘটাবে— এটা দাবি করা আমার পক্ষে কিছুটা কল্পনাবিলাস হবে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে কিছু অদলবদল করে উন্নত প্রযুক্তি নানাবিধ ভাবে জায়গা করে নিতে পারে এবং এরকম অনেক পরিবর্তন তখনও গ্রামীণ গরিব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ধাবিত হবে। গ্রামীণ গরিব শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতিরেকে, ইতিমধ্যেই ঘটমান ঐতিহাসিক পরিবর্তনের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তা খুব একটা আশা জাগায় না। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত এলাকায় সরকারি সেচ ব্যবস্থার প্রসারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেসমস্ত এলাকায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কেমন করে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

আধা-সামন্ততন্ত্র বহাল থাকার অর্থ, ভূস্বামী কিছুতেই প্রজাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসতে দেবেনা এবং তার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেবেনা। ফলত, পরিস্থিতিগত যুক্তি দাবি করে যে, উন্নত প্রযুক্তি (ভালো সেচ, বীজ ইত্যাদি) যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করে, তার সবটাই সে কুক্ষিগত করবে, যাতে প্রজার আর্থিক অবস্থা ভালো না হয়। সেই একই ঋণ-চক্র, অ-নথিভুক্ত প্রজাস্বত্ব ইত্যাদি চলতেই থাকবে এবং ভূস্বামী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা অক্ষতই থাকবে। এর জন্য তারা ভাগচাষীদের স্বীকৃত ৩৩-৪০% ভাগ কমিয়ে দিতে পারে অথবা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ভাড়া দাবি করতে পারে (যেমন টিউবওয়েলের জল ব্যবহারের উপর ভাড়া ইত্যাদি)। অথবা এসব কিছুই না করে প্রজাকে সোজাসুজি উচ্ছেদ করে দিয়ে মজুরি-শ্রমিক দিয়ে চাষ করতে পারে (এটা ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দিকে পদক্ষেপ)। এই সমস্ত সম্ভাবনাই বর্তমান এবং 'সবুজ বিপ্লবের' অনেক পরিদর্শক তাদের ক্ষেত্র-সমীক্ষায় ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে আমি 'মুনিষ' নামে এক বিশেষ ধরনের বেগার মজুরি শ্রমিক প্রথার বিকাশ লক্ষ্য করেছি। এই প্রথার বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ ঋণ-চক্র এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্কেতবাহী কৃষিমজুরি শ্রমকে যুক্ত করে। শুখা সময়ে, বিগত দিনের প্রজা এবং বর্তমানে মজুরি-শ্রমিকদের এই শর্তে ঋণ দেওয়া হয় যে, ভরা কৃষি মরসুমে তারা বাজার-প্রচলিত মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করবে (সুদের হার সেই ভাবেই ধার্য করা হয়)। এই তথাকথিত 'মুনিষ' প্রথায় পূর্বতন প্রজারা বেগার কৃষি-মজুরে পরিণত হয় এবং 'স্বাধীন' মজুরি-শ্রমিক বিশেষ একজন জমি-মালিকের কাছে, অত্যন্ত কম মজুরিতে, ভরা কৃষি মরসুমে বাঁধা পড়ে যায়। সেই একই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঋণচক্রের মাধ্যমে মজুরির হার বেঁধে রাখা যায়, ভরা কৃষি মরসুমে মজুরের লভ্যতাও নিশ্চিত হয়। উন্নত প্রযুক্তিতেও জমিদাররা, প্রাপ্ত লাভের ভাগ কাউকে না দিয়েই, কম মজুরিতে চাষ চালিয়ে যেতে পারে। যেসব অঞ্চলে সরকারি সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সব অঞ্চলে এই প্রবণতা দেখা গেছে এবং এটা হয়তো আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে পরবর্তী পদক্ষেপে পরিণত হতে পারে, যদি না ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের দৃঢ়সংকল্প রাজনৈতিক সক্রিয়তায় অন্য ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

(tenant বা ভাগচাষি অর্থে 'প্রজা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে— অনুবাদক)

পাদটিকা

1. N. Banerji, *Bargadar and Institutional Finance*, Directorate of Land Records and Surveys, West Bengal, January, 1973, p. 2.
2. D. Bandyopadhya, *Impressions on the Prevailing Agrarian Relations in the Districts of Madhubani and Muzaffarpur in Bihar*, April, 1973.
3. Francine R. Frankel, *India's Green Revolution: Economic Gains and Political Costs*, Princeton University, Press, 1971, pp. 167-68.
4. Pradhan H Prasad, 'Employment structure in Rural India', paper presented to the Seminar on the Political Economy of Indian Agriculture, Calcutta, March, 1973.
5. This sort of reasoning underlies 'gains from trade' type of argument in orthodox international trade theory.
6. *Economic and Political Weekly*, March 17, 1973.
7. A technical elaboration of this sort of reasoning is to be found in Amit Bhaduri's 'A Study in Agricultural Backwardness under Semi-Feudalism', *Economic Journal*, March, 1973.

ফ্রন্টিয়ার, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে গৃহীত

লেখকের সংযোজন: ২০১২

একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকে শুরু করি— 'mode of production' নিয়ে কেন আমরা তর্কে নামতে ব্যস্ত? এ প্রশ্নের দুটো উত্তর সম্ভব :

(ক) বিপ্লবী পার্টিকে বিপ্লবের স্তর ঠিক করতে হলে উৎপাদনের চরিত্র ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে শ্রেণীবিন্যাস তা জানতে হবে।

(খ) কোন বিশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ (বা survey) করা হলে তার ছোট নাম বা shorthand হিসেবে mode of production-এর classification ব্যবহার করা যেতে পারে। দু'টো এক নয়— প্রথমটা ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সময়ের প্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, দ্বিতীয়টা একই সময়ে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ time-series vs cross section।

যদিও (ক) এবং (খ) এক নয়, দু'টোর মধ্যে সম্পর্ক আছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার কৃষিব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একটু চোখ খুলে দেখলেই তা বোঝা যায়। বিভিন্ন কৃষিব্যবস্থার মধ্যে তফাত অনেক সময়েই প্রকট, কিন্তু আপনি যদি মার্কসীয় ঐতিহাসিক স্তরে বিশ্বাসী হন, অন্তত তর্কের খাতিরে মেনে নেন, তবে এই তফাতগুলি আপনি একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখবেন— এ যেন ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর। অনেকটা স্থিরচিত্র পাশাপাশি রেখে চলচ্চিত্র তৈরি করা! জিনিসটা অনেকটাই বিশ্বাস-নির্ভর। কিন্তু mode of production-এর বর্তমান শ্রেণীবিন্যাস থেকে কী বিবর্তন আশা করা যায় তা ঐ বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করে।

১৯৭৩-এ আমি যখন পূর্ব-ভারতের আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে লিখি, তখন আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার ২৫-২৬টি গ্রামে এবং বর্তমানের ঝাড়খন্ড এবং উড়িষ্যার সীমায় দু'চার দিন ঘোরাফেরা করায়।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার বিস্তার ভারতবর্ষে কতটা তা তলিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না। যাঁরা মনে করেন এটা সর্ব-ভারতীয়, তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়ার জন্যে যতটা জানা দরকার, তা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এখনও নেই।

কিন্তু এর একটা অন্যদিক আছে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেতর থেকে যতই ফোঁপরা হোক, একদিক থেকে mode of production-এর শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদির তর্কটাকে সীমাবদ্ধ করতে সাহায্য করে। নির্বাচন নিয়ে অত্যধিকভাবে জড়িত, গভীরভাবে বর্তমান গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বামপন্থী পার্টিগুলি, যথা, CPI, CPM, CPI(ML-Liberation) তত্ত্বকথা যতই বলুন, তাঁরা তাঁদের কাজে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে বর্তমান সমাজ বিবর্তনের স্তরে তাঁরা ধনতন্ত্রের প্রাধান্যে সন্দেহ রাখেন না। সুতরাং কৃষিব্যবস্থাতেও ধনতন্ত্রের ক্রমশ প্রকাশ্যমান চরিত্র নিয়েও তাঁদের বিশেষ সন্দেহ নেই। সাংবিধানিক রাজনীতি এবং ধনতন্ত্রের সংস্থাগুলি গভীরভাবে জড়িত। একটা ধনতন্ত্র-প্রধান দেশের সংবিধান এবং রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের সংবিধান আলাদা হতে বাধ্য!

সংবিধানের বাইরে, এমনকি সংবিধানে দেওয়া অধিকারের বাইরে যাঁরা রাজনীতি করতে প্রস্তুত, যেমন মাওবাদীরা, যেসব অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছেন সেসব অঞ্চলে তথাকথিত 'আধা-সামন্ততন্ত্রের' প্রভাব নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য শুদ্ধ যথেষ্টভাবে প্রকট। কিন্তু কেবল সেইসব অঞ্চল সারা ভারতবর্ষ নয়। বিপ্লবের স্তর যদি mode of production-এর শ্রেণীবিন্যাস দিয়েই নির্ণয় করতে হয় (এমনকি রাজনীতিতে সংবিধানের গুরুত্বও) তাহলে তাঁদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বোধহয় আঞ্চলিক চরিত্র নিতে বাধ্য। অন্যদিকে যারা অত্যধিক ভাবে সাংবিধানিক রাজনীতিতে লিপ্ত, তাঁদেরও জানা দরকার ঐ সব অঞ্চল বাদ দিয়েও ভারতবর্ষ নয়। আমার নিজের ধারণা, নানা ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত জনতার আঞ্চলিক আন্দোলন এই দুই-এর মধ্যে একটা জায়গা খুঁজছে।

এ তো গেল বিপ্লবের তত্ত্বকথা, যা নিয়ে লেখা সহজ, কিছু করা শক্ত। তাই এই নিয়ে কথা না বাড়িয়ে শেষে শুধু বলি, আমার চল্লিশ বছর আগের লেখাটার প্রধান বিষয় ছিল আমার দেখা ঐসব অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা কোন্‌ভাবে বদলাবে, কত তাড়াতাড়ি। অন্যভাবে বললে, একটা stable state-এ আছে কিনা। উত্তর ছিল, মহাজনের কারবার ও জমির মালিকানা একই শ্রেণীর হাতে থাকায় অবস্থাটা ওপর ওপর ভাবে বদলাবে, কিন্তু নতুন শ্রেণীর হাতে যাবে না। গত চল্লিশ বছরে অনেক কিছু নিশ্চয়ই বদলিয়েছে। আমার ভাসাভাসা ধারণা, উৎপাদন বহু জায়গায় বেড়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে বেড়েছে কৃষকদের ঋণের বোঝা। মনে হয় না সে ঋণ ব্যাংক বা সরকার থেকে পাওয়া যায় এবং সেই অর্থে 'অপারেশন বর্গা' সীমিত। পশ্চিমবাংলার কৃষিতে শ্রেণীচরিত্রের বিবর্তন নিয়ে যাঁদের জানার উৎসাহ তাঁরা কৃষিতে ঋণ, কৃষির পণ্যের বাজার কোথায় এবং জমির মালিকানা— এই তিন জিনিষের সম্পর্ক নিয়ে আবার ভাবুন এবং তত্ত্ব ছেড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানুন, এই আমার অনুরোধ।

ভারতীয় কৃষি

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদের ব্যাহত বিকাশের ওপর নতুন তথ্য

উৎসা পট্টনায়ক

ভূমিকা

এক দশক আগে যখন বিশ্বের প্রাথমিক পণ্যগুলির দাম পড়তে শুরু করে তখন থেকে মুক্ত বাণিজ্য ও সরকারি ব্যয় কমানোর আর্থিক নীতির ফলে এদেশের কৃষি ক্ষেত্রকে গভীর মন্দায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের অবস্থাও ভারতের মতোই— শুধু কর্মসংস্থান আর জীবনযাত্রার সংকটই নয়, উৎপাদনেরও সংকট। যেসব অযৌক্তিক নীতির ফলে দেশটা এরকম অবস্থায় পড়েছে, এদেশের শাসক এলিটরা সেগুলিকে আত্মস্থ করে ফেলেছে। ভাবনাচিন্তা না করেই তারা বিশ্ব আর্থিক স্বার্থের মূল্যবৃদ্ধি কমানোর নীতির কথাই আওড়িয়ে চলে, ব্রেটন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশিত নতুন নীতিগুচ্ছের মধ্য দিয়ে যা প্রতিফলিত— যদিও এইসব নীতি নেওয়ার ফলে এইসব দেশের গরিব মানুষের ওপর খুব খারাপ প্রভাব পড়ার প্রমাণ এখন পাহাড় সমান। উন্নত দেশগুলির লোকেদের সমান পণ্য-ভারাক্রান্ত বিশ্ব মানের জীবনযাত্রার লোভে এদেশের শাসক এলিট ও মূলত শহুরে মধ্যবিত্তরা নিজেদের দেশের গরিব নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপরই আঘাত হানছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিডিপি বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু— ৬ থেকে ৭ শতাংশ— চীনের পরই। এদেশের বাইরে ভারতকে অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি সাফল্যের কাহিনী বলে তুলে ধরা হচ্ছে, তুলে ধরা হচ্ছে উত্তরের পণ্য ও পরিষেবার 'উদীয়মান বাজার' বলে, বিনিয়োগের আকর্ষক মৃগয়াভূমি হিসাবে। পশ্চিমের আর্থিক সংবাদমাধ্যমে তথাকথিত 'ব্রিক' (BRIC) দেশগুলির অন্যতম ভারতকে একটা গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে— সেটা কিন্তু ভারতের বর্তমান বাস্তবতার একটা ছোট অংশ মাত্র। এই ছবিটি ভারতের জনকল্যাণ বিষয়ে ভুল চিত্র হাজির করে। কারণ মোট প্রবৃদ্ধির হার থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির হার বা বণ্টনের ফলাফল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কৃষি ও শিল্প, যে দুটি ক্ষেত্র এদেশের জনগণের চার-পঞ্চমাংশকে ধারণ করে, সে দুটিরই গতি নিচের দিকে, কৃষিতে ভয়ানক মন্দা, সেখানে মাথা পিছু প্রকৃত আয় কমছে। ভারতের গ্রামে ও শহরে বেকারি বাড়ছে। দেশে গড় খাদ্যশস্য ব্যবহার এত কমে গেছে তা ঔপনিবেশিক সময়ের সঙ্গে তুলনীয়— যদিও খাদ্যশস্য রপ্তানি বাড়ছে, আর গ্রামীণ ভারতকে বাড়তি ক্ষুধার ভার বহন করতে হচ্ছে। কৃষিতে অভূতপূর্ব দুর্দশা দেখা দিয়েছে, খামারগুলির ঋণগ্রস্ততা, ভূমিহীনতা বৃদ্ধি সহ সম্পদ হারানো, এবং হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পাচ্ছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমার সরকারি দাবি, বিশ্ব ব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্টে যা তুলে ধরা হয়, সেগুলি সব বানানো— কারণ দারিদ্র্য নির্ধারণের অযৌক্তিক ও ভুল পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এগুলি তৈরি করা হয়। সঠিক ভাবে নির্ধারণ করলে দেখা যায় দারিদ্র্য অনেক বেশি— অর্থনৈতিক সংস্কারের কালে দারিদ্র বেড়েছে, দারিদ্র্যের তীব্রতা বেড়েছে। দারিদ্র্যহার নির্ণয়ের সরকারি পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনার জন্য পাঠকরা আমার 'নিওলিবারেলিজ্‌ম অ্যান্ড রুরাল পভার্টি ইন ইন্ডিয়া' দেখতে পারেন।[১]

অর্থনীতির যে একমাত্র ক্ষেত্রটিতে দ্রুত প্রসার ঘটেছে সেটি হলো পরিষেবা ক্ষেত্র— তার মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ হলো উচ্চ আয়বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তি-পরিষেবা (আইটি) ও আর্থিক পরিষেবা, যে দুটিই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রের বড় অংশটার আয় কিন্তু এখনও কম। এরা ব্যক্তিগত ও খাদ্য পরিষেবা যোগায় ধনী ভারতীয়দের জন্য— অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় ভারতের জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ বা তারও কম এই ধনী ভারতীয়দের প্রকৃত আয় দ্রুত বেড়েছে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায়ও জাতীয় আয়ের বণ্টন খুব অসমান ছিল, তার পর অসাম্য আরও বেড়েছে— বেড়েছে একটি নির্দিষ্ট ভাবে, যা দুশ্চিন্তার কারণ। *বিপুল সংখ্যক জনগণের প্রকৃত আয় অনপেক্ষভাবে (অ্যাবসলিউট) কমেছে*, আর পাশাপাশি প্রকৃত আয় অতি দ্রুত বেড়েছে সংখ্যালঘু একটি ছোট অংশের। এর ফল দাঁড়িয়েছে, একদিকে শহরাঞ্চলে রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ শিল্পে একটা জোয়ার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে পুরনো ধনী ও নব্য ধনী, যারা উত্তরের দেশগুলির জীবনযাত্রার অনুকরণ করতে চায়, তাদের জন্য স্থায়ী ভোগ্যপণ্য ও বৈদ্যুতিন পণ্যের একটি ক্রমবর্ধমান বাজার। অন্য দিকে, জনগণ্যের অধিকাংশের কাছে এর অর্থ হলো বেকারি, ঋণগ্রস্ততা, সম্পদক্ষয় ও ক্ষুধা— এককথায়, সবরকমের দুঃখকষ্ট— বৃদ্ধি।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির চাপে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংস্কার ও বেসরকারিকরণ চাপিয়ে দিচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নতুন আর এক গুচ্ছ আক্রমণের মধ্যে তা প্রতিফলিত— কৃষকদের ছোট মাপের সম্পত্তির ওপর এবং আদিবাসী জনগণের সাধারণ সম্পত্তির ওপর আক্রমণ। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে রাষ্ট্র নিজেকে কর্পোরেটদের জন্য কৃষক ও আদিবাসীদের সম্পত্তি হাতানোর একটা হাতিয়ারে পরিণত করে ফেলছে। একই সময়ে, বিশ্বায়নের এজেন্ডা ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। ভারতের সমাজের ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ শ্রেণীগুলিকে ক্রমবিন্যাসের নতুন ও জটিল একটা

নকশা তৈরি করছে— তাতে করে যে চিত্রটি তৈরি হচ্ছে সেটি জটিল, কিন্তু আগেকার রক্ষণাত্মক ধরনের বদলে কৃষকদের দিক থেকে ক্রমে একটা লড়াইয়ের ভঙ্গিমা দেখা যাচ্ছে— অবশেষে তাদের মধ্যে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।

২। জিডিপি-তে ও কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশে পরিবর্তন

জিডিপি-তে ও কর্মসংস্থান করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির অংশের ক্ষেত্রে আগের তিরিশ বছরের তুলনায় সংস্কারের পনের বছরে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ১৯৮০-র দশকে দেশের আয়ে সেকেন্ডারি ক্ষেত্রগুলির (শিল্প ইত্যাদি— অনুবাদক) অংশ বেড়েছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের সময়কালে, ১৯৯০ থেকে ২০০২-৩ সালে, তা এক-চতুর্থাংশে অপরিবর্তিত থেকে যায়। জিডিপি-তে কৃষি ও তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রের অংশ ১৯৮০-র দশকে ধীরে ধীরে কমছিল, ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় ৩৫ শতাংশ থেকে দশকের শেষে ২০০৩-০৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। অন্যদিকে, পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশ জিডিপি-র দুই-পঞ্চমাংশ থেকে বেড়ে অর্ধেকের ওপর দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে বাণিজ্য, হোটেল, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে। তারপর আসে আর্থিক ক্ষেত্র, রিয়েল এস্টেট ও বাণিজ্য পরিষেবা (সারণি ১)। ভারতের অর্থনীতিতে শিল্পের বড় মাপের বিকাশের আগেই পরিষেবা ক্ষেত্রের এরকম প্রাধান্য (টার্সিয়ারাইজেশন) চিন্তার বিষয়। এরকম একটা পরিবর্তন— পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি, পাশাপাশি কৃষির অংশ কমে যাওয়া ও শিল্পক্ষেত্রে বিকাশহীনতা— শেষ দেখা গিয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে, ১৮৯১ থেকে ১৯৩১ সালে।

কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন কর্মে বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের মধ্যে কৃষিকাজের অংশ বিশেষ কমেনি, ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৯-০০ সালের মধ্যে ৭৪.৫% থেকে কমে হয়েছে ৭১.৪%, যদিও একই সময়কালে জিডিপি-তে কৃষিকাজের অংশ ১১ শতাংশ-পয়েন্ট কমেছে। গ্রামের কর্মনিযুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে কৃষি-নির্ভরতা এই সময়ে সামান্য বেড়েছে— ৮৪.৫% থেকে ৮৫.৪%। অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাণিজ্যিক উদারীকরণের জমানায় কৃষিতে জনপ্রতি প্রকৃত উৎপাদন কমছে। শহরের কর্মনিযুক্ত পুরুষদের মধ্যে খনি, কলকারখানা ও উপযোগ নির্ভরতা ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ২৯.৫%, তা থেকে ১৯৮৭-৮৮-তে কমেছিল ১ শতাংশ-পয়েন্ট, আর তার পর অনেকটা কমে গিয়ে ১৯৯৯-০০ সালে দাঁড়িয়েছে ২৪.১%। একই সময়কালে শহরের কর্মনিযুক্ত নারীদের মধ্যে এই হারটি ২৮ শতাংশ থেকে কমে ২৪.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্র যোগ করে দেখলে শহরে নারী ও পুরুষদের উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির হার অনেকটা বেড়েছে। সে বিষয়ে পরে আসবো। এইসব তথ্য শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে, শ্রমিক-প্রতি কর্মদিন যে কমেছে— যা বেকারির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক— তা এতে প্রকাশ পায় না। কর্মসংস্থানের নিরিখে অবশ্যই বলা চলে যে সংস্কারের জমানায় বি-শিল্পায়ন ঘটেছে, পাশাপাশি অর্থনীতি পরিষেবা (শিল্প ও কৃষি বাদে অন্যান্য ক্ষেত্র, মূলত পরিষেবা— অনুবাদক) ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকেছে।

ক্ষেত্রগুলির পারস্পরিক অবস্থানের এই পরিবর্তনে দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে, ১৯৯০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কৃষিতে, খনি ও খাদানে, এবং সরকারি উপযোগিতা ক্ষেত্রে মোট শ্রমিক সংখ্যা কমেছে, কমেছে কর্মদিবসের সংখ্যাও। কারখানা শিল্পে

সারণি ১

জিডিপি-তে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শতকরা অংশ

১৯৮০-৮১ থেকে ২০০৩-০৪ (১৯৯৩-৯৪-এর মূল্যমানে)

১ *এই পর্যন্ত তিন বছরের গড়*	২ *কৃষি, অরণ্য, মৎস্য, খনি ও খাদান*	৩ *শিল্প, নির্মাণ ও উপযোগ*	৪ *বাণিজ্য, হোটেল পরিবহন ও যোগাযোগ*	৫ *আর্থিক, রিয়েল এস্টেট ও বাণিজ্যিক পরিষেবা*	৬ *সব ধরনের পরিষেবা*
১৯৮২-৮৩	৪১.৩৪	২১.৭৭	১৮.৫২	৬.৭৮	৩৬.৮৯
১৯৮৫-৮৬	৩৯.৮৪	২২.৩৩	১৮.৫৩	৭.৬২	৩৭.৮৩
১৯৮৮-৮৯	৩৬.৪৪	২৩.২৪	১৯.১৮	৮.৮১	৪০.৩২
১৯৯১-৯২	২৭.৪৯	২৪.৫৯	২২.২৮	১২.৪৯	৪৭.৯২
১৯৯৪-৯৫	৩৩.৫৫	২৩.৯৩	১৯.৩৭	১১.২২	৪২.৫২
১৯৯৭-৯৮	৩০.১৬	২৫.৩৭	২১.১২	১১.৬২	৪৪.৪৭
২০০০-০১	২৭.৪৯	২৪.৫৯	২২.২৮	১২.৪৯	৪৭.৯২
২০০৩-০৪	২৪.৭২	২৪.৬৪	২৪.৬১	১২.৭৬	৫০.৬৩

উৎস: ইকনমিক সার্ভে ২০০৫-০৬ (ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক), বার্ষিক তথ্য। লক্ষ্য করুন যে ২, ৩ ও ৬ নং কলামগুলি যোগ করলে ১০০ শতাংশ হয়- ৪ ও ৫ নং কলাম দুটি 'সব ধরনের পরিষেবা' (৬ নং কলাম)-র অন্তর্ভুক্ত।

মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে সংগঠিত শিল্পের অংশ (যেখানে কাজের পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো) কমেছে। ১৯৮০-র দশকে গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থান বেড়েছিল ২.৪ শতাংশ হারে, যাকে বেশ ভালো হার বলা যায়। সংস্কারের কালে সেই হার কমে দাঁড়িয়েছে ০.৭ শতাংশে। এই কমার ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদেশের মোট জনসংখ্যার দশভাগের সাতভাগেই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল।

বিশেষ করে গ্রামে বেকারির হার বাড়ার ও মন্দার কারণ কী? মূল কারণটা নিহিত আছে নয়া-উদারনীতির ব্যয়-কমানোর নীতিতে। তার সাথে আছে বাণিজ্যিক উদারীকরণ, আর সেটা করা হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব বাজারে প্রাথমিক পণ্যগুলির দাম কমে যাচ্ছে। ব্রেটন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নির্দেশিত নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতিমালার মধ্যে রয়েছে একগুচ্ছ সমষ্টিগত অর্থনৈতিক (ম্যাক্রো-ইকনমিক) নীতি, যেগুলি শুধুমাত্র আর্থিক দিক দিয়ে রক্ষণশীল তাই নয়। ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এই নীতিগুচ্ছ সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয়-কমানোর নীতি, সেগুলি আবার একে অন্যের বিরোধিতা করে। এগুলির ফলে পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজকর্ম কমে যায়, যদিও আর্থিক ক্ষেত্র সহ পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায়।

ব্রেটন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশিত কাঠামোগত সংস্কার নীতির উপর ইউনিসেফ-এর অর্থে অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশের উপর করা একগুচ্ছ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বেশির ভাগ দেশেই বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হার কমেছে, প্রকৃত মজুরি কমেছে, দারিদ্র্য বেড়েছে (কর্নিয়া, জোলি ও স্টুয়ার্ট, ১৯৮৭)। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে ১৯৮০-র দশকে বিভিন্ন দেশে যেসব নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে সরকারি ব্যয় কমানো, কঠোর অর্থ ও ফিসকাল নীতি, মজুরি বৃদ্ধি বন্ধ করা ও টাকার দাম কমানো। স্পষ্টতই এগুলি এমন এক নীতিমালা যাতে ব্যয় হ্রাস হয়। ভারতে নয়া-উদারনৈতিক নীতিও যেহেতু পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ও বিশেষত কৃষি ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর নীতি, তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে আমরা একটা কৃষি সংকট তৈরি হতে দেখছি, এবং পাশাপাশি মোট দারিদ্র্য যে বাড়ছে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

মূল্যবৃদ্ধি কমানোর ভুল নীতির ক্ষেত্রে কৃষি সর্বদাই একটা নরম' টার্গেট। ব্রেটন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলিও সেটিকে টার্গেট করতে চায়, তাতে যতই বেকারি আর ক্ষুধা বাড়ুক। মূল্যবৃদ্ধি কমানোর নীতির ফল, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে, ভয়ানক খারাপ হয়েছে। সরকারি পুঁজি গঠন কমে গেছে, সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে বিকাশ খাতে ব্যয়ও অনেক কমে গেছে। 'গ্রামে বিকাশ খাতে ব্যয়'-এর মধ্যে আমি পরিকল্পনার পাঁচটি খাত ধরেছি— ক) কৃষি, খ) গ্রামোন্নয়ন, গ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ঘ) বিশেষ এলাকা কর্মসূচি, ও ঙ) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প। গ্রামের উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বজায় রাখার জন্য এই সব ব্যয়গুলিই জরুরি।

১৯৮৫ থেকে ১৯৯০, সংস্কার-পূর্ব সপ্তম পরিকল্পনা কালে প্রতি বছর নেট জাতীয় উৎপাদনের গড় ৩.৮ শতাংশ প্রতি বছর পূর্বোল্লেখিত গ্রাম উন্নয়ন খাতে খরচ করা হয়েছিল, আর তাতে অ-কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ মজুরি বাড়ার ক্ষেত্রে যে ভালো ফল ফলেছিল তা তথ্যে প্রমাণিত। আমাদের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই যদিও তখন গ্রামীণ জীবনযাত্রার উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই হিসেবে এই ব্যয় খুবই সামান্য। ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দেশিত নীতিমালা প্রয়োগ শুরু হলো। গ্রামীণ বিকাশ খাতে ব্যয় কমে ১৯৯৫-৯৬ সালে হলো নেট জাতীয় উৎপাদনের ২.৬ শতাংশ, আরও কমে ২০০০-১ সালে ১.৯ শতাংশ।

কৃষি সংকটই ২০০৪ সালের মে মাসের নির্বাচনে এনডিএ সরকারের পতনের কারণ। কিন্তু ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় এসে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করলো। নতুন অর্থমন্ত্রী কৃষির ওপর আঘাত হানলেন, গ্রামোন্নয়নের বাজেট প্রস্তাবে মুদ্রা সংকোচনের হাতুড়ির ঘা। ২০০৪-০৫ সালে গ্রাম উন্নয়ন খাতে বাজেট প্রস্তাব আগের বছরের কম হারের চেয়ে আরও কমে গেল, কর্মসংস্থান প্রকল্পে ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ কমানো হলো। ২০০৪-৫ সালের পরিবর্তিত বাজেট এস্টিমেটে গ্রাম উন্নয়ন খাতে ব্যয় সামান্য বাড়িয়ে নেট জাতীয় আয়ের ২.৩ শতাংশ করা হলো। গ্রামীণ মন্দার উপর প্রভাব ফেলতে হলে এটাকে দ্বিগুণ করা দরকার ছিল, তা করা হলো না। বেকারি বাড়ছে, অথচ ব্যয় কমানো হচ্ছে, এমন অবস্থায় ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় এসেই 'ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেটারি ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৪' ঘোষণা করলেন। জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে মোট আর্থিক ঘাটতির হার ২০০০-০১ সালে ছিল ৬.১ শতাংশ, তাকে কমিয়ে ২০০৫-৬ সালে করা হলো ৪.১ শতাংশ। আরও কমিয়ে ৩.৮ শতাংশে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হলো। ২০০৭ সালে বাজেট ঘাটতি সত্যিই কমিয়ে ৩.৭ শতাংশে কমিয়ে আনা হলো— অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় গর্বভরে জানালেন। ফলে আরও বেকারি, কৃষিতে আরও মন্দা হবে বলে ধরা যেতে পারে।

সরকারি বিনিয়োগ ও গ্রাম উন্নয়ন খাতে ব্যয় অযৌক্তিকভাবে কমানোর ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার অর্ধেক হয়ে গেছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার সংস্কার-পূর্ব আশির দশকের তুলনায় নব্বইয়ের দশকে অর্ধেক হয়ে গেছে, দুটিই এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম— যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমেছে। জন-প্রতি উৎপাদন হ্রাস ছিল নব্বইয়ের দশকের

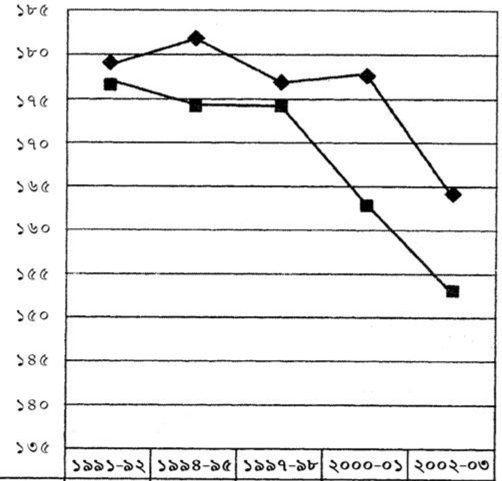
বৈশিষ্ট্য। ষাটের দশকের মধ্যভাগে স্বল্পকালের জন্য যে কৃষি সংকট হয়েছিল তার পর এই প্রথমবার এটা ঘটলো। সেবার এটা ছিল স্বল্পকালের জন্য, আর এবার এক দশক পরেও অবস্থার উন্নতি ঘটে নি। গত ৬ বছরে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ। যদি সবচেয়ে বেশি উৎপাদনের বছর বছর ধরি তাহলে মোট উৎপাদন ২১.২ কোটি টন আর যদি সবচেয়ে কম উৎপাদনের বছর ধরি তাহলে মোট উৎপাদন ১০.৫ কোটি টন। এর মধ্যে ২০০২-৩ সালের খরার বছরটিকে ধরা হয়নি; সে বছর উৎপাদন কমে দাঁড়িয়েছিল ১৮.৩ কোটি টনে। এদেশের জন-প্রতি উৎপাদন আগের চেয়ে দ্রুত কমছে। এখন যেহেতু রপ্তানির জন্য ফসল আর বায়ো-জ্বালানির জন্য আরও বেশি জমি ব্যবহার হবে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই প্রবণতা চলতেই থাকবে।

সংক্ষেপে বললে, ব্যয় কমানোর সমষ্টিগত-অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলি আজকের কৃষি সংকট ও তা থেকে উদ্ভূত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস বোঝার চাবিকাঠি। অথবা, কেইনসীয় সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায়, এগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মোট কার্যকর চাহিদাকে দারুন সঙ্কুচিত করে। সরকারি খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারে কেন ৬.৪ কোটি টনের মতো অস্বাভাবিক পরিমাণ খাদ্যশস্য পড়ে আছে, বাফার স্টক, যা ২০০২ সালের জুলাই মাসে যা স্টক করা হয়েছিল, তার চেয়ে ৪ কোটি টন বেশি— তা বোঝারও চাবিকাঠি এই নীতিমালা। এই ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে খালি পেট থেকে। সরকার ও অমর্ত্য সেন সহ বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ এই ক্রমবর্ধমান ভাণ্ডারের এবং তার ফলে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি কমে যাওয়ার একেবারে ভুল এক ব্যাখ্যা হাজির করছেন। তাঁরা দেখতে অস্বীকার করছেন যে, এই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ইচ্ছে করে করা হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি কমানোর সরকারি নীতির মাধ্যমে। মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস 'খুব বেশি' হওয়ার ওপর তাঁরা দোষ চাপাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন যে এর ফলে কৃষকদের কাছে 'ভুল বার্তা' যাচ্ছে, তারা বাজারের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করছে। এঁদের বক্তব্য, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কমাতে হবে। যুক্তিটা একেবারে ভুল। এতে এই তথ্যগুলি হিসাবে আনা হচ্ছে না যে, জনপ্রতি খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্রুত কমছে, চাহিদা যদি ১৯৯৮ সালের স্তরে রাখা যেত তাহলে ২০০২ সালে ২.২ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হতো। অতি-উৎপাদন নয়, চাহিদা হ্রাসই এই পর্বতপ্রমাণ উদ্বৃত্ত ভাণ্ডারের কারণ।

এই ভুল বিশ্লেষণের ফলে সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া হলো। এদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। কৃষকদের আয় কমে গেল, সাধারণ মুদ্রাসংকোচন নীতি (বাজারে অর্থের যোগান কমিয়ে দেবার নীতি— অনুবাদক) কৃষকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হলো, ফলে চাহিদা হ্রাসের সমস্যা আরও বেড়ে গেল। কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য ভাণ্ডারকে ব্যবহার করে কমে যাওয়া ক্রয়শক্তি বাড়ানোর ও তার ফলে মোট চাহিদা বাড়ানোর চেষ্টার বদলে ২০০২ ও ২০০৩ সালে সরকারি ভাণ্ডার থেকে ভরতুকি দিয়ে কম দামে ২.২ কোটি টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হলো—

চার্ট ১

খাদ্যশস্য উৎপাদন ও জনপ্রতি লভ্যতা : বার্ষিক কিলোগ্রাম হিসাবে - তিন বছরের গড় ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৩-০৪



	১৯৯১-৯২	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৭-৯৮	২০০০-০১	২০০২-০৩
◆ মাথাপিছু উৎপাদন, কেজি-তে	১৭৮.৮	১৮১.৬	১৭৬.৮	১৭৭.৭	১৬৪.১
■ মাথাপিছু লভ্যতা, কেজি-তে	১৭৭	১৭৪.৩	১৭৪.২	১৬৩.২	১৫৩

সেই খাদ্যশস্য বোধ হয় মূলত ইউরোপের গবাদি পশু আর জাপানের শুয়োরদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলো।

চাহিদা ও যোগানের মধ্যেকার একটা দ্বন্দ্বের ব্যাপার ঘটছে আমাদের চোখের সামনে। উৎপাদন যে হারে কমছে তার চেয়ে বেশি হারে মোট চাহিদা কমিয়ে আনার ফলে প্রথমে একটা অবিক্রীত শস্যের ভাণ্ডার গড়ে তোলা হলো। তারপর সরকার কৃষকদের ভুল বার্তা দিলেন যে খাদ্যশস্য উৎপাদন কমাতে হবে। রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষত যে রাজ্য সরকারগুলি বিশ্ব ব্যাংক বা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের ঋণ নিয়েছে তারা, বিদ্যুতের দাম বাড়াতে থাকল, জলের বাজার-দাম নিতে এগিয়ে এলো, সারে যে সামান্য ভরতুকি ছিল তাও কেটে নেওয়া হলো, কৃষকদের মহাজনদের কাছে ঠেলে দেওয়া হলো, কারণ ঋণদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী ক্ষেত্রের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হয়েছে— এখন অগ্রাধিকার পাবেন বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক খাতকরা— তার ফলে কৃষকরা ও ক্ষুদ্র শিল্প অর্থের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। এসব কিছুর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেল, কৃষকদের জন্য ঋণের খরচ বেড়ে গেল, অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়লো না, কোথাও কোথাও কমেও গেল— রাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করলো না।

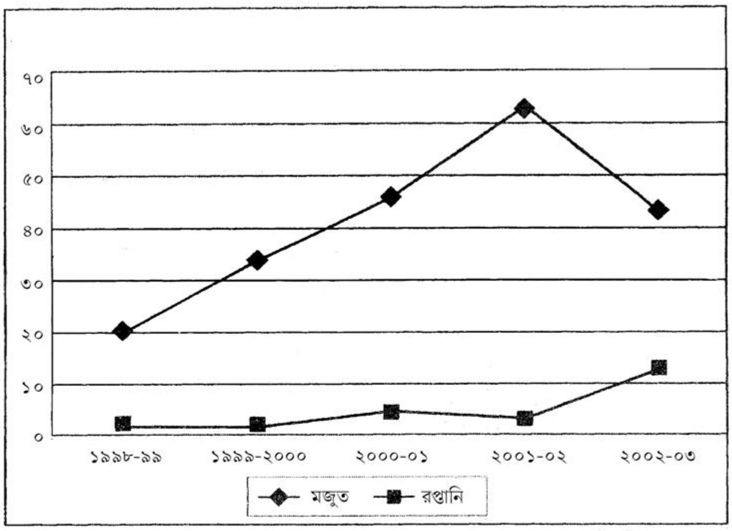
আগেই দেখেছি, অমর্ত্য সেন সহ এদেশীয় ও বাইরে বসবাসকারী জ্যোতিষ্কদের এই বিপর্যয়ে একটা ভূমিকা ছিল। কারণ সংকটের মুহূর্তে তাঁরা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বলেছেন যে সংগ্রহমূল্য বেশি থাকাটা কৃষকদের 'ভুল বার্তা' দিচ্ছে, তার ফলে কৃষকরা 'অতি-উৎপাদন করছে। এ তথ্যটা তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন যে— হয়ত বা সত্যটা কী তা জানার চেষ্টাও করেননি— অতি-উৎপাদন কারণ হতে পারে না, কারণ জন-প্রতি উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। আসলে যা হয়েছে তা হলো চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। সরকার কিন্তু কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে চাহিদা বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ নিলেন না, বদলে যা করলেন তা করার একেবারেই দরকার ছিল না। খাদ্যশস্যের সংগ্রহমূল্যের বৃদ্ধি তো তারা বন্ধ করলেনই— যদিও উৎপাদন ব্যয় ও ঋণের খরচ দুটোই বাড়ছিল— ফলে আরও কৃষকদের আয় কমে গেল। পাশাপাশি তারা সংগ্রহ অভিযানকে কমিয়ে আনলেন, যাতে করে কৃষকরা খাদ্যশস্যের মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস না পায়, এবং 'কার্গিল'-এর মতো বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে মন্দা-আক্রান্ত কৃষকদের কাছ থেকে ঘোষিত সংগ্রহমূল্যের চেয়ে কম দরে ফসল কিনতে অনুমতি দেওয়া হলো।

ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের কাজকর্ম এখন একেবারে কমিয়ে আনা হয়েছে। অ-খাদ্য রপ্তানি ফসলের ক্ষেত্রেও রাজ্য পণ্য বোর্ডগুলি যেখানে আগে তুলো, কফি, চা, গোলমরিচ ইত্যাদি কিনত, ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে তাদের কাজকর্মও ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে— এখন তারা কোনো কাজই করে না। এইসব ফসলের কৃষকরা এখন বিশ্ব বাজারে দাম পড়ে যাওয়ার বিপদের মুখোমুখি। ফলে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশে, কর্নাটকে, কেরালায় অনেক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

আমাদের সরকার যে নেতিবাচক বার্তা পাঠাচ্ছেন, এক

চার্ট ১ (ক)

খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার ও রপ্তানি (মিলিয়ন টনে)



দশক জুড়ে রাষ্ট্র কৃষকদের বেঁচে থাকার ওপর যে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তার ফলে আমাদের কৃষকরা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে আজ খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ, অনেক অর্থকরী ফসলের (ক্যাশ ক্রপের) উৎপাদন কমছে, প্রাণীজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও কমছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন যে জিডিপি-র ১০ শতাংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছেন, ৪০ কোটির বেশি লোক যদি গভীর অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের পশুভাণ্ডার ও জমি হারায়, তাহলে সেটাও কি ভালোভাবে কাজ করবে?

৩। কৃষিতে মন্দা, পশু ক্ষয় ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধি

কৃষকদের বেঁচে থাকার ওপর একবগ্‌গা ও স্থূল আক্রমণের মাধ্যমে আমাদের সরকার যে এদেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধি-হীনতার যুগে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন— তা আমরা দেখেছি। অন্যান্য পণ্যের ওপরও এর প্রভাব আছে। বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদই এটা লক্ষ্যও করেননি যে দেশে প্রাণীজ পণ্যের উৎপাদনও (দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি) কমতে শুরু করেছে, কারণ সস্তা প্রাণীখাদ্যের জন্য এগুলি ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, আর সেগুলির দামও বাড়তে শুরু করেছে। গত কয়েক বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ভূষির (ফুড-রাফেজ) দাম বেড়ে গেছে। জমি ও পশু সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৯২ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে গবাদি পশু, ছাগল জাতীয় পশু ও দুধেল পশুর সংখ্যা প্রায় সব রাজ্যেই এবং সর্বভারতীয় স্তরে অনেক কমে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ ঘটনা কখনো ঘটে নি। এর কারণ এই যে গরিব ও ছোট চাষিরা, বিশেষ জমি না থাকলেও এইসব পশুর একটা বড় অংশ যাদের হাতে ছিল, তাঁদের পক্ষে এখন এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে, আর তাঁরা বিরাটভাবে এগুলি হারাচ্ছেন।

সারণি ২-এ সারা ভারতে পশু মালিকানার চিত্র দেখানো হয়েছে। গ্রামের মানুষের ৮০ লক্ষ গবাদি পশু, ৪০ লক্ষ ছাগল জাতীয় পশু ইত্যাদি, এবং ১.১ কোটি হাঁসমুরগি কমে গেছে। তাছাড়া, শূন্য থেকে ১ হেক্টর জমির মালিক অর্থাৎ জমির মালিকানার হিসাবে সবচেয়ে কম জমির মালিক গ্রামীণ পরিবারগুলির প্রায় ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে দুধেল গরু ইত্যাদির সংখ্যা কমে গেছে। আর এক-দশমাংশ ধনী পরিবারেরও দুধেল গরু ইত্যাদির সংখ্যা বাড়লেও অতখানি বাড়েনি। ফলে এক দশকে গড় সংখ্যাটা (প্রতি ১০০ পরিবারে) ৪৬ থেকে কমে ৩৬-এ নেমে এসেছে। ছাগল ইত্যাদি পশুর ক্ষেত্রে, ছাগলের সংখ্যা দ্রুত কমছে, কারণ ভারতের শহুরে স্বচ্ছল পরিবারগুলি ও পশ্চিম এশিয়া থেকে চাহিদা এত বেশি যে এই পশুগুলি দিন দিন আরও কম গড় ওজনেই জবাই করে ফেলা হচ্ছে, পশুর

সারণি ২

গবাদি ও ছাগজাতীয় পশু ও দুধেল গরু ইত্যাদির সংখ্যার ক্রমাবনতি : ভারতের প্রতিটি ১০০ পরিবারে

এনএসএস রাউন্ড নং	*৪৮তম (১৯৯১-৯২) (মোট সংখ্যা: মিলিয়ন)*		*৫৯তম (২০০২-০৩) (মোট সংখ্যা: মিলিয়ন)*
গবাদি + মোষ	২৩৮		২৩০
ছাগজাতীয় : ভেড়া + ছাগল	৯৯		৯৫
পোলট্রি	১৯৩		১৮২
খামারের আয়তন (হেক্টর)	*দুধেল গরু-মহিষের সংখ্যা প্রতি ১০০ পরিবারে*		*পরিবার শতকরা হার*
	১৯৯১-৯২	২০০২-০৩	২০০২-০৩
শূন্য: ০.০০ থেকে ০.০০২	৬	১	৩১.৯
প্রান্তিক: ০.০০২ থেকে ১.০০	৪১	৪০	৪৭.১
ক্ষুদ্র: ১.০১থেকে ২.০০	৬৯	৬৩	১১.২
আধামধ্য: ২.০১ থেকে ৪.০	৮০	৮৪	৬.২
মধ্য: ৪.০ থেকে ১০.০	১০২	১২৬	২.৯
বড়: ১০.১ ও তার বেশি	১৩০	২০৮	০.৫
সব মিলে	৪৬	৩৬	১০০.০

উৎস: এনএসএস রিপোর্ট ৪৯৩, ৫৯ তম। লাইভস্টক ওনারশিপ অ্যাক্রস অপারেশনাল ল্যান্ড হোল্ডিং ইন ইন্ডিয়া ২০০৩-০৪, পৃ. ১৪-১৫। শেষ কলামটি যোগ করে ঠিক ১০০ হয় না, কারণ বিভিন্ন সংখ্যাগুলিকে কাছাকাছি সংখ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে, কেবলমাত্র ওপরের দিকের ৯.৬ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রেই কেবল দুধেল গাইয়ের মালিকানা বেড়েছে, বাকি ৯১.৪ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে তা কমেছে।

সংখ্যা এক রাখার জন্য জনন যতটা হওয়া দরকার ততটার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকরা আরও কমবয়সী পশুকে নেহাত কম দামে জবাইয়ের জন্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন, এমনিতে তাঁরা যা কখনোই করতেন না।

১৯৯৯-০০ থেকে ২০০৪-০৫ সালে কৃষি-মজুরদের ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক বেড়েছিল মাত্র ১১ শতাংশ, যেখানে ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়েছিল ৬০ শতাংশ। জনগণের চাহিদা হ্রাসের ফলে দাম কমে— এই অর্থে যে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যায়। ততদিনে অবশ্য শস্য উৎপাদন এতটাই কমে গেছে— ছ বছর ধরে বৃদ্ধির হার শূন্য— যে আবার মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। ২০০৬-০৭ সালে মূল্যবৃদ্ধি আবার নতুন করে দেখা দেয়— তার কারণ অনেকটাই চার বছর ধরে দখলের পরও ইরাককে, সেখানকার চলতে থাকা প্রতিরোধকে 'শান্ত' করতে না পারার পর আমদানি-কৃত জ্বালানির বেশি দামের জন্য। ভারতের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনে আছে উৎপাদন হ্রাস, এদেশের ধনীদের প্রচুর ফসল-ব্যয়ে উৎপাদিত প্রাণীজ পণ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে যে উৎপাদন হ্রাস অত্যন্ত দ্রুত। আর এসব ঘটছে এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে দুধেল পশুর সংখ্যা ও হাঁসমুরগির সংখ্যা কমছে, খানিকটা কমছে শস্য উৎপাদন কমার ফলে পশুখাদ্যের দাম বাড়ার জন্য, আর খানিকটা ঋণগ্রস্ততার জন্য সম্পদহানির জন্য। এসব আমরা আগেই দেখেছি। এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে গত বছরে ডাল, দুধ ও পোলট্রির ডিম-মাংসের দাম দারুন বেড়ে গেছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন যে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে মূল্যবৃদ্ধি যে কম ছিল, সেটা 'কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রের আন্তঃসম্পর্কের শক্তি কমার' সূচক। এর কারণ, কাঁচা মালের জন্য অ-কৃষি ক্ষেত্রের কৃষির ওপর নির্ভরতা কমে যাচ্ছে, কারণ এখন বৃদ্ধি হচ্ছে মূলত নির্মাণ শিল্পে ও পরিষেবা শিল্পে। কিন্তু এটা বলার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিবিদরা মূল ব্যাপারটাই বাদ দিয়ে ফেলছেন। ধারণার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন অন্ধ যে তাঁরা নয়া-উদারনৈতিক সংস্কারের সব চেয়ে বড়ো ব্যাপার, জনগণের চাহিদা কমে যাওয়ার ব্যাপারটাকেই, অগ্রাহ্য করছেন।

কৃষি ও অ-কৃষির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক শুধুমাত্র কাঁচামালের চাহিদার মধ্য দিয়েই থাকে না। এই আন্তঃসম্পর্ক কখনোই কমে না, কারণ প্রতিটি মানুষকেই খেতে হয়, পান করতে হয়, জামাকাপড় পরতে হয়, চলাফেরা করতে হয়। তাই অ-কৃষি থেকে আসা ক্রমবর্ধমান আয় সবসময়েই সব ধরনের খাদ্যের চাহিদা বাড়ায়, ফসল-খাদক পশুজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায়, আর যেমন গাড়ি চালানোর জৈব জ্বালানি ধরনের নতুন সব চাহিদার তো কথাই নেই। তার ওপর এই ক্রমবর্ধমান দেশীয় চাহিদার সঙ্গে যোগ হয় উন্নত দেশগুলির চাহিদা, কারণ বাণিজ্যের উদারীকরণ হয়ে গেছে, আর আমাদের কৃষি বিশ্ব চাহিদার কাছে পুরোপুরি 'খুলে গেছে'। এমন অবস্থায়, যখন উৎপাদন বৃদ্ধি কমছে, শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ যোগান বাড়ছে না, তখন দিন দিন ধনী হতে হওয়া সংখ্যালঘু ভারতীয়দের পশুজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, কারণ তারা উত্তর গোলার্ধের মানুষদের খাদ্যের ধরন অনুকরণ করতে চাইছেন, পাশাপাশি কর্পোরেট কৃষিবাণিজ্যের চাহিদা, যার ফলে প্রতিদিন জমি খাদ্য উৎপাদন থেকে ফল, ফুল ও ধনী বিদেশি সুপারমার্কেটে যাওয়া লোকেদের জন্য নানান পণ্য উৎপাদনে চলে যাচ্ছে— এসব কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে বাধ্য। আর একটা অতিরিক্ত ও নতুন বিপদ হলো গাড়ি চালানোর জীবাশ্ম জ্বালানির দাম বাড়ার ফলে জৈব জ্বালানির জন্য জমি চলে যাওয়া। এই সব ক্রমবর্ধমান প্রধানত শহুরে চাহিদা এবং বিদেশের চাহিদা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এবং মূল্যবৃদ্ধি যে আরও বেশি হচ্ছে না তার কারণ আর্থিক ও ফিসকাল চাপের মধ্য দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; তার ফলে আবার ধনীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জায়গা করে দিতে গরিব জনগণের মোট চাহিদা আরও কমে যাচ্ছে।

যারা বলেন যে প্রবৃদ্ধির ওপর আর কৃষিপণ্য যোগানের চাপ নেই, তারা অনেকদিন আগেকার কথা বলছেন। নয়া-উদারনৈতিক নীতির মধ্যে নিহিত উৎপাদনের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে নতুন একটা যোগান সমস্যা তৈরি হচ্ছে, আরও বেশি মূল্যবৃদ্ধি যে হচ্ছে না সেটা ব্যয় কমানোর নীতি নিয়ে গরিব জনগণের ভোগের মান আরও কমানোর কারণে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬১তম রাউন্ডে (২০০৪-০৫) ভোগব্যয় ১৯৯৩-৯৪ সালের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র গ্রামীণ দারিদ্র্যই নয়, শহরের দারিদ্র্যও বেড়েছে। একটা বড় সংখ্যার মানুষ আগের তুলনায় খারাপ পুষ্টির মানে চলে এসেছেন। সারণি ৩-এ ১৯৯৩-৯৪ সালের ৫০তম রাউন্ড আর ২০০৪-০৫ সালের ৬১তম রাউন্ডের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। যেসব গ্রামীণ মানুষ প্রতিদিন ২৪০০ ক্যালরি খাদ্য পান না তাদের সংখ্যা ৭৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৭ শতাংশ— এটা একটা রেকর্ড। আর যারা ২২০০ ক্যালরিও পান না তাদের সংখ্যা ৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ। এমনকি হত-দরিদ্র যারা ১৮০০ ক্যালরি খাদ্যও পান না তাদের সংখ্যাও এক দশকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বেড়েছে।

সরকারি দারিদ্র্য পরিসংখ্যান (সারণি ৩-এ দু বছরের হিসাব দেখানো হয়েছে) যুক্তির হিসেবে ভুল। কারণ এতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ভোগ করেন এমন মানুষের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে তুলনা করা হয়নি। এতে এমন একটি ভুল নিয়মে হিসাব করা হয়েছে যার ফলে দারিদ্র্য রেখা সবসময় কম দেখানো হয়, আর গত ৩০ বছর ধরে দারিদ্র্য-রেখার জন্য খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়ে আনা হয়েছে। এতে ক্যালরির পরিমাণ

সরকারি হিসেবের অনেক তলায়। তার ফলে ভুলভাবে দেখানো হচ্ছে যে দারিদ্র্য কম, দারিদ্র্য কমছে— আসলে যেখানে দারিদ্র্য বাড়ছে। ২০০৪-০৫ সালের সরকারি দারিদ্র্য রেখায় দৈনিক ক্যালরির পরিমাণ মাত্র ১৮২০ ক্যালরি, প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ক্যালরির চেয়ে প্রায় ৬০০ ক্যালরি কম। একই সময়ে শহরের দারিদ্র্যও অনেকটা বেড়েছে। ২০০৪-০৫ সালে সর্বভারতীয় স্তরে শহরের সব মানুষের মধ্যে ৬৫ শতাংশ সরকারি হিসাব অনুযায়ী দৈনিক প্রয়োজনীয় ২১০০ ক্যালরি পান না। ১৯৯৩-৯৪ সালে হারটি ছিল ৫৭ শতাংশ। যেসব রাজ্যে বড় বড় মেট্রো শহরগুলি আছে সেই রাজ্যগুলিতে দারিদ্র্য বেড়েছে এই গড় হারের চেয়ে আরও বেশি হারে। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে ২১০০ ক্যালরির নিচে শহুরে দারিদ্র্য এক দশকে বিরাট বেড়েছে— ৫৩ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে।

এছাড়াও জাতীয় নমুনা সমীক্ষাগুলি দেখিয়েছে যে জন-প্রতি প্রকৃত ব্যয়, খাদ্যে ও জামাকাপড়ে, ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৪-০৫ সালের মধ্যে অনেকটা কমে গেছে। (কৃষি ও শিল্পের মধ্যে) যোগ কমে যাওয়ার কথা বলে এই অর্থনীতিবিদরা আসলে কৃষি সমস্যা ও ক্রমবর্ধমান শহুরে দারিদ্র্যর একটা প্রতিক্রিয়াশীল যৌক্তিকতা তৈরি করেন— তা যেন একটা প্রযুক্তি-জাত সমস্যা, সরকারি নীতি নির্ধারিত সমস্যা নয়। তাঁরা এটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন, হয়তো তাঁরা এই তথ্যাবলী দেখারও দরকার মনে করেন না যে, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬১তম রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে খাদ্য ও জামাকাপড়, দুটোর ওপর ব্যয়ই ৫০তম রাউন্ডের তুলনায় কমেছে। এর অর্থ চাহিদা হ্রাস।

কৃষির মন্দার জন্য সরকার যে দীর্ঘমেয়াদী 'সমাধান' প্রস্তাব করেন, ভারতীয় কৃষির রপ্তানিমুখী কর্পোরেটকরণ, যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, তা অবস্থাকে আরও খারাপ করবে। খাদ্যশস্য ও পশুজাত দ্রব্যের সংকট বাড়বে, তার ফলে আমদানি আরও বাড়াতে বাধ্য হবো। ব্রেটন উড্‌স চুক্তির তত্ত্ব ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের মধ্য দিয়ে উন্নত দেশগুলি আসলে এটাই করতে চাইছে, যাতে খাদ্যশস্য ও শস্য-নির্ভর পশুজাত পণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব উৎপাদন ও আত্মনির্ভরশীলতা এমন মার খেয়ে যায় যে আমাদের দেশীয় চাহিদা দারুন কমে গেলেও শহরের ভোক্তাদের জন্য দাম যাতে না বেড়ে যায় তার জন্য পণ্য আমদানি করতে হয়। আমাদের চোখের সামনে তাদের এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি চলছে। নিম্ন মানের অস্ট্রেলীয় গম আমদানি করা হচ্ছে, অথচ দেশের গম উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। একই ভাবে প্যাকেটজাত দুধ আমদানিও শুরু হয়ে গেছে।

মন্দার মতান্ধতায় শৃঙ্খলিত বর্তমান সরকার শুধু একভাবেই চিন্তা করতে পারে— প্রথমত, মন্দাস্ফীতির ফলে উদ্ভূত মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করতে তারা এমন পরিমাণ আমদানি করে যা শহুরে মধ্যবিত্তকে চুপ করিয়ে দেয়, দ্বিতীয়ত, মোট চাহিদাকে দমন করে রাখার জন্য তারা আবার গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষের উপর মুদ্রাসংকোচনের ঘা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পকে প্রদেয় অর্থ কমানো হচ্ছে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ন্যাবার্ডকে প্রদেয় ঋণের সাধারণ লাইনটি তুলে নিচ্ছে। দেশের হাতে এখন পর্বতপ্রমাণ বিদেশি মুদ্রা সঞ্চিত রয়েছে, ১৩০০০ কোটি ডলার, অথচ রিজার্ভ ব্যাংক গ্রামোন্নয়নের জন্য টাকা দিচ্ছে না।

সারণি ৩

সরাসরি দারিদ্র্যের সরাসরি হিসেব: ২০০৪-০৫, গ্রামীণ ভারত

৬১তম রাউন্ড	২০০৪-০৫			
ক্যালরি গ্রহণ	**২৪০০**	**২২০০**	**২১০০**	**১৮০০**
সরাসরি হিসেব				
নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণকারী	৮৭.০	৬৯.৫	৬০.৫	২৫.০
৫০তম রাউন্ডে (১৯৯৩-৯৪) সমমাত্রার হিসাব	৭৪.৫	৫৮.৫	৪৯.৫	২০.০
এই পরিমাণ ক্যালরির জন্য প্রয়োজনীয় মাসিক ব্যয় (টাকা)	৭৯৫	৫৭৫	৫১৫	৩৪২
পরোক্ষ সরকারি হিসেব	**১৯৯৩-৯৪**		**২০০৪-০৫**	
সরকারি দারিদ্র্য রেখা (টাকা)	২০৬		৩৫৬	
সরকারি দারিদ্র্য রেখার নিচে শতকরা কতজন	৩৭.৩		২৮.৩	
সরকারি দারিদ্র্য রেখায় ক্যালরি গ্রহণ	১৯৮০		১৮২০	

উৎস: উৎসা পট্টনায়ক, 'নিওলিবারেলিজ্‌ম অ্যান্ড রুরাল পভার্টি', ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জুলাই ২৮- আগস্ট ৩, ২০০৭। এনএসএস রিপোর্ট ৫১৩, নিউট্রিশনাল ইনটেক ইন ইন্ডিয়া ২০০৪-০৫, এ-১৮ ও এ-৯০ থেকে হিসাব করা। লক্ষ্য করে দেখুন, সরকারিভাবে দরিদ্রদের অনুপাত ও তার হ্রাস দুটোই বানানো, কারণ এই দারিদ্র্য রেখায় পুষ্টির যে মান নেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনীয় দৈনিক পরিমাণের চেয়ে অনেক কম, আর সেটি দিন দিন আরো কমানো হয়েছে।

নীতিপ্রণেতারা মনে হয় ঔপনিবেশিক যুগের মতো পুরোপুরি দুর্ভিক্ষ না ঘটিয়ে তৃপ্ত হবেন না। তাঁদের ইচ্ছা, কোটি কোটি ভারতের নাগরিকের ক্ষুধা বৃদ্ধির বিনিময়ে ভারত যেন আবার উন্নত দেশগুলির সুপারমার্কেটগুলি আর দেশের ধনীদের জন্য যোগানের উৎস হয়ে ওঠে।

৪। মন্দা ও নিঃস্বকরণ, কৃষিতে পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি আর নয়

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া, ১৯৬০-১৯৯০ পর্যন্ত তিন দশকে যা এগিয়ে যাচ্ছিল, এখন মন্দার ভারে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা দেখছি যে, আজ কৃষকদের নিঃস্বকরণ করা চলছে, মহাজনি ও ক্ষুদ্র টেনান্সি (বর্গাচাষ) ফিরে এসেছে। আমাদের প্রগতিশীল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এখন 'কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ' নিয়ে মার্কসবাদী আলোচনা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না, তাদের মার্কসীয় তত্ত্ব পড়ানোও হয় না, আর তারা নিজেরাও এত পন্ডিত নন যে নিজেরাই মার্কস- লেনিন পড়ে বুঝবেন। তাই তারা একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান যে, কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ পুঁজিবাদী বিকাশকে তাঁরা উৎপাদন সম্পর্কের ভিতরকার পরিবর্তনের সঙ্গে, কৃষি ক্ষেত্রে শ্রেণীকাঠামোর সঙ্গে, যুক্ত বলে জানেন না, জানেন নতুন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত, তাদের ধারণা অনুযায়ী দেশি ও বিদেশি কর্পোরেটরা যা কৃষিতে নিয়ে আসছে বা আনবে। কিন্তু কর্পোরেটকরণের এই প্রক্রিয়া মার্কসীয় চিন্তাধারায় একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এটি হলো কৃষকদের বাইরের পুঁজির (বহুজাতিকরা বা দেশীয় কর্পোরেশনগুলি সবই কৃষি ক্ষেত্রের বাইরের) অধীন করার প্রক্রিয়া, কৃষি ক্ষেত্রের ভেতর থেকে পুঁজিবাদের বিকাশ নয়।

মার্কসীয় চিন্তাধারায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বলতে কী বোঝায়? বোঝায় কৃষকদের বর্গীকরণের এক প্রক্রিয়া, যাতে ধনী কৃষকরা ক্রমশ বেশি করে ভাড়া করা মজুর দিয়ে মুনাফা-মুখী চাষের জন্য দিন দিন বেশি বিনিয়োগ করবেন। ভারতের ক্ষেত্রে ভূস্বামী পুঁজিবাদের ব্যাপারটিও জোরালো, তার অর্থ, আগে যারা বড় বড় খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামী ছিলেন তারা তাদের যৌথমালিকানার খামার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে, প্রজা-চাষির (টেনান্ট ফার্মার) হাত থেকে জমি নিয়ে, ভাড়া করা মজুর দিয়ে মুনাফামুখী উৎপাদন শুরু করলেন। *অ্যাগ্রারিয়ান কোয়েশ্চন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন ইন্ডিয়া* (১৯৮৬) রচনায় বর্তমান লেখক এই প্রবণতাগুলির কথা লিখেছেন। তাতে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যে সরকারের সে পর্যন্ত বর্ধমান আর্থিক প্রবণতার অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের, ক্রমবর্ধমান দেশীয় বাজার তৈরি হয়েছে, খাদ্যশস্য উৎপাদন আরও লাভজনক হয়ে উঠেছে। তার ফলেই আবার পরবর্তীকালে 'অপারেশন ফ্লাড' নামে সাদা বিপ্লব ও অন্যান্য নানান প্রকল্পের মাধ্যমে পশুজাত দ্রব্য উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৬৯ সালে ব্যাংক জাতীয়করণের পর কৃষি ক্ষেত্রে তুলনায় কম সুদে ঋণদান দ্রুত বাড়ে, ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য বিভিন্ন পণ্য কেনার বোর্ডগুলির কাজকর্ম বাড়ার ফলে বাজার ও দামের ক্ষেত্রে বেশি সুরক্ষা পাওয়া যায়, যার ফলে ভূস্বামী ও কৃষক, বিশেষ করে সম্পন্ন ধনী কৃষকদের, মোটামুটি টিকে থাকার মতো মধ্য ও ক্ষুদ্র কৃষকদের, কৃষিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পক্ষে ভালো অবস্থা সৃষ্টি হয়।

মুদ্রা সংকোচনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাণিজ্যের উদারীকরণের যুগে এই সব প্রবণতাগুলি সম্পূর্ণ উল্টে গেল। উৎপাদনের উপকরণগুলির দাম বাড়িয়ে, সস্তার ঋণ বন্ধ করে দিয়ে, বাণিজ্য উদারীকরণের জমানায় দাম কমার মুখে প্রাইস সাপোর্ট তুলে নিয়ে, সরকারের দিক থেকে কৃষকদের টিকে থাকার ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চলছে। ৯৬ শতাংশ বা রেকর্ড সংখ্যক কৃষক বিপদে পড়েছেন, সব মিলিয়ে তাঁরা তাঁদের সামান্য ভোগটুকু করার মতো আয় করতে অক্ষম হচ্ছেন— জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সিচুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে-তে তাই দেখা যাচ্ছে। এটির মূল ফলাফল পাওয়া যায় রিপোর্ট ৪৯৭-এ। সারণি ৪-এ সেটির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলো। স্পষ্টত, ঘাটতিটা মেটানো হচ্ছে ধার করে ও সম্পদ বেচে দিয়ে। আমরা যদি উৎপাদনশীল সম্পদের জন্য নেট যে বিনিয়োগটা হয়েছে সেটাকে ধরি তাহলে এই ঘাটতি আরও বাড়ে। সারা ভারতের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি সামান্য হলেও আছে, কিন্তু বেশ কিছু রাজ্যে কৃষকদের একটা বড় অংশের জন্য এই অংকটি ঋণাত্মক। (যেমন কেরালায় কৃষকদের ৭২ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষকের নেট বিনিয়োগ ঋণাত্মক, আবার বড় আকারের খামারগুলোর ক্ষেত্রেও বড় আকারের ঋণাত্মক বিনিয়োগ দেখা যাচ্ছে।)

সন্দেহ নেই যে ২০০২-০৩ বছরটা ছিল একটা খারাপ খরার বছর। কিন্তু টিকে থাকতে অসমর্থ কৃষকদের সংখ্যাটা একটা সাধারণ বছরে ৯০ শতাংশ থেকে ১০-১৫ শতাংশ-পয়েন্ট মতো কমবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিন-চতুর্থাংশ থেকে চার-পঞ্চমাংশ কৃষক তাদের আয় দিয়ে নিজেদের সর্বনিম্ন ভোগও মেটাতে পারছে না। কৃষির দুর্গতি প্রকাশিত হচ্ছে কৃষকদের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে— যার পিছনে আছে নয়া-উদারনৈতিক নীতি উদ্ভূত উৎপাদনের লাভজনকতা পড়ে যাওয়া, সারণি ৩-এ যা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম অবস্থায় ঋণের কারণে কৃষকদের পশুর সংখ্যা কমে যায়, আর শেষ পর্যন্ত জমিও চলে যায়। পশু কমাটা সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে। দশ জন কৃষকের মধ্যে নয় জনের ক্ষেত্রেই এক দশক আগের তুলনায় পশুপাখির সংখ্যা এখন কম। আর জমি হারানোর ব্যাপারটা কী রকম?

সারণি ৪ **গ্রামীণ ভারত: সব উৎস থেকে কৃষকদের মাসিক আয়, ভোগব্যয় ও উৎপাদক সম্পদে বিনিয়োগ** *(টাকায়)* ২০০২-০৩

মোট এলাকা	*মোট আয়*										
(হেক্টর)	*মজুরি*	*কৃষি*	*পশুজাত*	*খামার*	*মোট*	*ভোগ*	*বিয়োগফল*	*বিনিয়োগ*	*উদ্বৃত্ত/ঘাটতি*	*পরিবার (%)*	*(ক্রমপুঞ্জিত %)*
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ = ৬-৭	৯	১০ = ৬-(৭+৯)	১১	১২
< ০.০১	১০৭৫	১১	৬৪	২৩০	১৩৮০	২২৯৭	-৯১৭	৪০	-৯৫৭	১১.৬	১১.৬
০.০১-০.০৪	৯৭৩	২৯৬	৯৪	২৭০	১৬৩৩	২৩৯০	-৭৫৭	৩৭	-৭৯৪	৩৪	৪৫.৬
০.০৪-১.০	৭২০	৭৮৪	১১২	১৯৩	১৮০৯	২৬৭২	-৮৬৩	৯৬	-৯৫৯	২৭.৬	৭৩.২
১.০-২.০	৬৩৫	১৫৭৮	১০২	১৭৮	২৪৯৩	৩১৪৮	-৬৫৫	১৫১	-৮০৬	১৫.১	৮৮.৩
২.০-৪.০	৬৩৭	২৬৮৫	৫৭	২১০	৩৫৮৯	৩৬৮৫	-৯৬	৩৮৭	-৪৮৩	৭.৯	৯৬.২
৪.০-১০.০	৪৮৬	৪৬৭৬	১২	৫০৭	৫৬৮১	৪৬২৬	১০৫৫	৬৮৫	৩৭০	৩.৩	৯৯.৫
> ১০.০	৫৫৭	৮৩২১	১১৩	৬৭৬	৯৬৬৭	৬৪১৮	৩২৪৯	৭৩৭	২৫১২	০.৫	১০০.০
সর্বমোট	**৮১৯**	**৯৬৯**	**৯১**	**২৩৬**	**২১১৫**	**২৭৭০**	**-৬৫৫**	**১২৪**	**-৭৭৯**	**১০০**	

উৎস: এনএসএস রিপোর্ট ৪৯৭, ইনকাম, এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড প্রোডাক্টিভ অ্যাসেট্স অফ ফার্মার হাউসহোল্ড্স, টেবিল এ-১৯২। কলাম ৮ ও ১০ লেখকের হিসেব করা। লক্ষ্য করুন যে, মাত্র ৩.৮ শতাংশ পরিবার তাদের ভোগব্যয় মেটাবার মতো আয় করে, অন্যরা সবাই ঘাটতিতে ভুগছে।

সংযোজন : সারণি এ-১ গ্রামে পরিবারগুলির মালিকানায় জমির বিন্যাস: সারা ভারত, গ্রামীণ, ২০০৩

কলাম ২ থেকে ৭-এ মালিকানাধীন জমির বিভিন্ন শতকরা ভাগ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের হিসাব

জোতের আয়তন	*বাসস্থান*	*বাগান*	*মরশুমি ফসল*	*জলাশয়*	*অন্যান্য অকৃষি*	*অন্যান্য*	*সর্বমোট*	*পরিবারের সংখ্যা(০০)*	*পরিবারের %*	*জমির মালিকানা (%)*
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১২		
শূন্য	০	০	০	০	০	০	০	৯৭৪৩৩	৬.৫৯	০.০০০
০.০০২-র কম	৯৮.৮৪	০	০.১৫	০	০.৬৩	০.৩৯	১০০	৫০৯২৯	৩.৪৪	০.০০৮
০.০০২-০.০০৫	৯৯.৪৫	০.০২	০.১২	০	০.১৭	০.২৪	১০০	১৪২৬১০	৯.৬৫	০.০৪৯
০.০০৫-০.০৪	৯৩.৩৩	০.১২	৪.০৫	০.১০	০.৭৬	১.৬৫	১০০	৩০৪৭০১	২০.৬১	০.৪২৬
শূন্য থেকে ০.০৪								**৫৯৫,৬৭৩**	**৪০.২৯**	**০.৪৮৩**
০.০৪-০.৫	১১.৫৯	২.৬৭	৭৬.৬৮	০.৫৫	০.৩৪	৮.১৭	১০০	৩৮৩৯৫৫	২৫.৯৭	৮.৯৯
০.৫-১.০	৪.১৪	২.৫১	৮৩.২	০.৬২	০.৪২	৯.১১	১০০	১৯৮১৩৭	১৩.৪০	১৩.৫৬
১.০-২.০	২.৫০	২.৩৩	৮৪.৬৮	০.৪৫	০.৪৬	৯.৫৯	১০০	১৫৯৯১৬	১০.৮২	২০.৩৭
০.০৪ থেকে ২.০								**৭৪২,০০৮**	**৫০.১৯**	**৪২.৯২**
২.০-৩.০	১.৬৭	২.১৩	৮৪.৬৩	০.৩	০.৪৮	১০.৭৯	১০০	৬৩১৮৯	৪.২৭	১৩.৮১
৩.০-৪.০	১.১৭	৩.০২	৮০.০৩	০.৩৬	০.৩২	১৪.৮	১০০	২৫৮৪১	১.৭৫	৮.১৬
৪.০-৫.০	০.৮২	২.১৭	৮৪.৯১	০.২৫	০.৩৭	১১.৪৯	১০০	২০০০৯	১.৩৫	৮.২০
৫.০-৭.৫	০.৯৩	২.৯১	৮২.২২	০.৩৮	০.৪৯	১৩.০৯	১০০	১৭৫০৬	১.১৮	৯.৮৬
২.০ থেকে ৭.৫								**১২৬,৫৪৫**	**৮.৫৬**	**৪০.০৩**
৭.৫-১০.০	০.৫৩	৪.৫৬	৭৩.৩৯	০.০৫	০.৫৩	২০.৯৪	১০০	৬৩২৪	০.৪৩	৫.০১
১০.০-২০.০	০.৬০	১.৯১	৭৯.২৭	০.২৪	০.১১	১৭.৮৭	১০০	৬৭৮১	০.৪৬	৮.৫৩
২০.০ ও বেশি	০.৩৮	৩.২৯	৭০.১৫	০.০২	০.০৩	২৬.১২	১০০	১০৪৪	০.০৭	৩.০২
৭.৫ ও বেশি								**১৪১৪৯**	**০.৯৬**	**১৬.৫৬**
সর্ব মোট	**৩.১৪**	**২.৫৮**	**৮১.২৭**	**০.৩৮**	**০.৩৯**	**১২.২৪**	**১০০**	**১৪৭৮৩৭৬**	**১০০**	
মোট পরিবার সংখ্যা (০০)									**১৩৭৭২১৫**	

৫। মালিকাধীন জমির বণ্টন, ২০০৩

২০০৩ সালে জমি মালিকানার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল। সরকারি সংজ্ঞা অনুসারে সমস্ত পরিবারের মধ্যে মাত্র এক-দশমাংশ ছিল 'ভূমিহীন' (সরকারি হিসেবে নিচের দিকের দুটি মাত্র গোষ্ঠী এরা— যাদের কোনো জমিই নেই, আর যাদের ০.০০২ হেক্টরের কম জমি আছে)। তবে বাস্তবের ছবিটা অন্যরকম। এর ওপরের দুটি গ্রুপে আরও ৩০ শতাংশ পরিবার আছে যারাও কৃষির দিক থেকে ভূমিহীন— কারণ তাদের যেটুকু জমি আছে তার যথাক্রমে ৯৯ শতাংশের বেশি ও ৯৩ শতাংশের বেশি চলে গেছে বাসস্থান বানাতে (সারণি ক-১)। এই চারটি গ্রুপই ভূমিহীন বা প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন। এরা সবাই মিলে সব পরিবারের ৪০.৩ শতাংশ। মালিকানাধীন মোট জমির ০.৫ শতাংশেরও কম এদের হাতে। অন্যদিকে মাত্র ৯.৫ শতাংশ পরিবারের হাতে আছে মোট জমির ৫৬.৬ শতাংশ। জমি ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পরিশিষ্টে, আর সারণি ৫-এ দেওয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার।

যাদের জমি নেই বা সামান্য জমি আছে, তারাও জমি চষতে পারে— লিজ নিয়ে। মালিকানাধীন মোট জমি থেকে লিজে দেওয়া জমি বাদ দিয়ে লিজে নেওয়া জমি যোগ করলে হয় কর্ষিত জোত। এটি হলো জমি কর্ষণের আসল একক। কর্ষিত জোতের বিন্যাস দেখায় যে ১৯৯২ থেকে ২০০২-০৩ এর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিল হোল্ডিং বা শূন্য জোত-এর অর্থ হলো যে এই জোতে কোনো উৎপাদন হয় না। এটা ঘটতে পারে জোতে আদৌ চাষ না করলে, সেক্ষেত্রে কর্ষণের এলাকা হবে শূন্য। কিংবা যদি কিছুটা জমি কৃষক চাষ না করে ফেলে রাখে— এটা ঘটতে পারে যদি উৎপাদনের ফসলের দাম এত কম থাকে যে চাষ করলে চাষের খরচ উঠবে না, বা উৎপাদন ব্যয় এত বেশি যে কৃষকের পক্ষে সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ তার ঋণযোগ্যতা নেই।

সব রাজ্যেই এই 'শূন্য' জোতের অংশ বেশ অনেকটা বেড়ে গেছে। সারা ভারত ধরলে তা এখন সব জোতের ২০ শতাংশের একটু কম থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত। যেসব পরিবারের কোনো জমি নেই বা জমির পরিমাণ ০.০০২ হেক্টরের কম (যাদের সরকারি ভাবে ভূমিহীন বলা হয়) তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে— ২.৩ কোটি থেকে ৪.৬ কোটি (সারণি ৬)।

রাজ্যওয়ারি তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সব রাজ্যে, বিশেষত কৃষকদের দুর্দশা যেখানে খুব বেশি সেসব রাজ্যে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও বলা চলে পাঞ্জাবেও, এই সংখ্যা গড় হারের চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে শূন্য চাষের জোতের (অকর্ষিত জোত) সংখ্যা গ্রামের সব পরিবারের ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৭ শতাংশ হয়েছে। কেরালায় ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৩৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ। তুলনামূলক বৃদ্ধিটা কেরালায় খুব বেশি— সে রাজ্যে শূন্য চাষের জোতের সংখ্যা এক দশকে ৬ গুণ বেড়েছে— মাত্র ৩.৮ শতাংশ থেকে ৩৮.৬ শতাংশ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এটি হয়েছে দ্বিগুণ— ১৪ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ। পরবর্তী সমীক্ষাগুলি থেকে দেখতে হবে, এই দারুন হারে বৃদ্ধির কতটা হয়েছে জোতগুলি চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়ার জন্য, আর কতোটা কৃষি লাভজনক না থাকার জন্য ও খরার কারণে।

গত পনের বছরে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালিত আর্থিক নীতি এবং ঠিকমতো অর্থ দিয়ে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প চালানোর মাধ্যমে তাকে আগের অবস্থায় ফেরাতে হবে। ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এই আইনটি পাশ হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটিতে টাকাপয়সার যোগান ঠিকঠাক আছে বলা যাবে না। বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন যে সমস্ত গুণক প্রভাব (মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট) ধরলেও কর্মসংস্থান ও আয়কে সত্যিকারের চাঙ্গা করতে হলে বছরে অন্তত ২৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ধনীরা যেহেতু আরও ধনী হচ্ছে সেহেতু কর আদায়ও বেশ ভালো হচ্ছে— এটা তাই সহজেই করা যেত।

সারণি ৫

জমির মালিকানার বণ্টন ২০০৩ (টেবিল এ-১-এর সারসংক্ষেপ)

মালিকানাধীন জমি (হেক্টরে)	*পরিবারের সংখ্যা (%)*	*কত শতাংশ জমির মালিক*
সরকারিভাবে 'ভূমিহীন'	১০.০	০.০১
০.০০২ থেকে ০.০৪	৩০.৩	০.৪৭
মোট : প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন	৪০.৩	০.৪৮
০.০৪ থেকে ২.০	৫০.২	৪২.৯০
২.০ থেকে ৭.৫	৮.৫	৪০.০০
৭.৫ ও তার বেশি	০.৯	১৬.৬০
সর্বমোট	**১০০**	**১০০**

** সংখ্যাগুলিকে কাছাকাছি সংখ্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ করলে ঠিক ১০০ হবে না*

সারণি ৬: জোতের হিসাবে গ্রামীণ পরিবারগুলির বিন্যাস: সারা ভারত

জোতের আয়তন	*১৯৯২, ৪৮তম রাউন্ড*		*২০০২-০৩, ৫৯তম রাউন্ড*	
হেক্টর	*পরিবারের সংখ্যা*	*কর্ষিত জমি*	*পরিবারের সংখ্যা*	*কর্ষিত জমি*
শূন্য	১৯.৮	০.০	৩১.২	০.০০
< ০.০০২	২.১	০.০	০.৮	০.০০
মোট (কর্ষিত জমি শূন্য)	**২১.৯**	*০.০*	**৩২.০**	*০.০০*
০.০০২-০.২	২০.৩	১.২		
০.২-০.৪	৭.৯	২.১	৯.৮	০.২
মোট	**২৮.২**	**৩.৩**	**৯.৮**	**০.২**
০.৪-১.০	২০.০	১২.২	৩৭.৩	২২.০
১.০-৫.০	২৬.০	৫১.৪	১৮.৮	৫০.৯
৫.০-র বেশি	৩.৯	৩৩.০	২.১	২৬.৯
মোট	**৪৯.৯**	**৯৬.৬**	**৫৮.২**	**৯৯.৯**
সর্বমোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**
মোট পরিবারের সংখ্যা (লক্ষে)		১১৬৪.১৭৩		১৪৭৮.৩৭৬
কত পরিবারের হাতে কোন জমি নেই (লক্ষে)		২৩০.৫০৬		৪৬১.২৫৩

উৎস: এনএসএস, ৪৮তম রাউন্ড, এনএসএস রিপোর্ট ৪০৮, ল্যান্ড অ্যান্ড লাইভস্টক সার্ভে ১৯৯২, এবং ৫৯তম রাউন্ড, রিপোর্ট ৪৯৩, লাইভস্টক ওনারশিপ অ্যাক্রস অপারেশনাল ল্যান্ডহোল্ডিং ক্লাসেস ইন ইন্ডিয়া, ২০০২-০৩। পরেরটার ক্ষেত্রে ০.২ থেকে ০.৪ গ্রুপটির সংখ্যাগুলি ০.০০২ থেকে ০.৪-এর মোট সংখ্যা। এনএসএস ৫৯তম রাউনজ রিপোর্ট ৪৯২, সাম আসপেক্টস অফ অপারেশনাল ল্যান্ড হোল্ডিং ইন ইন্ডিয়া, ২০০২-০৩- এটি ব্যবহার করা হয়েছে জোতের বিন্যাস পাওয়ার জন্য।

কিন্তু সরকারের টাকাপয়সার বিষয়টা যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা কৃষিতে মন্দা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের সংকট বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐকান্তিকতার অভাব ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন। আগেকার সমস্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচি, যেমন এসজিআরওয়াই, জেআরওয়াই, বিভিন্ন কাজের-জন্য-খাদ্য কর্মসূচি, যেগুলির জন্য ২০০৫-০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয়েছিল ১১৭০০ কোটি টাকা, সেগুলিকে সব ২০০৬ সালে ২০০৬-০৭ সালের বাজের প্রস্তাবে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে তাতে মোট ১২৯০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হলো— যা আগের বছরের সংস্থানের চেয়ে মাত্র এক-দশমাংশ বেশি। তারপর ২০০৭-০৮ সালে অর্থমন্ত্রী এনআরইজিএ-র সংস্থান আরো কমিয়ে তাকে ১২০০০ কোটি টাকা করলেন, যদিও কাগজে-কলমে এই কর্মসূচিকে আরো অনেক জেলায় প্রসারিত করা হলো।

এই সব করা হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি কমানো অযৌক্তিক নীতি অনুসারে— সরকারের আর্থিক ঘাটতি কমানোর জন্য সরকারের অর্থ সম্পর্কিত বিষয় যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের এজেন্ডা ও ব্রেটন উড্‌স প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশ অনুযায়ী। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ চলতে থাকলে এই আইনটি সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, মুদ্রাসংকোচনের চিন্তা ও দারিদ্র্য কমার সরকারি দাবিতে বিশ্বাস এখন প্রশাসনের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে উদ্যোগের অভাব দেখা দিয়েছে। বাস্তব অবস্থা হলো, আমরা আগেই যেমন দেখেছি, গ্রামে যেসব ব্যক্তিরা সরকারি মতে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দৈনিক ক্যালরি পান না, তাদের সংখ্যা দারুন বেড়েছে— ২০০৪-০৫ সালে তা আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গে ৮৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। দারিদ্র্যের গভীরতাও বেড়েছে, অপুষ্টির প্রতিটি স্তরেই সেটা দেখা যাচ্ছে।

যে সামান্য টাকার সংস্থান করা হয়েছে তারও পুরোটা খরচ করা হচ্ছে না। প্রত্যক্ষ (অ্যাক্টিভ) বিকাশমুখী প্রশাসন প্রায় শেষ, অন্যদিকে আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের পাগলের মতো কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। তাই ফলাফল যা হবে বলে মনে হচ্ছে সেটা উৎসাহিত হওয়ার মতো নয়, বরং উল্টো। কৃষির মন্দা ও আয় সংকট কাটানোর জন্য প্রত্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। গরিব কৃষকদের একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ততা চলছেই, কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা চলতেই থাকছে। খাদ্য সুরক্ষার অবস্থা আরও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বন্ধ, খাদ্যশেস্যের লভ্যতা কমছে। এটা হতেই পারে যে বর্তমান মন্দাস্ফীতির ফলে আমদানি বাড়বে, পাশাপাশি জনগণের চাহিদা কমানোর জন্য আরও মুদ্রাসংকোচনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আর তার ফলে চাহিদা কমা ও যোগান কমা দুটি একে অপরকে চক্রাকারে বাড়াতে থাকবে— কৃষি ক্ষেত্রে এই চক্রাকার ঘটনাক্রম বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে। এরকম অকর্মণ্য, মুদ্রাসংকোচনের নীতির প্রতি এরকম দাসসুলভ বশ্যতাপূর্ণ নীতিপ্রণেতারা, যারা গত ১৫ বছর ধরে দেশটাকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছেন— ভারতের জনগণ কেন এদের হাতে পড়লেন সেটা ভাবার বিষয়।

সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট, জুলাই-আগস্ট, ২০০৭

এক কৃষকের কথা

বিমান

এই কথামালার মূল কথাগুলো জমতে থাকে ১৯৯০-এর কাছাকাছি সময় থেকে। তবে এটা পূর্ণাঙ্গ আকারে লেখা হয় ১৯৯৯ সালে। বর্তমান রূপ ২০০০-এর পরে। তারপরে কালগত অসংগতি কমানোর জন্য যেটুকু হেরফের করতে হয়েছে, তাতেও সে অসংগতি কাটেনি। স্বচ্ছন্দ ধারাটা কেটে কেটে গিয়েছে। তবে এর কালপর্ব একটাই; তাই সময়ের হেরফের সত্ত্বেও মূল কথাগুলো একই আছে। এবং এরই মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের একটা নতুন কাঠামোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। —লেখক

'কৃষক' কথাটার সঙ্গে একটা ছবি যেন কল্পনায় আপনিই ভেসে ওঠে। কৃষক যেন গ্রামেরই প্রতীক। আদিম, অসভ্য, একগুঁয়ে— এই কথাগুলোর সঙ্গেও 'কৃষক' কথাটার একটা যোগ দেখা যায়। এগুলো কৃষকের এক-একটা পরিচয়ও। আবার কৃষক বা চাষি কথাটা সমস্ত গ্রাম্য শ্রমজীবী মানুষজনকেও বুঝিয়ে থাকে। বর্তমান শ্রেণীগুলোর মধ্যে বোধহয় কৃষকই সব থেকে প্রবীণ। 'শিক্ষা-সভ্যতা'র তখনও জন্ম হয়নি। তাই প্রকৃতির দান আর খেয়ালের সঙ্গে তার চিরদিনের পরিচয়, নিত্যদিনের কারবার। তাই তো কৃষক জীবনতত্ত্বের গায়ক। সমাজের আদিকালে সেই যে কৃষক জন্ম নিয়েছে, তারপরে কেটে গেল কত কাল। দেশে কালে কৃষক বা চাষি কথাটার মানেও হয়ত পাল্টিয়েছে অনেকই। পরিবর্তনের এই পথ ধরেই চলেছে কৃষক। কৃষকের আকার-প্রকার, অতীত-ভবিষ্যত নিয়ে নানা মহলে নানা মত। তবে, আমাদের আলোচ্য— কৃষকের বর্তমান।

আমাদের দেশে কৃষকের কথা বলতে ভূমিকার তেমন দরকার হয় না। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি ধর্ম— কৃষকের কথা আছে সবেতেই। তার একটা কারণ যদি হয় এই যে— কৃষকই ছিল 'অন্নদাতা', তবে আরেকটা কারণ হয়তো এই যে— কৃষিজীবীরাই সমাজের সব থেকে বড়ো অংশ। আর 'কৃষক' বোধহয় তার শক্তিরও পরিচয় দিয়ে এসেছে আদি থেকেই। (তবে আমাদের দেশে সেকাল থেকেই সমাজের একাংশ চাষিকে 'মূর্খ' আখ্যা দিয়ে এসেছে। আর আজও বোধহয় সমাজে চাষিদের এটাই প্রধান পরিচয়।)

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। সংখ্যাতে কৃষিজীবীরাই সমাজের মূল। তাই এটা হয়তো তাদের সমস্যারও মূল যে, কৃষকরা দেশের মূল সমস্যা এড়াতে পারে না; তাদের সমস্যা তারা আর কারো ঘাড়ে চাপাতে পারে না। বিপরীতে অনেকেই তাদের অনেক সমস্যা কৃষকদের কাঁধে চাপিয়ে দম ছাড়ে। এইভাবে আমাদের দেশে কৃষকের সমস্যা দেশের সমস্যায়, আর দেশের সমস্যা কৃষকের সমস্যায় এসে মেশে। তাতে কৃষকদের মূল সমস্যার মধ্যে 'জাতীয়' সমস্যার একটা ছায়ামূর্তি হয়তো দেখা যেতে পারে, যদিও আমাদের দেশে 'জাতীয়' কথাটায় যথেষ্ট স্ব-বিরোধিতা দেখা যায়। আর দেশের একটা অঞ্চলের কৃষকদের কথা, সারা দেশে কৃষকদের কথায় কিছু-না-কিছু যোগ করে। তাই কৃষকদের চেপে-রাখা জীবন-বৃত্তির একটুকরো ছবি, মনে হয়, সমকালের দাবি। কৃষকদের একই মূল সমস্যা যেন সব ভাষা-গোষ্ঠী-ধর্মের কৃষকদের মধ্যে সব অঞ্চলে ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বর্তমান। এখানে যেন ভাষা-গোষ্ঠী-দল-ধর্মের সব বিভেদ কৃষকের এক দেহে এসে মিলিত হয়। বিবিধের মহামিলন। বারেকের জন্য গোটা দেশটা ফুটে ওঠে। দেখা যায় সম্মিলিত স্বতন্ত্র এক কৃষক শ্রেণী। তখন সেখানে এসব বিভেদ সমগ্র এক অভেদের অধীনে আসে।

এখানে এই আলোচনার মূল কথাগুলো আসলে, কৃষকদের কৃষি-বিষয়ে কিছু 'সংবাদ'। যেসব বিষয়ে হয়তো বলা হয়নি তেমন কিছু, অথবা যেসব সমস্যার কথা শোনাই যায় না তেমন, সেসব বিষয়ই এই আলোচনার মূল বিষয়। এর প্রথমে থাকছে কৃষকদের কৃষিকাজের একটা বিবরণ।

কৃষিকাজের বিবরণ

একটা বিশেষ জায়গার কৃষিকথায় যাবার আগে সাধারণভাবে একটা কথা বলা দরকার। বরাবরই বাংলার অনেক 'বড়ো মানুষ'ই— জমিদারি আমল প্রসঙ্গে— জমিদারির বিপক্ষে অথবা প্রজা বা চাষির পক্ষে কথা বলেছেন, এমনকি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত। আর বলেছেন বাধা ঠেলে সচেতনভাবেই। বাংলায় এ বিষয়ে একটা সাধারণ মত আছে। আর সামাজিক আন্দোলনে, কী কম্যুনিস্ট আন্দোলনে, বাংলা তো একটা এগিয়ে থাকা রাজ্য। 'ভূমি-সংস্কার' বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতের একটা মিল পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'শ্রমিক-কৃষকের দল'গুলোই এখানে একটানা শাসন চালিয়ে এসেছে। কাজেই এদেশের কৃষকের কথায় প্রথমেই চোখ পড়ে এ রাজ্যের কৃষি আর কৃষকের দিকে।

আর আমরা সেই 'বরদ বঙ্গে'-রই একটা গ্রাম থেকে বলছি।

পঞ্চাশের দশকের দিনগুলোর সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়— চাষিদের আর চাষবাসের বহু বদল ঘটেছে। তখনও চাষবাস ছিল সাবেক প্রথার। বেশিরভাগই 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ', মাটির মালিক তাঁরাই। পুরোপুরি জোতদারদের কাল। ভাগচাষের ব্যাপক চলন। এখন সেই 'জোতদার' আর নজরে

পড়ে না। নিজে-চাষ বাড়ে। পতিত জমি ক্বচিৎ চোখে পড়ে। বেশিরভাগ জমিতেই ফসল বেড়েছে— এক ফসলের জায়গায় দু'ফসল, দুয়ের জায়গায় তিন। আবার কয়েকটা ফসলে বেশি ফলনের বীজও চালু হয়। আগে এখানে সেচ আর রাসায়নিক সার ছিল না; এখন চলতি। কিছু নতুন সরঞ্জামও ব্যবহার হয়। ট্রাক্টরে চাষ আর হৈ-চৈ ব্যাপার না, স্বাভাবিক দৃশ্য। অনাহারে থাকা, আগের থেকে কম। নুন দিয়ে ভুট্টা বা আধভাঙা গমের 'জাউ' আর এখন তেমন শোনা যায় না। আরও কিছু থাকলেও, এই হলো উন্নতির মোটামুটি একটা হিসাব।

এ বিষয়ে একটা কথার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। কৃষকের উন্নতির কথা চারিদিকে সহজেই পড়তে-শুনতে পাওয়া যায়। সেগুলো সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষেরই কথা। নানাভাবে নানাদিক থেকেই সেগুলো আসে। এসব কথা, বলতে গেলে, একতরফাই বলতে হয়। কৃষকদের সম্পর্কে যদি কোনো বাস্তব ধারণা পেতে হয় তবে কৃষকদেরও বলবার একটা জায়গা থাকতে হবে। কিন্তু কৃষকদের জন্য সেই জায়গাটা কি আছে? সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা উদ্দেশ্য করেই— কৃষকের অবস্থান থেকে, এক ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে— দুটো কথা বলতে চাওয়া। তবে এ বিষয়ে কোনও ধারণা গড়ে তোলার জন্যে 'শত কণ্ঠ' প্রয়োজন। এটা তারই একটা বলে বিবেচনার দাবি করে।

কয়েক দশক যাঁরা এ রাজ্য শাসন করেছেন, এক সময়ে তাঁরা 'আমূল ভূমিসংস্কার'-এর ডাক দিয়েছিলেন। তার ধ্বনি ছিল 'লাঙল যার জমি তার'। যুক্তি ছিল— এতে চাষির উৎসাহ বাড়বে, আয় বাড়বে; দেশে কল-কারখানার জন্য বাজার গড়ে উঠবে, কৃষিতে আসবে আধুনিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ কৃষি আর যন্ত্রশিল্প একে অন্যের সহায়। এবার আমরা ঘটনার দিকে দেখব।

সালটা ১৯৬০-ই হবে। তার আগে 'আধুনিক' ব্যবস্থার সঙ্গে চাষিদের তেমন পরিচয় ছিল না। সে বছর গ্রামে একজন 'গ্রামসেবক' আসলো এ অঞ্চলের জন্য। এ 'ব্লকে' এরকম আটটা অঞ্চল ছিল; এখন তেরোটা। গ্রাম-সেবকের কাজ ছিল— সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাষিদের মধ্যে 'আধুনিক ব্যবস্থা' প্রচার করা। গ্রাম-সেবক গাঁয়ের মধ্যেই এক জায়গায় থাকতো। সরঞ্জাম, জিনিসপত্র সেখানেই থাকতো। সেগুলো ছিল— গুঁড়ো আর তরল 'বিষ' (কীটনাশক), আর সবুজ সারের মধ্যে ধঞ্চেবীজ। এসব চাষিরা বিনা পয়সায় নিয়ে যেত। থাকতো বিষ-ছিটানো দু'রকম যন্ত্র, গরু-টানা লোহার লাঙল, আর বোনার জন্যে 'সীড্‌রিল'। এগুলো চাষিরা বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারতো। অবশ্য সীড্‌রিল অর লোহার লাঙল চাষিরা ব্যবহার করেনি। আর থাকতো চাষিদের জন্য পাটের 'ডিসি' নিবিড়-চাষ প্রকল্প। তাতে এককেজি বীজ, তার জন্যে বিষ আর রাসায়নিক সার, একটা গ্রামে এক বা দু'জন চাষিকে বিনা পয়সায় দেওয়া হতো। তখনো এখানে রাসায়নিক সার বাজারে আসেনি। '৬৬/৬৭ সালের দিকে 'গভীর নলকূপ' চালু হয়। এটাই প্রথম সেচের ব্যবস্থা। এই সেচকেন্দ্রেই দুটো বাসা থাকতো। একটাতে 'অপারেটর', আরেকটায় 'অ্যাসিস্ট্যান্ট'। থাকা-খাওয়া, সেচ দেওয়া সেখানেই। এখানে এই 'গ্রামসেবক' আর সেচকর্মীরা গ্রামের সমাজ-জীবনেরও অংশী হয়ে পড়েছিল। তারপর শুরু হয় নতুন জাতের ধানের 'ডিসি'। তাতে সরকার থেকে গ্রামপিছু কয়েকজন চাষিকে দেওয়া হয় দু'কিলো ধানের বীজ, রাসায়নিক সার আর বিষ। শুরু হয় গমের 'ডিসি'-ও। চালু হয় নতুন জাতের ধান-গম চাষ, আর বাজারে রাসায়নিক সারের কিনাবেচা। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকেও চাষিরা সেচ-সারকে দেখে অবিশ্বাসের চোখে। সে দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় লাগলো এসব মেনে নিতে। এসময় থেকে শুরু হলো সরকারি ঋণে আর নগদে ব্যক্তিগত সেচ। দশকের শেষাশেষি চলতি হলো নতুন জাতের ধান-গম আবাদ। বলা যায়, এই প্রায় বিশ বছরই উন্নতির কাল। আগে যেখানে বিঘা-প্রতি পাঁচ মন আউস বা আট মন আমনই ছিল ধানের পক্ষে ভালো ফলন, গম হলে তিন মনেই যথেষ্ট, সেখানে নতুন জাতের ধান হয়তো হলো সতেরো মন, গম হয়তো তেরো মন। এই ফলনের জন্যে অবশ্য ব্যয়ও বেড়ে গেল যথেষ্ট। যাইহোক, তাতে চাষিদের মধ্যে একটা উদ্যোগ দেখা গেল। তারপর আশির দশক থেকে ধান-গম আবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর এই ফলনকে ধরে রাখতে গিয়ে এঁটে ওঠা চাষির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো। দেখা দিল পরের ধাপ। আর এখানে এই উদ্যোগে একটা ধাক্কা আসে পাটের বাজারের দিক থেকে।

এর ফাঁকে এই 'আধুনিক' ব্যবস্থার আগে যা ছিল তার উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। শোনা যায়, পুরাকালে কৃষিকাজের মূল সূত্র নাকি ছিল 'ত্রিবৃৎ'— কৃষি, বৃষ্টি, বীজ। এ পর্যন্ত মোটামুটি সেই কাঠামোই বজায় ছিল। কৃষিকাজ চলতো প্রকৃতির উপর ভর করে। বৃষ্টিই ছিল সেচ। বীজ প্রকৃতি থেকেই পাওয়া। আর 'কৃষি' অর্থাৎ ভূমি-চর্যা— কিষানের কিষাস্তি। বীজ, সার চাষিরই তৈরি। আসবাব ছিল— লাঙল, মই, নাঙলে, গাড়ি, দাওলি*, কোদাল, কাস্তে, হেঁসো। সবই স্থানীয় কারিগরের তৈরি। আর বলদ। তারপর আসলো 'আধুনিক' ব্যবস্থা, মানে আগের সব আসবাবের সঙ্গে আরও কিছু আসবাব। যেমন— বীজ, সার, সেচ, 'বিষ'। এগুলোর প্রথম তিনটিই বেশি ফলনের কারণ। তার সঙ্গে ধান-ঝাড়া আখ-ভাঙানো ও চৈতালি-মাড়া কল আর ট্রাক্টর। এগুলো খাটুনি আর সময় কমায়। সব মিলিয়ে এই হলো বর্তমান আসবাব—

* নিড়ানি

'আধুনিক' কৃষিকার্য। তারপর এসবের প্রয়োগ।

তার আগে এই 'উন্নত' জাতের বিশেষ দিকগুলোর পরিচয় একটু দরকার। এপর্যন্ত চাষিরা যা দেখেছে তাতে— এ জাত ফলনে বেশি কিন্তু ধাতে নরম, এবং স্বাভাবিকের তুলনায় স্বাদেও কিছুটা কম। আর শোনা যায়— 'বিশেষজ্ঞ'দের মতে, নাকি গুণেও নিচু। দেশি জাতের মতো স্বাভাবিক জল-হাওয়ায় এরা আপনা থেকে টিকে থাকতে পারে না; এদেরকে টিকিয়ে রাখতে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। তার জন্য চাই— বিষ, ওষুধ, সেচ, সার আর তার নানা যন্ত্র। এসবের কোনো কিছুই চাষিদের হাতে নাই। এসবের কিছুই তারা বোঝে না। এসব বোঝে 'অপিসের বাবু' আর দোকানদারেরা; যোগানদারও তারাই। আর 'বাবুদের আপিস' থেকে চাষিদের ক্ষেত— সে তো অপার পথ! অন্যদিকে— দেশি ফসলের আবাদের বিষয়ে চাষিদের মধ্যেই সব। তাদের মধ্যেই 'বিশেষজ্ঞ' বা 'পাকা কিষাণ'। যোগানের ঘাটতিও তারাই মেটায়। চাষিদের চোখে— এই 'উন্নত' আবাদে ফলনটাই একমাত্র বিবেচনা। তাতে এমনকি 'লাভ'টাও সবসময়ে বিবেচনার মধ্যে পড়ে না।

এই 'উচ্চফলনশীল' চাষের জন্যে গোড়াতেই চাই তার বীজ। পুরাকাল থেকেই 'বীজ' কৃষিকাজের মূল। এখানে এই নতুন জাতের বীজ, ধান-গম ছাড়া অন্যান্য চলতি ফসলে দেশি জাতকে ফলনে অল্পই ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে। সেচ-সারের জন্যে যা হেরফের হয়েছে তাই। অবশ্য— দু'হাজার সাল থেকে আন্দাজ— সেই সঙ্গে আর কয়েকটি ফসলের নামও বলতে হয়, যেমন— তিল, সাদা সর্ষে, আর শাকসব্জি। তবে এখানে এগুলো মূল আবাদের মধ্যে পড়ে না। কাজেই 'উন্নত' জাতের ফসল, প্রধানভাবে ধরা যায় ধান-গমই। আর অন্য ফসলে বেশিরভাগই দেশি জাত চালু আছে। তার মধ্যে পাটের বীজ এখন চাষিরা কিনেই বুনে প্রায়।

নতুন বীজ সব প্রথম রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ আপিস মারফত কৃষকদের মধ্য ছড়িয়ে দেয়— 'ডিসি' প্রকল্পের মাধ্যমে। তাতে বীজ হিসাবে এগুলো ছড়িয়ে পড়তে কয়েক বছর লেগে যায়। পরে বীজ বাজার আসতে শুরু হয়। তাতে বীজ যোগাড়ের সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে আসে জেলা-সদর, মোটামুটি দ্বিগুণ দামে। ইদানিং (ধরুন, ২০০৪ সাল) বীজের দোকান অলিতে-গলিতে। তাতেও সমস্যা কমে না। চাষিরা চায় অপিস থেকে প্রথমে তারা যে বীজ পেয়েছিল। আর, শুরু থেকেই এ বীজ সে বীজ নয়। কঠিন হয়ে পড়ে প্রথমদিকের বীজের যোগাড়। 'বড়ো' দোকান, 'পুরনো' দোকান, বিশেষ ক'রে 'সদরের' দোকান— ভরসা সেখানেই একটু বেশি। তবুও মুশকিল যে— রাষ্ট্রের কর্তা, দোকানদার, কেউ-ই ঐ বীজের ভালো-মন্দের দায়িত্ব নিতে রাজি না। 'জেলা সদর', বীজের সব থেকে 'পুরনো' আর 'বড়ো' দোকান।— সেখানে খোঁজ করে যে পর্যন্ত জানা যায়, সেটা অনেকটা এরকম— এসব 'সার্টিফায়েড্ সীড', এর কোনো গ্যারান্টি নেই; 'ফাউন্ডেশন সীড' হলে বলা যেত; কিন্তু তা বাজারে চাষিদের জন্যে পাওয়া যায় না। আরও গোড়ার কথা— দোকানদার বীজের যা জাত-পরিচয় বলে, কোনো সময়ে তা-ও ঠিক হয় না, আবার এও দেখা গিয়েছে যে— কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজে 'চারা'-ই বের হয় না। বেশির ভাগই দেখা যায়— বীজ কিনেও তা আর 'ভালো' হয় না। তার মধ্যেই কোনো জমিতে হয়তো ফসল ভালোই হয়ে গেল। সব মিলিয়ে, বীজ কিনতে চাষিরা উৎসাহ পায় না। কিন্তু এ ছাড়া আর বীজ কই? তাই কিনতেই হয় শেষ পর্যন্ত। যে বীজ তারা চায়, সেটা নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এধারে 'কৃষি-বিভাগের' উপদেশ—প্রতিবারই বীজ পাল্টাতে হবে। এখন, যে বীজ পাবার কোনো ব্যবস্থা নাই, তা তারা পায় কীভাবে? বীজ চাই প্রতিটা জমিতে, প্রতিটা ফসলে। অথচ, তা যদি চাষির নাগালেই না মিলে, তবে এই 'আধুনিক' আবাদ চলে কিসে? এ দায় রাষ্ট্র ছেড়ে দেয় বাজারের উপরে, আর দোকানদার তার সব দায় চাপাতে চায় কোম্পানির ঘাড়ে।* অগত্যা চাষিরাই এ দায় মাথায় নিয়ে এগিয়ে আসে নিজেদের বীজ নিজেরাই তৈরি করতে—যতদূর পারে। তাতে 'উচ্চ-ফলন' বীজ তার উচ্চতা খুইয়ে পণ্ডিতের 'গবেষণা'-ঘর ছেড়ে নেমে আসে চিরাচরিত 'অজ্ঞ' চাষির কুটিরে, আর দোকানির গরাদের আড়ালে, যেখানে কূল-মান তার কিছুই থাকে না। এই, বীজের টানা-পাড়াতে 'আধুনিক' আবাদের আদি-তে টান পড়ে।

বীজের পরই সার। 'সার' বলতে এখানে রাসায়নিক সার, 'বাজার' থেকে কেনা সার। 'বীজ-ঘর' থেকে বীজ কিনেও আর তেমন 'কাজ' হয় না। কাজেই ফলন বাড়াতে চাষি 'সার' ছাড়া অন্য কিছু ভেবে পায় না। বরং বীজ-সেচের ঘাটতি সে 'সারে' পূরণ করতে চায়। কখনও 'সারে'-ই সারের ঘাটতি থাকে। তার জন্যেও 'সার'। আবার রাসায়নিক সার ব্যবহারে 'অম্ল' 'ক্ষার' ব্যাধি হয়। তার বিরুদ্ধেও সেই 'সার'-ই হাতিয়ার। আর সেটা সব-সময়ই পরিমাণ বাড়িয়ে। 'বেশি সার না দিলে আর ফসল ভালো হয় না!' তাই হাতে-হাতে ফল দেয় বলে রাসায়নিক

* যদি ২০০৮-এর কথা ধরা যায়— ঐ একই দোকানে গমের বীজ— একটার দাম ১৬ টাকা কিলো, একটা ৩৬ টাকা। চাষি— 'দুটোর দামের এত তফাৎ কেন?' দোকানি— 'দুটো দু কোম্পানির বীজ।' চাষি— 'দুটোর মানের কি কোনো তফাৎ আছে?' দোকানি— 'ওটা রিসার্চ ভ্যারাইটি।' চাষি— 'তাতে দামীটার মান অন্তত কিছুটা ভালো, তা কি ধরা যায়?' দোকানি— 'যার জীবন আছে, তার কি গ্যারান্টি দেওয়া যায়?'
একই দোকানে, অন্যবার, হয়ত পাটবীজ প্যাকেটে দামের ঘর ফাঁকা, মোড়কের সীল-গালা নাই; সেকথা শুধালে, টেবিলে চোখ রেখেই দোকানির জবাব, 'কোম্পানিতে ফোন করুন'।

সারের ব্যবহার, অনেক আগেই কৃষিবিভাগের সুপারিশ ছাড়িয়ে যায়। 'আগে দশ কেজিতে যে কাজ হতো, এখন বিশ কেজিতেও হওয়া ভার।' তারপর 'সারের' দামও বেড়ে চলেছে চড়া হারে। তাতে 'সারের' ব্যয় দুদিক থেকেই বেড়ে যায়। তবুও চাষিরা কোনো বাধাই মানতে নারাজ। তখনই চাষি ভাবতে বসে, যখন মাঝে মাঝে এমন হয় যে— সার দিয়েও তাতে কাজ হয় না।

সারের ব্যাপারে, এখানে কৃষি-বিভাগের একটা উপদেশ স্মরণ করা যেতে পারে। নিয়ম মতো রাসায়নিক সার দিতে হবে, যথেষ্ট জৈব-সার দিতে হবে, প্রতি আবাদে জমির 'মাটি পরীক্ষা' করাতে হবে, তারপর প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু গোবর সার তো আরও অমিল। গরু কোথায়? তার খরচাও তাছাড়া পিছিয়ে নেই। বহু চেষ্টাতেও চাষি দুই সারকে এক সঙ্গে প্রায়ই মেলাতে পারে না। আর মাটি-পরীক্ষার ব্যাপারে— এক সময়ে একটা খবরে শোনা গেল, চার-পাঁচ জন কর্মী নিয়ে এ জেলার পরীক্ষাগার একটা।* এটা যদি প্রতি গ্রামে থাকতো, তাহলে কিছুটা আশা করা যেতো। এতাবৎ মাটির 'নমুনা' পাঠানো হয়েছে কয়েক দফাই। প্রথমে, ব্লকের কর্তারা এসে বাচ্‌কোচ্ (বাছাই) কিছু গ্রামবাসীর বৈঠকে মাটির 'নমুনা-সংগ্রহ' করার নিয়ম শিখালেন। তারপর এসে মাটির 'নমুনা' জমা নিলেন। দুবারই মিষ্টির 'প্যাকেট' বিলি করলেন। কিন্তু 'মাটি-পরীক্ষা'র ফল একটারও এল না। এবং 'কৃষক-প্রশিক্ষণ' ব্যাপারটাও দফায় দফায় একই ফল দিয়ে থাকে। যে ধারা বাহির হয়, বালিতে শুকায়; সাগরে পড়ে না। এসব ভজকট-র মধ্যে চাষি উপদেশ কোনোটাই মেনে উঠতে পারে না।

নব্বই-এর দশক থেকে আর একটা ঝোঁক দেখা দেয়। ফসলে যখন 'সারের' সব থেকে বেশি দরকার কিংবা বছরে বোনাবুনির সেরা 'বাতাল', সেই সময়ে বীজ-সার দোকানে দোকানে অমিল হয়ে পড়ে। আবার যখন পাওয়া যায়, বিক্রি হয় 'খুশির' দামে। চাষি যখন '১৪০ টাকা' ছাপ-মারা ২ কেজি পাট বীজের প্যাকেট কিনে ৩১৫ টাকাতে (নতুন মোড়কে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত), ১৯৫ টাকার পটাশ-বস্তা কিনে ৩৬০ টাকা দিয়ে, অথবা ৫৫ টাকা পাল্লা (৫ টাকা কেজি) ডিএপি কেনে ৮৫ টাকাতে, তখন হয়তো বেশির ভাগ চাষিরই আবাদের জো-বাতাল পার হয়ে যায়। বেশি টাকায় কিনেও কাজ ঠিক পায় না। এটা এখন প্রতি মরশুমের নিয়মিত ঘটনা।** কখনও এরই ফাঁকে ফাঁকে হয়তো 'নকল' বীজ-সার বিকিয়ে যায় 'আসল'-এর দামে (অবশ্য কোনটা যে আসল, আর তার আসল দামই বা কী— তা এখানে চাষিরা জানে না)। এসব ব্যাপারে চাষিরা এই ভাবে যে— এসবের মধ্যে দিয়েই চলতে হবে; তাছাড়া আর পথ কই!

এই নতুন জাতের আবাদ রাসায়নিক সার আর সেচের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। অনেক ফসলেই কমবেশি সেচের দরকার। এখন আর কেবল মেঘ আর বিল-খালের জলে হয় না। আরও চাই রাজার জল, 'কলের' জল। সেচের এখানে দুটো ভাগ— সরকারি আর ব্যক্তিগত। সরকারি সেচের বেশিটাই বিদ্যুতে চলে। ১৯৯১ সালের এক সরকারি হিসাব মতে এই ব্লকে প্রায় আটান্ন হাজার একর কৃষিজমি। সরকারি সেচের অধীনে মোটামুটি সাত হাজার একর। আশির দশক থেকে এখন সেচকেন্দ্রগুলোতে কর্মচারী আর থাকে না। সেচকেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা এখন কাগজে-কলমে। সেখানে কোনোটাতে একজন কর্মচারী, কোনোটাতে নেই। সেচের জন্য চাষিরাই এখন মজুরি দিয়ে 'রাখালদার' রাখে। সেচকেন্দ্রগুলি 'অফিস' থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; ফলে নানা সমস্যার জন্ম নেয়। চালকের অভাব, মেরামতির অভাব, সবশেষে— অভিভাবকের অভাব। তাতে অনেক সেচকেন্দ্রই বন্ধ। আর বিদ্যুতের অভাব তো আছেই, বিশেষ করে গ্রামে। বিদ্যুৎ এই গেল। কখন আসবে?— দু'মিনিটের মধ্যে? দু'ঘণ্টা পরে? দশ ঘণ্টার মাথায়? উত্তরটা, যে চাষি 'সেচ' নিতে জমিতে দাঁড়িয়ে, সে জানে না। হয়রানি আর কামাই, যার দিনরাত নাই। তখন আলে দাঁড়িয়ে চাষি ভাবে কী!

আর ব্যক্তিগত সেচ। এখন ব্যক্তিগত সেচের বাইরে আর অল্প জমিই আছে। তার কিছুটা বিদ্যুতে, আর বাকি সবই ডিজেলে চলে। তাতে চাই— সেচ মেশিন, নল-জাল আর ডিজেল। তার প্রথম ধাক্কাটাই বহু চাষিকে ছিট্‌কিয়ে দেয়। আর মেশিন নল-জালের বাড়ন্ত দামের মুখে, উপযুক্ত মানের অভাবে— কলকব্জার ঘনঘন বদল, কেনাকাটা, মেরামতি— এসবে প্রচুর খরচা আর হয়রানি। তারপর এবিষয়ে শিক্ষা-পাওয়া কারিকরের অভাব; তাতে থাকে সারাই-এর সমস্যা। তাছাড়া আছে ডিজেলের যোগাড়। এসব বাধায় বুক বাঁধার পর তাকে আরও দুটো বাধা পার হতে হয়— দরকারমতো জমির পরিমাণ আর ঠিক মতো জমির অবস্থান। এখন বেশি জমি তেমন কারো নাই। একটা 'শ্যালো' নলকূপে যা আবাদ হয় ততটা জমি তাদের প্রায়ই থাকে না। যা আছে সেটাও এককে মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে; গুছিয়ে পায় না। তারপর মাঠ-ভরা ফসলের মধ্যে দিয়ে মেশিন নিয়ে বার বার আসা-যাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হয়ে পড়ে।*** এসব বাধা-বিঘ্নে 'উৎসাহ' দমে

* সারা রাজ্যে সাতটা

** ধরুন ২০০৮ থেকে, মরশুমের স্বাভাবিক অবস্থাতেও ১৭৭ টাকা ছাপমারা ফসফেট বস্তা বিকোয় ২৮৫ টাকায়, ৪৭৬ টাকা ছাপমারা বস্তা ৭৭০ টাকাতে; তার কমে নামে না।

*** কারণ 'চোর'-বৃত্তির দাপটে 'মেশিন' মাঠে রাখে না

আসে। খুব কম চাষিই শেষ পর্যন্ত সেচ-মেশিন কিনতে দাঁড়ায়। বাকিরা সুযোগ-সাধ্য মতো ভাড়া নেয়। আর মেশিন-ডিজেলের খরচা যতটা বাড়ে, ভাড়া বাড়ে তার অনেকটাই বেশি। 'সেচ' নিয়ে চাষি সঙ্কটে পড়ে। সেচের জল যদি বা জোটে, টনক্ নড়ে টাকা জোটাতে।

কৃত্রিম সেচ-সার-বীজের এই আবাদে রোগ-পোকার প্রকোপ যথেষ্ট। তাই ব্যাধি আর পোকা-মাকড় ঠেকাতে 'ওষুধ-বিষ'ও দরকার। রাষ্ট্র প্রথম চাষির হাতে 'বিষ' তুলে দেয়। তারপর 'বিষ-সার' নিয়ে যত কথা হয়, সে-সব চাষ-বাস পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাছাড়া যখন চোখের সামনে ফসল নষ্ট হয়, তখন 'ফসল ঠেকানো'ই চাষির কাছে আগে দরকার। কাজেই আজও চাষিরা 'বিষ' ছাড়া উপায়ান্তর দেখে না। আর, এখন কেন এত রোগ-পোকা তা চাষিরা জানে না। 'আগে তো এত ছিল না'! প্রথমে দশ গ্রাম 'বিষে যে কাজ হতো, এখন পঞ্চাশ গ্রামেও হয় না। 'বিষ দেওয়া' যন্ত্র— পিচ্‌কারি, প্লাস্টিক থলি আর ধাতুচোঙ-এর 'স্প্রেয়ার'। ধাতু-চোঙেই সুবিধা; কিন্তু তার দামটা এখানে প্রায়-চাষিরই নাগালে থাকে না। আর 'বিষে' বিষের হার কমলেও দাম বাড়ে চড়া হারে। তাতে বেশি খরচ, কম ফল। তাছাড়া ব্যাধি আর কীট-পোকার রকমের চাইতেও ওষুধ-বিষের রকমারি আরও বেশি। নতুন শতাব্দী, নতুন রকম, নতুন নাম : উস্তাদ্, হাম্‌লা, টার্‌জান্! 'নতুন শতাব্দী'-তে বীজের, সারের, আর বিষ-ওষুধের চমক-দেওয়া দামে, নাম এবং গুণের অবাধ বিজ্ঞাপনে, আর 'কোম্পানি'র ফেঁপে-উঠা সংখ্যায় চাষিরা এক্‌বারে হা বা তা বা! শুধায় কাকে? 'আকাশবাণী'-তে কি আর খেতে খামারে চাষির প্রয়োজন মিটে! তবুও রাষ্ট্রপক্ষ চাষিদের সঙ্গে আকাশ-পথেই যোগাযোগ রাখতে চান। আর 'বিজ্ঞাপন'ও তো 'আকাশবাণী'-তেই বলে! সেখানে পরামর্শদাতার আস্থাটা হয়তো 'বিজ্ঞাপনদাতা'-রাই শুষে নেয়। তখন ঠাহর দিতে থাকে কেবল দোকানদার; 'পরামর্শ'ও দেওয়া, 'মাল'ও বেচা—। কাজেই যা জোটে তাই নিতে হয়। একটায় কাজ না হলে আরেকটা। খরচ বেড়ে চলে; সময়ও চলে যায়!— বীজ সার 'ওষুধের' এসব নানা ধাক্কায় কখনও চাষি ফসলে মার খায়। তখন হয়তো 'আমার কি ঘরের মাল'!— দোকানীর 'সাফ্ জবাব' শুনে চাষি ঘরে ফিরে আসে। কেউ বা তখন অবোধের মতো নিজেকে নিজে প্রবোধ দেয়।

অবশ্য আগে 'অঞ্চলে' একজন 'গ্রামসেবকে'র জায়গায় এখন এ অঞ্চলের দুজন কৃষি-সহায়ক, কেপিএস। তাদের প্রয়োজনও বেশি। তবে কেপিএস-এর অস্তিত্বের কোন খবর ক'দশক থেকে আর সাধারণ চাষিদের জানা থাকে না। ষাট-সত্তরের দশকের সেই উদ্দীপনা, 'গ্রামসেবক' ও সেচকর্মীদের সঙ্গে কৃষকদের সেই সংযোগ— সে দিনের কথা কৃষকদের মনে হারিয়ে-যাওয়া দিনের একটা স্মৃতি মাত্র। তাদেরকে কখনও যদি গ্রামে দেখা যায়, সেটা অপিসেরই অন্য কাজ নিয়েঃ গণনা, সমীক্ষা, বিশেষ করে 'নির্বাচন'— দফায় দফায়, নানা পর্বযুক্ত— যাতে অফিস, কাছারি, চারিদিক, একটানা 'সার্বিক বন্ধ'-এর চেহারা নেয়।

দেখা যায়— বীজ, সার, সেচ, 'বিষ', কোনোটাতেই চাষি 'আকাশ-বাণী'-মতে চলতে পারে না। চাষিদেরকে সব ব্যাপারে এখন 'কোম্পানি' আর দোকানদারের মতে চলতে হয়। এধারে তার জমির জোর কমে, ফসলের ফলন কমে। রাজ-কর্তারা তাতে অবশ্য চাষিদের 'অজ্ঞতা'কেই দায়ী করেন। তবু চাষিরা নিজেদের কোনো দোষই পায় না 'ভাগ্য' ছাড়া। 'আধুনিক' আবাদের 'জীওন-কাঠির হদিশ' তারা কিছুতেই পায় না।

আর যেসব সরঞ্জাম পরে আসে, ধান-ঝাড়া কল সেগুলোর একটা। আগে ধান-ঝাড়ার কাজ চাষিরা হাতেই করতো। তার জন্যে চাষিকে ধানের একটা অংশ 'মিজে' দিতে হতো, নগদ গুণতে হতো না। এখন কলের বাবদ চাষিকে নগদ বা মিজের উপর কলের ভাড়াও দিতে হয়। আরেকটা হলো চৈতালি-মাড়া কল। আগে এটা বলদ আর হাওয়ার সাহায্যে করা হতো। তাতে হাওয়ার খেয়াল-খুশির চাইতেও বলদের অভাবটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। ফলে মাড়াই-কল ছাড়া উপায় থাকলো না। কিন্তু চৈতালি-মাড়ার জন্যে দরকার ডিজেল কল, মাড়াই কল আর ফাঁকা খোলেন। সেজন্যে সেচ-মেশিনের চাইতে এটা আরও কম চাষির থাকে। কাজেই সেখানে যেমন ভীড়, তেমনি ভাড়া। তাতেও চাষিকে মাড়াই-কলে মাথা দিতে হয়। আর আখ-ভাঙানো কল। তারও ভাড়া অতিরিক্ত। তাহলেও, এসবে সময় খাটনি দুই বাঁচায় যথেষ্ট রকম। চাষির এতসব বাঁচে। কেবল কঠিন হয়ে পড়ে চাষির বাঁচা।

আর আছে একটা রাজ-সরঞ্জাম, 'কলের লাঙল', ট্রাক্টর। আদি থেকেই 'জমি চাষ' কৃষিকাজের বুনিয়াদ। এক হালে আট বলদ থাকলে হতো 'ধর্মের চাষ', দু'বলদ হলে 'অধর্মের চাষ'। তখন জমি ছিল এক-ফসলি আর দু'ফসলি। আবাদের তদ্‌বির ছিল কম। আর ছিল পতিত জমি, অঢেল গোচর। ছিল বলদ, ছিল গাই, গোয়াল-ভরা গরু। চাষিরা ছিল পুরাপুরি কৃষিকর্মী। তারপর সময় পাল্টিয়ে গেল। বেশির ভাগ জমিই এক-ফসলি থেকে দু'ফসলি হলো, দু'ফসলি হলো তিন ফসলি। ফসলের তদারকি বেড়ে গেল। আর পতিত জমি আবাদি হলো। তাতে গরু কমলো গরু তদারকির সময়ও কমলো। তার উপর, টিকে থাকার জন্য বেশির-ভাগই চাষিদেরকে কৃষিকাজের পাশাপাশি অন্য কাজের মিশাল দিতে হলো। 'কেবল চাষ-আবাদে আর চলে না'। তখন গরু, কৃষিকাজ, অন্যকাজ— এক সঙ্গে সব সামলাতে চাষি হিমশিম খেয়ে উঠলো। তাছাড়া— যারা জমিতে খাটে না, তাদের আছে 'কৃষানে'র সমস্যা। আবার ঠেকায় বেচে, ভাগ হয়ে, এক-লাঙলের জমি অনেকেরই থাকে না। এসব অনেক

কারণেই বেশিরভাগ চাষি হাল-বলদ রাখতে অপারগ হয়ে পড়ে। ক্রমশ চাষিরা হাল ছাড়া বেহাল হয়ে ওঠে। উল্টিয়ে যায় 'হাল যার জমি তার' ধুয়া। এরকম একটা ভাঙা-ভাঙির মধ্যে কিছু কৃষিকর্মী (সাধারণত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা 'প্রান্তিক চাষি') দেখতে পায় লাঙল ভাড়া খাটিয়ে জীবিকার সুযোগ, কেউ দেখে ট্রাক্টর খাটিয়ে 'দুপয়সা কামানো'র সুযোগ। শুরু হয় 'ভাড়ার চাষ', চাষে ভাড়াটিয়া মনোভাব। চলে লাঙল ট্রাক্টর পাশাপাশি।

কৃষিযন্ত্রের মধ্যে ট্রাক্টরের দামই সব থেকে বেশি, যা চাষি কেবল স্বপ্নেই দেখে। আর তার ঝামেলাও বেশি। ফলে ট্রাক্টর এখানে কৃষকের সরঞ্জাম নয়। ট্রাক্টর চাষে আসে নেহাৎ অতিথির মতো, দূর-গ্রাম থেকে। চাষে লাভ বেশি হলেও চাষ মরশুমি। 'মাল' বহার কাজই বেশি। কাজেই কোনোটার চাষে শক্তি নাই, কোনোটার বা খিদে নাই; শুধু চটজলদি কিছু লাভ। ফলে ভাড়ার লাঙলে চাষ যতই 'আক্কারা' আর খারাপ হোক, ট্রাক্টরের চাষও কিছু সুবিধার হয় না। এধারে গরুর কাজ যন্ত্র যতই করে দেয়, গরু ততই বাড়তি হয়, আর লাঙল কমে। আর বেশি কাজের ক্ষমতার জন্যে ট্রাক্টরের চাহিদা বেড়ে চলে। চাহিদা বাড়লেই ট্রাক্টর মেলে না। অসুবিধা প্রকট হয় শ্রাবণে রোয়ার সময়ে। একদিকে ধানে পাটে মরশুমের কাজ চরমে, অন্যদিকে যেমন-খুশি আবাদের জন্যে ট্রাক্টর মাঠে নামতে পথ পায় না। কেবল বছরে দুবার নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্যে ট্রাক্টর মাঠে নামে। তাতে ট্রাক্টরের অসুবিধা নাই; 'মাল-বহা' কাজে লাগে। কেবল চাষি লাঙল ভেঙে, ট্রাক্টর না পেয়ে ফাঁপড়ে পড়ে। বে-হাল চাষি তখন নাজেহাল হতে থাকে। ঠেকা দিতে থাকে গরুর লাঙল— তখন যার না থাকে ভাড়ার বাঁধ, না থাকে কাজের ছাঁদ। এইভাবে নড়ে যায় কৃষিকাজের বুনিয়াদ। সেই 'ত্রিবৃৎ' নিয়ে চাষি সমানে ভুগে।

এই হলো বর্তমান চাষবাসের ব্যবস্থা। আগের সব আসবাবই থাকছে। তার সঙ্গে পরের জিনিসপত্র কেবল যোগ হয়েছে আরও। আর একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে— পুরাতন ব্যবস্থার গায়ে কলকব্জার ধাক্কায় একটা ভাঙচুর অবস্থা। এসবের মধ্যে ফলন বাড়ার সঙ্গে সোজাসুজি যোগ কেবল বীজ, সার, আর সেচের। অথচ খরচ প্রত্যেকটার জন্যই চড়া। কাজেই ব্যয়ের বহর যথেষ্ট বাড়ে। আর চাষির ফসলের দাম যা বাড়ে, আবাদের খরচ বাড়ে তার থেকে বেশি; তাতে চাষির থাকে কম ফসল। চাষের মজুর আর মজুরি নিয়েও চাষির সামনে বহুৎ সমস্যা আসে। 'আসছে' সমস্যার আভাস যেন চাষিদের কাছে ভবিষ্যতের ইশারা পৌঁছে দেয়। কিন্তু চাষিরা পিছাবে কোথায়?

এখন 'উচ্চফলন' আবাদে ফলনের ঝোঁকের একটা ধারণা দেওয়া দরকার। ধরা যাক— নতুন জাতের আবাদে প্রথম দিকে চলতি ভালো ফলনের বিঘা প্রতি হার ছিল ষোল মন ধান, তেরো মন গম। পরবর্তী ভালো ফলন* চলতি মতে বলা যায়— তেরো মন ধান, দশ মন গম। ছড়িয়ে পড়ার পর ফলনের হার কমেছে। তাতেও ধান-গমের মোট ফলন হয়ত বেড়েছে। সেটা হয়েছে— অন্যান্য ফসলের জায়গায় গম চাষ করে, বা বাড়তি ধান চাষ করে। তা না হলে বছরে 'তিন ফসল' হয় না; আর খাবার ধান তো আগে চাই। আর এই ফলন কমার ব্যাপারে চাষিরা জানে না, তার আসল কারণ কী? তাকে যে যা বোঝায়, তাই, তাহলে ভাগ্য কি মুখ ফিরালো?

এখানেই যেন চাষিদের বাড়তি উদ্যোগ আর আশা-স্বপনের সমাধি। তারা সব ভবিষ্যতের জন্য তৈরি থাকে।

তবু বাকি থাকে চাষির ফসলের 'মার'-এর কথা। 'মার' আসে দুদিক থেকে। প্রথমটা মানুষেরই হাতে। কৃষিকাজের 'মূল সামগ্রী' নিয়ে বাজারে সব-রকম কারসাজি, আর সেচে সঙ্কট, বর্ষার জলনিকাশে বাধা। তারপর ফসলের তছরূপ। আগে একটা স্বয়ংচেতন সামাজিক মনোভাব** চাষির ফসল রক্ষায় সহায় হতো। এখন নিজ সামর্থ্যই সম্বল; 'কালের হাবভাব'-এর ওপরেই চাষিকে নির্ভর করতে হয়। তবে কৃষকের মারের শেষকর্তা বুঝি প্রকৃতি। চাষির ফসল মাটি আর রোদ-বৃষ্টি-বায়ুর সন্তান। একটা কিছুর এধার ওধারই চাষির ভাগ্যে বহু গুণ হয়ে নেমে আসে— খরা, বন্যা, শিল, ঝড়— যার কাছে সে অসহায়। শঙ্কা তার সব সময়েই। প্রকৃতির সহায় তার পদে পদে দরকার, চাই সারাক্ষণের 'দয়া'। তাই তো 'সে' দয়াল। 'সে' একটু মুখ ফেরালেই কৃষক 'তার' 'পদ-পল্লব' মেগে দু'হাত উপরে তুলে। কিষাণের সঙ্গে প্রকৃতির এই মান আর দান-এর পালা আবহমান। এমন একটা বছর মেলা ভার যেটায় তার সব কটা ফসল ঠিকঠিক ঘরে উঠে। একটায়-না-একটায় সে মার খায়ই। সঙ্কট আসে— যখন সে পরপর দু'তিন ফসলে মার খায়।

চাষির যেমন ফসলের 'ঠিক' নাই, তেমনি চাষির জীবনেও 'ঠিক' নাই। তার সব পরিকল্পনাই অনিশ্চিত। আজ যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, সে ভাবে— যদি আগামী ফসল ভালো হয়, দামটা যদি 'ভালো' পায়, তবে সে সেটা করবে। এমনি করেই সুদিনের পথে তাকিয়ে থাকে তার ঘরবাড়ি, মেয়ের বিয়ে, পরিজনের আব্দার, সংসারের প্রয়োজন, রোগের চিকিৎসা। চাষির চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় দূর আকাশে। সামনে চিরদিনের সেই প্রশ্নহীন নিরুদ্দেশ ভবিষ্যৎ। অনাদি কাল যেন দিগন্তের গায়ে তার বংশ-পরম্পরার পট এঁকে দেয়। উদাস বাতাস লাগে তার অঙ্গে অঙ্গে।

---

* আগের থেকে অনেক বেশি সার-বিষ-ওষুধ দিয়ে

** ''চাষির না হলে আমরা পাবো কোথায়''?

কানে ভাসে—

এই তো ভবের খেলা—

যাহার ঘরে বাস করিলাম   হেসে কেঁদে ঘর গড়িলাম

তাহার কিছু না বুঝিলাম।   আসে যাবার বেলা।।

— এই তো ভবের খেলা।।

বিবরণের পরে

এ গেল চাষিদের চাষ-আবাদের বিবরণ। তারপর চাষিদের ফসল-বিক্রির ব্যাপার। তার বাজার, তার দাম; বাজারে তার চাহিদা, যোগান; কৃষকদের উপর এসবের প্রভাব। বিষয়গুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে থাকে। তাদেরকে একটা একটা করা চলে না। কাজেই আলাদা করে বলতে গিয়ে হয়তো পুনরুক্তি চলে আসে।

দেখা যায় কৃষিপণ্যের কিছু দিক আছে যা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে মেলে না। তফাৎটা গোড়াতেই— চাষিরা বেচে, 'মহাজন' কেনে। প্রথমে আসি দামের কথায়। আমরা দেখি, সব জিনিসের দাম সাধারণভাবে বাড়ের মুখে। কিন্তু চাষির ফসলের ব্যাপার কিছুটা অন্য রকম। ধরা যাক চাষির একটা ফসলের দাম— একই মরশুমের কোনো সময়ে কুইন্টালে চারশো টাকা, কোনো সময়ে সাতশো টাকা, এবং যেতে পারে চারশোরও নিচে বা সাতশোরও উপরে। এখন যা দাম, যে কোনো সময়ে তার কম বা বেশি হতে পারে। দামটা ঢেউ-এর ভঙ্গিতে 'নাচনা' করে। তবে কমার চাপটাই চেপে বসে। কুইন্টালে বিশ টাকা বেশি হলে চাষি ভাবে— এটাই বুঝি তার বেচার সুযোগ, এ দাম হয়তো আর পাবে না।

চাষি ফসল রাখতে পারে না। ফসল উঠলেই তাকে বেচতে হবে— একথা সবাই জানে। কাজেই দামটা সে-সময়ে কমই থাকে বেশির ভাগ। 'অভাবে অভাব আনে'। বেশি দামটা চাষিদের পাওনা না। তারই মধ্যে হয়তো কোনো চাষি কোনো সময়ে পেয়েও যায় সুযোগমত। আর আগামী বছরের দাম তো আরও অজানায়। সেটা হতে পারে গত বছরেরই মতো। অথবা তার কম বা বেশি, সব রকমই। ব্যবসায়ীর পণ্যের পাশে কৃষকের ফসলের দামের রেখাপথ ধরলে তাতে কোনো পরিচিত নিয়ম-কানুনের দেখা মেলে না। যদিও সব-সময়ে মেলে না, তাও যদি এটাকে একটা আকার দিয়ে বলা যায় যে— চাষির যখন ফসল ওঠে, তার দাম থাকে কম; তারপর তার মোটামুটি বেচা হয়ে গেলে দামটা যেন আড়ি-মুড়ি ছাড়ে—তাহলেও সামান্যই বলা হলো। তাতে বলা হলো না— কমটা কত কম; যদি বাড়ে, সেটাই বা কবে, কত? আর আদৌ কি বাড়বে? আবার এই ওঠা-নামার গায়ে থাকে ছোটো ছোটে অসংখ্য ওঠা-নামার ঢেউ। আর প্রতিটা ঢেউ-এ থাকে আশা-আশঙ্কা আর অপেক্ষা! যেন কোনো ঝানু প্রতিপক্ষ তাদের ভিতর পর্যন্ত দেখে নিয়ে সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ কষে চলে।

তারপর চাষি ফসল বেচেই বা কোথায়, কাদের কাছে? দরকার মতো, কোনো একটা জায়গায়, নির্দিষ্ট কোনো সময়ে চাষি ফসল বেচতে পারে— এমন কি কোনো 'বাজার' আছে?— না। জায়গা, সময়, কোনোটাই না। চাষি ফসল বেচে বাড়িতেই, গাঁয়েরই মানুষ 'দালাল'-এর কাছে। দালালের সঙ্গে দেখা, কথা, দর-দাম চলতি অবস্থায়, পথে ঘাটে। তাতে এমন বহু সময়ই আসে যখন চাষির কিছু বেচা দরকার, কিন্তু কোনো গ্রাহক নাই। এসময়ে পথে যদি দালাল দেখে তাতেই সে খুশি। —যাক! এবার তার ফসল বিক্রি হবে, যে দামেই হোক। দাম, ওজন, দাঁড়ি-বাটখারা, সবই ঠিক হয় একজন চাষি আর একজন দালালের মধ্যে চুক্তিতে। হতে পারে— একজনের 'দাম-ওজন' অন্যজনের সঙ্গে মিলে না। আর ফসল বিক্রির প্রথাটা এরকম যে, কোনো চাষি একজন দালালকে ফসল-বিক্রির 'কথা দেওয়া'র মুহূর্তেই যদি অন্য দালাল বেশি দাম বলে, সেখানে চাষি 'কথায়' বাঁধা পড়ে, কম দামেই ফসল বেচে; কিন্তু ব্যাপারির পক্ষে ব্যাপারটা তেমন না; কৃষি-বাজারে এটা চলতি ঘটনা যে, কোনো আড়তদার সকালে যে দামে 'মাল' আনতে বলে, সেটা নিয়ে গেলে হয়তো বলে 'বাজার কাটা', সে দামে আর নেয় না। তখন আড়তদারের কথাই শেষ কথা। তারা বলে— 'এটাই ব্যবসা'।

কৃষকের ফসল বিক্রির ব্যাপারে, কোনো বিষয়েই এমন কোনো নিয়ম চালু নাই যা সবাই মেনে চলবে। ''যদি দাম-ওজনেই ঠিক না থাকে, তবে 'বাজারে' থাকে কী''— এসব চাষিরা ভাবে না। এই বাজারই তাদের বাজার। তাতে কখনও একই সময়ে একই গাঁয়ে একই ফসলের দাম-ওজন হয় ভিন্ন ভিন্ন। এই তফাৎটা আরও বাড়তে থাকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। এখানে দাম সম্পর্কে এক-কথায় বলতে গেলে : কোনো চাষিকে কোনো দালাল একটা ফসলের যে সময়ে যা 'দাম' বলে, তখন তার কাছে সেটাই 'দাম'। এ' দামটা কি অন্য 'দাম'-এর সঙ্গে মিলে? কিন্তু আমাদের কথা কৃষকের কথা। কৃষকের জন্যে কৃষকের ফসলের এটাই 'দাম'।

চাষির ফসল বেচার সময়ে এখন আর একটা ব্যাপার দেখা যায়, 'টাকার ক্রাইসিস'। পাটে সেটা বিশেষ ঠেকায় ফেলে। কোনো 'ঘরে' পনের দিনে টাকা হয়, কোনো 'ঘরে' পঁচিশ দিনে। 'মহাজন'দের 'ঘরের' নিয়মটাই সেখানে 'নগদ' কথার মানে দাঁড়ায়। তারপর 'দিন' পিছায়, কিস্তি হয়। কিন্তু কখনো হাতে হাতে টাকা দেওয়ার কথা করেও ফসল বেচে টাকার জন্যে ধর্না দিতে হয় দিনের পর দিন। জরুরি কাজে ফসল বেচে দিনের দিন টাকা যোগাড় করা মহা ঝক্কি। এই ব্যবস্থার মধ্যে চাষির 'টাকা চোট' হওয়া একটা 'সাধারণ' ঘটনা। আর এমন ঘটনাও বিরল না যে— কয়েক কোটি টাকা 'দাম' বাকি রেখে 'মহাজন' উধাও। তবুও 'মহাজনের' ঘরে খালি হাতেই 'মাল' দিয়ে

আসতে হয়। এটাই বাজারের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সব পক্ষই এবিষয়ে একমত যে— রক্তে মাংসে এখন এটাই 'বাস্তব' ব্যবসা।

চাষির ফসল বেচার ব্যাপারে এরপর নানাভাবে যুক্ত থাকে 'চাহিদা', বাজারের তেজি-মন্দা ভাব। কিছু ফসল আছে, বাজারে সেগুলোর যথেষ্ট চাহিদা। চাষিরা সে সব আবাদও করে। অথচ এখানে সেগুলোর কোনো স্থায়ী 'মহাজনি খরিদ' নাই। তার মধ্যে ধান এবং কিছু তেল ও ডাল শস্যের মতো খাদ্যদ্রব্যও আছে। সেসবের বেচা-কেনা যা হয় নিজ গাঁয়ের মধ্যেই। দেখা যায়— চাষির ঘরে ফসল; ভোক্তার বাজারে দামে আগুন। তবু চাষির ফসল বিক্রি নাই। আবার তেল-মশলার কিছু ফসলের আবাদ হয়েছে টুকটাক্। বাজারে তার দাম-চাহিদা চড়া হলেও সব বছর সবটার ব্যাপারী থাকে না। এমন কিছু ফসলের ব্যাপারী হঠাৎই সাইকেলে চড়ে রাস্তা দিয়ে হেঁকে যায় মাঝে মাঝে; চাষিকে থাকতে হয় সদা-সতর্ক। এ হলো চাষির 'ভ্রাম্যমাণ' বাজার। আর, কোনো ফসলের সাধারণ বেচা-কেনা চলে ফসল ওঠার মুখে, আর ফসল ওঠার পরে, কিছুদিন। এর মাঝে কখন যে হঠাৎ তার ফসলের ডাক পড়ে, তা চাষি জানে না; তবুও থাকতে হয় তারই অপেক্ষায়। তা ছাড়া দেখা যায় যে বাজারে কোনো চালু শস্য; দাম-চাহিদা যথেষ্ট; এখানে তার আবাদ-খরিদ দু'ই আছে; কিন্তু চাষি সেটা বেচতে গিয়ে হয়তো এমন অবস্থার মুখে পড়ে, যেন সেটার কোনো দরকারই নাই।* 'শুধালে কেউ কথাই বলে না'। এধারে তখন চাষির প্রয়োজন আর লেনা-দেনার পাহাড় জমে আছে। চাষি তখন খাঁচায় বন্দী। বাধ্য হয় যে কোনো দামে বেচতে। চাহিদা আর যোগানের এই নানা গরমিল দেখে চাষিরা তার মর্ম বোঝে না। হয়তো কোনো ফসলের হঠাৎই একবার বাজারে তেজিভাব দেখা যায়। পরের বারে চাষিরা সেটার বেশি করেই আবাদ করে। ফসল ঘরে তুলে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেবার হয়তো ব্যাপারীর টিকিই দেখা যায় না। সে এক মস্ত ফ্যাসাদ। বিপদ দেখা দেয় যদি সেটা নিজ-গাঁয়ের মধ্যেই বিকিয়ে যাবার সম্ভাবনা না থাকে। ''নতুন যুগ'' নিয়ে আসে নতুনতর ঝুঁকি আর সমস্যা।

চাষিদের আন্দাজের বাইরে দাম আর চাহিদার এই কমা-বাড়ার মধ্যেই চাষিকে আগামী সনের ফসল বাছাই করতে হয়। এ যেন অনেকটা 'চোখ বেঁধে পথ দেখা'। অনিশ্চিতের এই করাতটা দুধারেই সমান কাটে—চাষির সরঞ্জাম কিনতে আর ফসল বেচতে। সম্মুখে অপেক্ষা করে আরও বহু অজানা। চাষি অজানিতের স্রোতে তার সংসার সঁপে দিয়ে মনের দরজা খুলে দেয়—

দয়াল, কোন বা দেশে যাই অকূল কিনারায়;
তোমার নামে দিলাম পাড়ি আমার ভাঙা নায়।।

এপর্যন্ত একটা উদাহরণ নিলে ভালো হয়। পাটই হবে আদর্শ উদাহরণ। 'উপরমহল'-এর সঙ্গে চাষিদের সম্পর্কের দিকটাও তাতে প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপক্ষও পাটের বিকি-কিনিতে সরাসরি সামিল। এখানে কাঁচা-পাটের তেমন কোনো স্থানীয় ব্যবহার নাই। চাষি পাট আবাদ করে বিক্রির জন্যেই। পাটেই তার নগদ টাকার মূল যোগান। তাছাড়া পাটের লাগসই বদলি ফসল এখানে চাষির সামনে নাই। এ পর্যন্ত অনেক কারণেই পাট তার বৈশাখী আবাদের 'একাই একশ'; চাষির একটা প্রধান ফসল। এখন দেখা যাক পাটের বাজারে একটা বছরের ব্যাপার। ধরা যাক ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। তার আগের ক'বছর পাটের দাম ২৫০ থেকে ৪০০ টাকা কুইন্টাল পর্যন্ত ওঠা-নামা করছিল। সেবার পাঠ ওঠার মুখে দাম হল ৭০০ টাকা কুইন্টাল। পাট ওঠার মধ্যে কখনো এবেলা ওবেলা বেড়ে, দাম 'হাজারে' ঠেকলো। চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেউ ভাবলো 'অবাক কাণ্ড', কেউ ভাবলো আরও বাড়বে। বেশিরভাগই ভাবলো দাম এখন আর কমবে না। কেনা-কাটার হিড়িক পড়ে গেল। দোকানে দোকানে মালের ঘাটতি! কৃষক চায় কত কিছু! সে দেনা, প্রয়োজন, শখ, সাধ— একে একে সব মেটাবে। উপরে বুঝি অদৃষ্ট হাসলো। এই দামটা চব্বিশ ঘণ্টা মতো স্থায়ী ছিল। তারপরই কমতে শুরু করলো। বিভ্রান্তির মধ্যে বহু চাষিই ঘরের পাট বেচতে পারলো না। তখনো পাটের দাম ৮০০ টাকা। কিন্তু তখনো চাষির ঘোর কাটেনি। 'হাজার টাকা' দামটা তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল; যেন একটা 'বিপ্লব' ঘটিয়ে দিলো। তাই অনেকে ভাবলো দামটা আবার বাড়বে। মরশুমের শেষের দিকে দাম দাঁড়ালো ৫০০ টাকা কুইন্টাল। পরের মরশুমে লাগাতার কমে ২৫০ টাকা। চাষিরা ক্ষোভের সঙ্গে বললো, 'আর কতো কমবে!' তারপর পাটের ভরপুর মরশুমে সবাইকে স্তব্ধ করে তার দাম এক সময়ে ১৬০ টাকার ধ্বসে পড়লো। এই নিশ্চুপ পরাজয়ের গ্লানি ঢাকতে কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলো— গতবার যারা সব পাট বেচেনি, অথবা এবার কিছু বেশি বুনেছে, তাদের উদ্দেশ্যে। এধারে গেল-পাটের দামের জন্যে এবার পাট সব থেকে বেশি। চাষিদের অবস্থা তখন 'দোষ না জেনে সভার মাঝে চড়-খাওয়া ছোকরা'-র মতো। এ অবস্থায় উপযুক্ত শোনায়— 'বেশি পাট বুনে, জল কাদায় বেসামাল কাজ নিয়ে' নাজেহাল কর্তাকে তার 'বোকামি'-র জন্যে— রাগে দুঃখে সংসার-সঙ্গিনীর

* এখানে চাষি আর দালালের একটু কথোপকথন (গাঁয়ের রাস্তার উপর):
চাষি— দাদা, কিছু ফসল বেচা দরকার। দালাল— এই পড়তি বাজারে মাল হবে না। (অর্থাৎ— এত কম দামে তুমি ফসল বেচবা না) তাছাড়া মহাজনেও মাল কিনছে না। তবে যাব। মালটা দেখা থাকবে।

অসহায় ভর্ৎসনা। সব শেষ দামটা তাদের 'আজব আশা' পিষে গুঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলো তাদের বর্তমান আসল জায়গাটা।— একটা 'চড়' যেন তাকে কোনো 'অজানা বেয়াদপি'-এর শাস্তি দিয়ে গেল। সেবার পাটের তৈরি-খরচা হয়তো গড়ে দাঁড়ায় ২২৫ টাকা কুইন্টাল। অর্থাৎ বেশির-ভাগ পাটই বিকালো তৈরি-খরচার নিচে। এখানে অবশ্য পাটের সরকারি খরিদ আছে 'জেসিআই'-এ। সেখানে 'ফড়ে-দালালদের' থেকে 'সহায়তা' দিবার জন্যে দরের একটা নিম্নসীমা বাঁধা থাকে। কিন্তু সেখানেও চাষিরা তাদের তেমন 'সহায়তা' দেখে না। —বর্ষাকাল, জেসিআই-এর সামনে, খোলা আকাশের নিচে, পাটের পালায় ঢাকা দিয়ে চাষিরা দিন-রাত পাহারারত। এটা পাট-চাষিদের 'কিউ'। তারপর তা কখন খুলে, কবে বন্ধ হয়— তার ঠিক নাই। সেখানে পাট-বেচা চাষিদের পক্ষে যেমন হয়রানি, তেমনি অনিশ্চয়তা। সেখানে ফড়ে-দালালদেরই ভিড় বেশি। আর চাষিদের কাছে 'ফড়ে-দালালরাই ভালো'! কৃষকের বরাতে বিপরীত ফল।

দামের এই চাকাটা ঘুরতেই থাকে। তার একটা বিশেষ উদাহরণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ। তার আগের ক'বছর পাটের দাম ৪০০ থেকে ৭০০/৮০০ টাকা কুইন্টাল পর্যন্ত উঠা-পড়া করছিল। সেবার মরশুমের গোড়াতেই পাটের দাম হাজার ১২০০ দিয়ে শুরু হয়। শেষে এক-সময়ে দাম ১৭০০/১৮০০ পর্যন্ত উঠে। তারপর কমতে থাকে। তিন সনে পাট ওঠার মুখে দাম ১০০০ টাকায় নেমে আসে। লাগাতার কমে শেষে দাঁড়ায় ৬০০ টাকা। ১৪০৪ সনে পাট উঠার মুখে দাম হয় ৫০০ টাকা, ভরা মরশুমে নেমে আসে ৪০০-ও নিচে। চার সনে পাটের তৈরি খরচা উঠে আসে হয়তো কুইন্টাল প্রতি ৬০০ বা ৭০০ টাকার কাছে। সেবার পাটের সব থেকে বেশি দাম ৫০০ টাকা। এই বছর— দেশ ও বিদেশের খবর অনুসারে— পশ্চিমবঙ্গের ৫৯টা পাটকলের ৫৮টাই চালু, এবং সবগুলোতেই যথেষ্ট বরাত; আর প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে বাইরের বাজারে আছে পাট-জাত জিনিসের চড়া চাহিদা, আর 'উজ্জ্বল ভবিষ্যত'*; অর্থাৎ পাটের বাজারে সুখবর। সে বছরই 'স্বর্ণালী তন্তু'* পাট বিকালো সব থেকে কম দামে, তৈরি-খরচার ঢের নিচে। অথচ এখানে পাট-ই চাষির আর্থিক মেরুদণ্ড। এই ঘাটতি মিটাবার তার আর কোনো সম্বল হাতে নাই। বেশির ভাগই, চাষি আবাদ করে বাকিতে বা সুদে টাকা নিয়ে। তাতে সে কিসে বা দেয় আসল, আর কিসে বা দেয় সুদ। কিন্তু কে শুনে কার কথা। তারপর লাগাতার কয়েক বছর পাটের দাম আর তৈরি-খরচার উপরে বিশেষ উঠতে চায় না।

আমরা যখন 'খবর'-এ শুনি— মিল পাট পায় না, কারখানা বন্ধ, শ্রমিকরা অবস্থানরত, তখন হয়তো চাষিরা ঘরে ঘরে পাট, আর বুক-ভরা উদ্বেগ নিয়ে পাট বেচার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। দুর্বোধ্য বাস্তবতা! চাষিরা আঙিনা থেকে 'মালিক'-এর কারখানা— অজানা তার ঠিকানা।

কোনো ফসলে দু'একটা মরশুমে তেজি ভাব দেখা গেলে চাষিরা সেইদিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর চাহিদা হঠাৎ পড়ে যায়, দাম নেমে আসে তৈরি-খরচার কাছাকাছি। তখন সে এ ফসল থেকে সে ফসল করে। যেন সে আগুন-লাগা কাঁথায় পাশ ফিরে। টেনে-টুনে টিকিয়ে-রাখা আবাদের পুঁজি মাঠে মাঠে ছিটিয়ে এখন সব-সময় ঘরে উঠতে চায় না। যেটা সে ধরতে চায়, শেষে সেটাই তাকে নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ে। তার বুকে জাগা আশা কার যেন ফুৎকারে নিভে যায়। বুঝি কৃষক ধীরে ধীরে নিজেকে শুধরিয়ে নেয়।

কথায় কথা আসে। চাষির ফসলের দামের এত যে উঠা-পড়া, তাতে সাধারণ ক্রেতাদের কতটা যায়-আসে? চাষির ফসলের দাম কমার জন্যে সাধারণ ক্রেতাদের দাম অল্পই কমে, আর ক্রেতা-সাধারণের দাম বাড়ার জন্যে চাষির দাম ক্বচিৎ বাড়ে। তাদের ফসল ফিরে আসে তাদেরই মাঝে। মাঝখানে, যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় কোথায় কী ঘটে যায়। তখন আর সে চড়া দর্শনী ছাড়া ঘোমটাই খুলে না। সে আর তখন হেলায়-ফেলা চাষির 'ফসল' নয়, আদরে গরবে ধনীর 'পণ্য'।

চাষিরা জানে না— চাষিদের ফসল বেচার সময়ে এক রকম আর ক্রেতা-সাধারণের কিনার সময়ে আরেক রকম— এই দু'মুখো দাম কারা ঠিক করে। চাষি ফসল তৈরি করে, কিন্তু তার দাম ঠিক করে না, দাম শোনে ব্যাপারীর মুখে। উদ্যোগ, আয়োজন, খরচ-পত্র, আবাদের সব কিছুই কৃষকের নিজের। তবে তার দাম সম্পর্কে 'মত' দেওয়া কৃষকের 'অধিকারের' মধ্যে পড়ে না। আর-যে ব্যাপারেই কৃষক যার কাছে যায়, সবাই তার নিজ-নিজ হিসাব মতে পাওনা দাবি করে— সেটা তাদের 'অধিকার'। কিন্তু কৃষকের কথা কোথাও-ই খাটে না। কোনও ব্যাপারে কৃষকদের কোনো মত-অমত জানাতে থাকে কেবল 'পথ'। তাতে সেটা গণ্য হয়ে থাকে 'বিক্ষোভ' হিসাবে। আর বিধি মতে এটা হয়তো 'আইন-এর লঙঘন' হিসাবেই বিবেচিত হয়।

আসি চাষির ফসলের কথায়। চাষির ফসলের ব্যাপারী 'দালাল'; দালাল বেচে 'ফড়ে'-এর কাছে; তার পরে 'মহাজন'— এ পর্যন্তই চাষি শুনে। 'মহাজন' কে তারা জানে না। 'ফড়ে' তাদেরই এলাকার লোক; পেশায় ব্যাব্‌সিক; মধ্যবিত্ত বা চাষি-ঘর থেকে আসে। আর 'দালাল' তো এক গাঁয়েরই লোক; চাষেই বেশি খাটে। ফোড়ের জন্যে বেচা-কেনার যে দাম-

---

* চিহ্নিত উদ্ধৃত শব্দ দুটো আকাশবাণী কলকাতায় প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে গৃহীত

নিয়ম ধরা হয়, সেটাকেই আরও একটু ভারী করে, সেটা তারা ছেড়ে দেয় দালালের 'পরে। আর দালাল সেটা চাপিয়ে দেয় চাষির ঘাড়ে। চাষি সেটা মাথায় নিয়ে ভাবে 'কপালের ল্যাখা'। এধারে ক্রেতা-সাধারণ হয়তো ভাবে না যে— ৫০ টাকা কিলো পিঁয়াজ কিনে যখন তার চোখ কপালে, তখনও হয়তো চাষি সেটার ২ টাকার বেশি দাম পায়নি। অথবা বাজারে যখন ১০ টাকা কিলো আলু, অনেক চাষি হয়তো সেটা ১০০ টাকা কুইন্টাল দরে বেচে কপালে হাত দেয়।

চাষিরা এসবের কিছুই বুঝে উঠে না। কেবল জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো এক শক্তিতে অনুভব করে— যেন শুষে নেওয়ার জন্যে তাদের চারপাশে ওঁৎ পেতে ছড়িয়ে থাকে জিওন্ত নল-জাল। সে-সব তাদের চোখের 'পরেই নড়েচড়ে, কিন্তু ধরা দেয় না। কিছু 'অদৃশ্য অস্তিত্ব' বুঝি চাষিরা অনুভব করে থাকে।

এবার চাষিদের আর্থিক অবস্থাটা এক-নজরে দেখা যেতে পারে।— চাষির ফসলের অনিশ্চিত দাম। আর সে-দাম যে হারে বাড়ে, ফসল-তৈরির খরচা বাড়ার হার তার থেকে বেশি। আর ব্যয়ের ব্যাপারে চাষিরা তো সবার সঙ্গে সমানভাবে 'মূল্যবৃদ্ধির' মুখোমুখি। বরং সদর থেকে 'মাল' যখন চুঁইতে চুঁইতে দূর মফঃস্বলে গিয়ে ঠেকে, তখন তার মান কমে, কিন্তু দাম বাড়ে। চাষি ক্ষইতে থাকে দুদিক থেকেই।

তারপরে আছে 'মার' : মানুষের হাতে, বিধাতার হাতে। কখনো মানুষ ও বিধাতা মিলে। দেশের কর্তারা তাতে চাষিদের 'দুর্ভাগ্য'-কেই দায়ী করেন। দুর্ঘটনাও ঘটে 'দুর্ভাগ্যে'র সঙ্গে মিল রেখে। কখনো তা এমন সময়ে ঘটে! প্রচণ্ড বৈশাখ। চারিদিকে খরা; মাটি তেতে লাল। এধারে চাষির খেতভরা ফসল। গুছিতে গুছিতে শীষ। শীষে শীষে সম্ভাবনা, সম্বৎসরের আশা। চাই জল। একমাত্র সম্বল তখন 'রাজার' জল। আসে ঝড়! পোল পড়ে; 'টাওয়ার' ভাঙে। বিদ্যুৎ বন্ধ অনির্দিষ্টকাল। চোখের 'পরে তার 'সবকিছু' তিলে তিলে শুকিয়ে উঠে! চাষি বোধহয় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। কী যে চায়; কী যে করে বসে! তাতে হয়তো গুলি চলে। ক্ষেতের মাটি ধূসর রেখে রাস্তার ধুলো রাঙিয়ে আসে। কী চাইতে কী ঘটে! একে 'দুর্ভাগ্য' ছাড়া আর কী বলে? 'নতুন যুগ'-এর সঙ্গে চাষিদের পরিচয় হয়ে ওঠে।

শেষে একটা প্রশ্ন আসে— 'চাষিরা বাঁচে কীভাবে'। উত্তর জানা নেই। নিষ্পন্দ পাষাণপুরীর বুকে, অথবা বন্যাধৌত পলির ধূ-ধূ শূন্য শ্মশানে, যেভাবে ঘাস-লতা মাথা তুলে জাগে, তেমনি, চাষিরা— সমস্ত দুর্যোগ আর ধ্বংস-কাণ্ড পাড়ি দিয়ে— খোলা আকাশের তলে, মাটির 'পরে ভর করে দুপায়ে উঠে দাঁড়ায়। নিঃসাড় নিরালার হাহাকারে ফিরে ফিরে আনে প্রাণের সবুজ হাসি। বুঝি তখন 'বিশ্বকর্মা'-র হাত নেমে আসে শ্রমজীবীর হাতে। তাদেরকে বাঁচতেই হয়, যেন 'বিশ্বকর্মার'-ই তাগিদে।

তাই 'ক্ষতি-বৃদ্ধি'-ই শেষ কথা নয়। এ কেবল 'বাঁচার লড়াই' নয়। চাষিকে আবাদ করতেই হবে, যত বিঘ্ন ঘটুক!— এ 'বিধির বিধান'। তাই, আবাদের বাড়তি ব্যয়ের যোগাড় দিতে বাড়তি কাজের ঝুঁকি নিতে হয়। চাষির 'জীবন সংগ্রাম' হয়ে উঠে কঠোর জটিল, ঝুঁকিপূর্ণ— কিছুটা ছন্নছাড়া।

বাতাসে ভাসে—

সাবধানে বাইও রে মাঝি আমার ভাঙা নাও।
ঝড় তুফানে দিব পাড়ি, সামাল সামাল বাও।।

পরিশেষে

পরিশেষে প্রসঙ্গের দাবিতে ''কৃষক'' সম্পর্কে আরও দু'একটা কথা এসে পড়ে। এক সময়ে চাষির জীবিকার বিদ্যা, সংসার-সমাজের বুদ্ধি, জীবনের ভাব-ভাবনা, তার কথা-কাহিনী, গীত-বাদ্যি, ছড়া-কবিতা, এমন কি রোগের চিকিৎসা— সবই তার ছিল। রাজার শাসন, 'সামন্ত'র অত্যাচার, সমাজের অবজ্ঞা— এত সবের মধ্যেও ছিল তাদের নিজস্ব মানদণ্ড, নিজেদের আত্মচেতনা— ছিল ''উচু'' সমাজের পাশা-পাশি, সমান্তরাল ভাবে। চাষিরা জানে— কৃষিকাজ ''ঢালা আর উব্‌ড়া''; গায়ে যা লেগে থাকে তাই। চাষাবাদ লাভের বেসাতি নয়। তা-সত্ত্বেও কোথা-থেকে 'আশা' এসে জুটে। আজ তার ছন্নছাড়া জীবিকার মধ্যে সবকিছুই যেন সে হারাতে বসেছে। এখন সে 'ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' তাকিয়ে। নির্বিচারে বিসর্জন দিয়ে, বর্তমানে তার লৌকিক জীবনটার সব কিছু ঝেড়ে-মুছে মঞ্চে এনে অতীতের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। আড়াল পড়ে তার বর্তমান। আজ যে ফসল-ফলানো যন্ত্রগুলোরই একটা— রক্ত মাংস ঘিলু ছিলে নিয়ে বার্নিশের লেপ দেওয়া। এখন জমিতে ফসল ফলানো আর বণিকের পণ্য কেনাই তার জীবনের মানে। (নামের বদলে নাম্বার।) বোধহয় 'মানুষ' হিসাবে গণ্য হবার জন্যে বর্তমান 'সভ্যতা'-র প্রথম দাবি যে— সে হবে বণিকের পণ্যের একজন 'উপভোক্তা', শেষে নিজেই পণ্যের উপভুক্ত। এ অবস্থায় চাষির চাষবাসের যাত্রাপথেই খুঁজতে হবে তার ছড়িয়ে-থাকা পরিচয়ের বর্তমান 'বাস্তব'-কে।

বরাবর দেশের লোকে এই জেনে এসেছে যে— রাষ্ট্রকর্তাদের হাতেই দেশের সর্ব দায়িত্ব। সে ভাবেই 'কর্তারা' প্রথাগত চাষবাসের মধ্যে নতুন কৃষিব্যবস্থা 'আহরণ করে' চাষিদের হাতে তুলে দেন। নতুন বীজ, নতুন সার, কীটনাশক, সেচ— সবই তাঁদের দান, এবং কিছু সরঞ্জামও। তারপর এক মোড়ের মাথায়, মোটামুটি ১৯৭০-৭১ সাল, রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তাৎপর্যপূর্ণ ''সবুজ বিপ্লব''-এর ডাক দেন। কয়েক বছরে সে ডাক বোধহয় দূর গ্রামে পৌঁছিয়ে যায়। যেন একটা আলোড়ন জেগে উঠে। (রাজনীতির ঝঞ্ঝার মাঝে যেন অর্থনীতির 'হাতছানি'।) সে ডাকের এক দশকের মধ্যেই চাষিরা দেখে— তাদের সব ব্যাপারই বাজারের উপর ভর করে চলা শুরু

করেছে। ধীরে ধীরে বাজার হয়ে উঠল তাদের কৃষিব্যাপারে সব কিছুর একমাত্র যোগানদার, একমাত্র নিয়ামক। রাষ্ট্রের জায়গা নিল 'বাজার'। তারপর বাজার থেকে বাহির হয়ে চাষির সামনে দাঁড়াল অমিতাকার 'বণিক'। এবার চাষিদের কারবার বণিকের সঙ্গে। সেখানে তাঁরা চাষির উপকরণ বেচতে চান যতটা সম্ভব বেশি দামে, চাষির জিনিস কিনতে চান যতটা হয় কমে। সেখানে তাঁদের জিনিসের মান ও পরিমাণের ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। 'মুনাফা' তাঁদের একমাত্র বিবেচনা। চাষির সঙ্গে কারবারে তাঁরা বাধাহীন, মুক্ত। জনস্বার্থে দায়বদ্ধ নন, জাতির স্বার্থে আবদ্ধ নন— তাঁদের তরফে তা যথার্থই "মুক্ত বাজার" অর্থনীতি। যেটা চাষিরা ভাবে 'হতে পারে না', সেটা খুব সহজেই তাদের চোখের সামনে ঘটে যায়। ওধার থেকে প্রচার মাধ্যমে ভেসে আসে "স্বপ্ন সফল করুন" বাণী। তাঁরা গড়ে চলেন তাঁদের কামনার স্বপ্নরাজ্য। তবে চাষিদের তরফে সেটা তাদেরই অস্থি-মজ্জার বিনিময়ে। চাষিরা তাকিয়ে তাঁদের শেষ দেখে না। ফিরে তাকায়— 'সৃষ্টিকর্তা' পরম বিধাতার দিকে। কোথা থেকে এক আকাশচুম্বী স্পর্ধা যেন 'বিধির বিধান' ভাঙতে আসে!

অনেক সময় কোনো কোনো জায়গায় কিছু কৃষকদের আয়-উন্নতির কথা শুনা যায়। তাতে এমন মনে হয় যে— এটাই বুঝি কৃষকদের সাধারণ চিত্র। কৃষকদের সম্বন্ধে সমাজের অন্য অংশে যে ধারণাই থাক, তাতে তাদের অশ্রু আর ঘামে ভেজা জীবন কতটা ফুটে ওঠে সেটা অবশ্য আর এক কথা। তাদের সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই পাওয়া যায় নানা ক্ষেত্রে— ইতিহাসে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে...। কত 'সংগ্রাম', 'বীরত্ব' আর শিল্প-সংগীতের কত বৈচিত্রের কথা, আগেকার শাসন-শোষণের অনেক কথা— তবে কৃষকদের বর্তমান জীবন-জীবিকার বাস্তবতা— এ বিষয়ে উল্লেখের অভাব এত সবের মধ্যেও নজরে না পড়ে পারে না। কৃষকদের পক্ষে নানা দাবির 'শ্লোগান'ও দেখা যায়, কমই পাওয়া যায় এখানকার কৃষিকাজের সঙ্কট আর সমস্যাগুলোর কথা, কৃষি-বাজারের অবস্থা আর ব্যবস্থার কথা। তার জন্যে হয়তো বা সুযোগই নাই তেমন কোনো। তাই-ই হয়তো কৃষকদের বোবা জনতা মাঝে মাঝে পথে ভিড় করে জমে, রাস্তা রাঙিয়ে এঁকে যায় তাদের বুকের কথাগুলো। তার উপর ধুলোর স্তর জমে উঠে। তারা হয়তো খবর রাখে না— সে কথাগুলোর পাঠোদ্ধার হয় কিনা।

প্রথাগত কৃষিব্যবস্থা আর বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলাতে পারে না। অথচ বহু চেষ্টাতেও চাষি নতুন ব্যবস্থার নাগাল ধরতে পারে না। অল্প ছড়ানো জমি, মান-সম্পন্ন ভেজাল-মুক্ত কৃষি-উপকরণের (সব আগে বীজ) অভাব, সে সবের আকাশ-ছোঁয়া দাম, কৃষি-বাজারের অনিয়ম ও আচমকা আচরণ, কৃষক ও কর্তৃপক্ষের বেড়ে-চলা ব্যবধান— এসব অনেক কারণেই একক সাধ্যসীমায় কৃষকরা কিছুতেই সাবেক সামন্ত প্রথার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারপর— কৃষিকাজ, অন্য কাজ— সব মিলিয়ে বেসামাল কাজের চাপ। আবাদের সবটা আর তারা ধরে রাখতে পারে না, কিছুটা হাত-ফসকিয়ে বেরিয়ে যায় ভাগচাষে। বিশেষ ক'রে যারা নিজে কৃষিকাজ করে না, ভাঙন তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি। প্রায় সবটাই তারা ফিরিয়ে দিতে চায় ভাগে বা 'চুক্তি' চাষে। ভাগ বা 'চুক্তি' চাষের পালে হাওয়া লাগে।*

'চুক্তি-চাষ' একটা নতুন ব্যবস্থা। তাতে-ফসল হোক-না হোক 'চুক্তি'টা দিতেই হবে। এ শর্তে খেতমজুররাই এগিয়ে আসে বেশির ভাগ। কৃষিকাজ অধঃক্ষিপ্ত হয় দারিদ্র্যের সঙ্কটে, বিশেষ ভাবে এক অপরিণামী কৃষিকাজে। 'আমূল ভূমিসংস্কার' সমূলে পাতালে তলিয়ে যায়। 'সভ্যতা-র' অগোচরে মাটি থেকে দুটি হাত যেন 'ফরিয়াদ' তুলে ধরে উপরের দিকে। সন্তান-স্নেহে ফসল ফলিয়ে 'পাওনাদার'-দের হিসাব মিটিয়ে কৃষক ভাণ্ডারে এসে হিসাব কষে চলে। তবে, এখনও কি 'জমিদার' আছে!

রাষ্ট্র-প্রদর্শিত পথ ধরে এসে, (যেখানে 'মুনাফা'-ই শেষকথা) কৃষক কানাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলে। 'আধুনিক ব্যবস্থা' কৃষিকে গতিদানের বদলে যেন অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারপর একজন দিনমজুর খেতের কাজে যদি পায় ১০০ টাকা, তো অন্যকাজে পায় ৩০০ টাকা— দেখা দেয় মজুরের সমস্যা। কৃষিতে এই ধারা-পরম্পরা কৃষিকাজকে এক 'নতুন দরজা'র (?) চৌকাঠে এনে হাজির করে। সেই পুরনো হিসাবটা, 'কৃষি আর যন্ত্রশিল্প একে অন্যের সহায়', সপাটে ঘুরে যায় ১৮০ ডিগ্রী।

দেশে একটি স্বতন্ত্র উৎপাদক শ্রেণী কৃষক-সম্প্রদায় বিবেচিত হয় নানা গোষ্ঠী, নানা বর্ণ-ধর্মের অংশ হিসাবে, এমন কি নারী-পুরুষে পৃথক হিসাবে! রাষ্ট্রের পোষকতা নিতে স্তরে স্তরে, ভাগে বিভাগে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় প্রজাসাধারণ। তখন ভাগ-বণ্টনের ব্যাপারটাই বিবেচনার জন্য সামনে দাঁড়ায়। আর তা নিয়ে 'বিরোধ' এবং 'মীমাংসা'-র যাঁরা নায়ক, তাঁরাই হন দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এবং তার 'সূত্র' নিরূপণ করাই হয় তখন দেশের প্রধান কাজ— যা হয়তো জাগায় আর একটা প্ররোচনা যার আড়ালে সম্ভবত পুষ্ট হয় অন্য এক পরিকল্পনা। (এই 'পোষকতার সূত্রে'-ই, আর 'শাসনে বেত্রে' বোধহয় তাঁরা দেশের সম্মুখে রাশ টানতে চান।) এ সবের মাঝে মুছে যায় জনসংখ্যার মূল বৃহত্তম অংশ 'কৃষক', এবং তাদের

* একটা সময়ে 'বর্গাচাষ'-এর (কৃষিজমিতে দ্বিস্তরীয় স্বত্ব প্রদান) প্রভাবে 'বর্গা'-র ভয়ে জমি-মালিকরা যথাসম্ভব 'নিজ-আবাদ'-এ দাঁড়িয়েছিল। তারপর 'হাওয়া' বদল হয়; ভাগচাষ ফিরে আসে নতুন নামে, নতুন শর্তে। যা কিনা সামন্ত ব্যবস্থার প্রধান এবং প্রত্যক্ষ রূপ।

মৌলিক সমস্যা। মুছে যায় তাদের শ্রেণীসত্তা। এবং বিকল্পে 'উর্ধ্বলোকে' জেগে উঠে নানা রঙের মায়াবী স্বপ্ন-সম্ভাবনা। 'স্বপ্ন' বুঝি ধরা দেয় 'সম্ভাবনা'-য়!!

জ্বলজ্যান্ত জীবন বোধহয় কথায় দেখাবার নয়। বর্তমান অভিযোগ আর প্রচারের পাল্টাপাল্টি ঝাপ্‌টায়, আর নানা দাবির দাপটে সবকিছু ওলোট্-পালট্। এসবের মধ্যে চাষিদের কণ্ঠ চাপা পড়ে বহু নিচে মাটির বুকে, হাটে-মাঠের কলবরে। প্রচারের ধাঁধাঁলো চমকে চোখ-কান ধন্ধ। এখানে চাষিদের অবস্থা এবং সমস্যাগুলো তারা কীভাবে বুঝতে পারে! চাষিদের জীবন আর জীবিকার কাহিনি তাই থেকে যায় অভিশপ্ত এক পর্দার আড়ালেই। মাঝে মাঝে তাদের রক্তের ফিন্‌কি ঝলক্ দিয়ে আঁধারে ঢেকে যায়। আমাদের সমাজ, 'সভ্যতা'— জয়যাত্রার দৃপ্ত পথে— তার অল্পই খবর রাখে। 'শিক্ষা' 'সভ্যতা' 'বিজ্ঞান' 'মানবাধিকার'... এইসব উজ্জ্বল বর্ণময় শব্দগুলো চাষিদের চোখে নিতান্তই ফাঁকা ফিকে দেখায়। প্রকৃতির অঙ্কচারী নিরক্ষর চাষিরা বুঝি বিধিলিপি পড়তে পারে।

চাষিদের কথা চাষিদেরই ভাষায়— 'চাষিদের কেউ নাই'। কোনো দুর্দশাতেই সংসারে তারা কোনো সহায় দেখে না। সামনের কালে চাষিদের 'চাষি' হিসাবে টিকে থাকার জায়গাটা যেন আস্তে আস্তে খাটো হয়ে আসে। কৃষক-সাধারণ নিক্ষিপ্ত হয় 'সভ্যতা'র গহ্বরে, 'সভ্যতা' এগিয়ে চলে মত্ত ছন্দে (পদক্ষেপের বেগভারে বুঝি বা ভিৎ-পাথরে ফাটল ধরে)।

বিগত শতক— মাটির ডাকে সাড়া দিতে, মাটির দিকে কান পেতে— উত্তরকালের প্রতি যে আহ্বান রেখে গিয়েছে সেই গভীর আহ্বান এযুগের অন্দরে তেমন কোনো জায়গা করে নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। মাটির সঙ্গে তার দূরত্বটা বরং আরও একটু বেড়েই গিয়েছে। 'সভ্য' আর 'কৃষক' শব্দ দুটোর মূলে কি কোথাও কি একটা বিরোধ আছে?

বংশ বংশ ধ'রে জমানো জীবন থেকে কৃষক-মজুররা এক 'গূঢ় তত্ত্ব' লাভ করে। যার কাছে মানুষ অসহায়, যার সহায় ছাড়া মানুষ বাঁচে না— এমন এক 'শেষ কর্তা'র সন্ধান পায়। 'সে' দয়াল ভয়াল একই সঙ্গে। তাদের জীবনে সুখ-দুঃখ, বাঁচা-মরা, সব কিছুই 'তার হাতে'। 'সে' সব-এর একমাত্র বিধানকর্তা, সব শেষ দণ্ডদাতা। অন্য-হাতে হার মানতে, কি ভাগ্য তুলে দিতে, তারা প্রাণ থাকতে রাজী নয়। 'মালিক' বলে তারা সেই 'একজন'-কেই জানে। উদ্যত ঘাতকের সামনে হাঁটু গেড়ে সে 'তার'-ই সহায় যাচ্ঞা করে। 'তার'ই প্রেমে তার চোখে জল ঝরে। 'সে' যে সুখে দুঃখে জীবনে মরণে একমাত্র 'চিরসাথী'! (তার বিশ্বাসের পাশে বুঝি 'ভক্ত আস্তিক'-এর বিশ্বাসও ম্লান হয়ে আসে!) 'চরম অবিচার'-এর মধ্যেও তারা জানে— 'একদিন বিচার হবেই'। আর বড় কোনো প্রশ্ন তারা হাতে নেয় না— সব 'সে'-ই জানে।

সব-রকমে 'শিক্ষা' দিয়ে, পড়িয়ে-শুনিয়ে, একবার যদি তাদের জীবন-অবলম্বন এই শেষ-বিশ্বাসটা ভেঙে দেওয়া যায়!

এক শেষ-বিশ্বাস থেকে কৃষিকাজকে তারা অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছে, যা 'ক্ষতি' হলেও করতে হবে। তারা দেখে যে, কৃষিকাজ তাদের নিজেদেরও আহারের আধার, আর— "না হ'লে মানুষ খাবে কী! দুনিয়াটা চলবে কিভাবে!" কাজেই 'এটা তারই বিধান'। তাই কৃষিকাজের এহেন হাল দেখে এটা তারা কিছুতেই ভেবে পায় না যে— 'দেশে এই 'সহজ কথা'-টা কি কেউ ভাবে না?'

সেই মাটির সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগে কোথাও একটা টান পড়ে। এধারে মাটির জন্য কৃষক জনতার অফুরান পিপাসা। এ যে 'খুদার মাটি'! এ তো তাদেরই! মাঠ আর জল এখনো তাদের প্রধান আশ্রয়। এখন সমস্যা দেশের অগণিত কৃষক-জনতা নিয়ে। রাষ্ট্রে সমাজে সঙ্কট ঘন হতে থাকে। দেশের আকাশে অব্যক্ত চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

কৃষকরা তাদের পক্ষে সব ভার 'মহাকাল'-এর হাতেই একরকম ছেড়ে দেয়, সব পথ খোলা রেখে—

ভালো মন্দ জানো তুমি   শেষ বিচারের কাজী।
সবই তোমার খেলা দয়াল, তোমার খেলায় রাজি।।

ভারতীয় কৃষির আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র

গুরুপ্রসাদ কর

গত ১৫ বছরে ভারতে আড়াই লক্ষেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। তথ্য বলছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সরকারি কৃষি নীতির পরিবর্তন, একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ ও তার সাথে ভারতীয় কৃষিতে প্রাধান্যকারী বিভিন্ন শক্তির সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ কৃষকদের পক্ষে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করে সেটাই এই আত্মহত্যার বস্তুগত ভিত্তি। কিন্তু এসব সত্তেও ভারত সরকার আরো জোরের সাথে সেই উদারনীতির পথেই হাঁটতে চাইছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো একবার ভারতীয় সমাজের চরিত্র, বিশেষত কৃষি ব্যবস্থার চরিত্র ঠিক কী ধরনের, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় সমাজকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে যদিও আধা-সামন্ততন্ত্র বলতে সবাই একই অর্থ করেন না। কেউ যেমন আধা-সামন্ততন্ত্র বলতে একটি পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অবশেষকে বোঝান, কেউ আবার সেটাকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় অনুন্নত দেশের একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করেন। প্রসঙ্গত নকশালবাড়ী আন্দোলনের পরে ১৯৬৯ সালে নবগঠিত পার্টি সিপিআই(এমএল) ভারতীয় সমাজকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক হিসাবে চিহ্নিত করে এবং কৃষি বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশও এই বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিতর্ক চালিয়েছেন। তবে সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে কমিউনিস্টদের আগ্রহের মূল কারণ সমাজ বিপ্লবের দিশা তৈরি করা অর্থাৎ সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী বা শ্রেণীগুলিকে উৎখাত করবার কর্মসূচি ঠিক করা।

এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক নেই যে আমাদের দেশে নানাভাবে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রয়েছে আবার তার পাশাপাশি পুঁজিবাদী সম্পর্কেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে সেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে যে বিভিন্ন মতামত আছে তাকে মূলগতভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়।

১) সমাজে সামন্ত সম্পর্ক বজায়ে থাকলেও অর্থনৈতিক বিকাশের আপন ধারায় বা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে তা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এর অনিবার্য ফল হিসাবেই বুর্জোয়া সম্পর্ক ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। তথাপি সমাজবিপ্লবের কিছু গণতান্ত্রিক দায়িত্ব থাকতে পারে কিন্তু তা গৌণ।

২) বাণিজ্যিকীকরণ, পুঁজির অনুপ্রবেশ ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সামন্তবাদী কৃষি ব্যবস্থাটি আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তার সাথে সাথে একটি বিকৃত পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির ক্রমিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে এই সমাজটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয়ে উঠবে না। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়েই আধা সামন্ততন্ত্র ও এই বিকৃত পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা সম্ভব।

প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ বিকাশের পথ

সমাজ বিকাশের একটি পর্যায়ে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে জন্ম নেওয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক সহ অন্যান্য মেহনতি মানুষ সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যার পরিণতিতে ইউরোপের অনেক দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে পরিমাণে সর্বহারাশ্রেণীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী সংস্কারমুখী হয়ে ওঠে। সেই উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদের সাথে আপস করতে শুরু করে। তাই বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের একটি পর্যায় থেকেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে যায় শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণীর এই রাজনৈতিক আপসের সহযোগী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও ছিল সংস্কারমূলক। অর্থাৎ ভূস্বামী সামন্তদের উচ্ছেদ করে জমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বদলে উপর থেকে সংস্কারের মাধ্যমে ভূস্বামী সামন্তদের ক্রমাগত বুর্জোয়া উৎপাদনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়। ফলে যে দেশগুলিতে বুর্জোয়া বিকাশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত দেরিতে, যেমন জার্মানি, রাশিয়া, সেখানে এই সংস্কার প্রক্রিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। বুর্জোয়া সংস্কারের এই পথকে প্রাশিয়ান পথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে এইসব দেশগুলিতে সামন্তবাদের ক্ষয়ের মাত্রা দুর্বল থাকলেও শেষপর্যন্ত তার গতি ছিল পুঁজিবাদের দিকেই।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তর ও প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক

আজকের দুনিয়া পরিচালনা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকেই উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুক্ত প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া স্তরে প্রবেশ করে। লেনিন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের এই

স্তরকে সাম্রাজ্যবাদী স্তর হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং দেখান যে পুঁজিবাদ এই স্তরে আন্তর্জাতিকভাবেই ক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করে। পুঁজিবাদের এই স্তরে অন্যান্য বিভিন্ন বৈশিষ্টের সাথে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অনুন্নত দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি রপ্তানি। উদ্বৃত্ত পুঁজি হল উন্নত পুঁজিবাদী দেশের সেই পুঁজি যাকে দেশীয় সীমানার মধ্যে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এই উদ্বৃত্ত পুঁজির জন্ম হয় অর্থনৈতিক নিয়মেই। অর্থাৎ নিরন্তর পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে চল-পুঁজির তুলনায় স্থির-পুঁজির ক্রমাগত বৃদ্ধি মুনাফার হারের পতন ঘটায় এবং যার প্রকাশ ঘটে থাকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে তাল রেখে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও কৃষির উন্নতি না ঘটার মধ্যে দিয়ে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজির অস্তিত্ব কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, তা বিকাশের একটি আবশ্যিক ফলশ্রুতি। এই উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের স্থায়ী সমাধান হল এমন অঞ্চলের অস্তিত্ব থাকা যেখানে পুঁজিবাদের সেভাবে বিকাশ ঘটে নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে নিজেদের দেশের উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে সস্তার কাঁচামাল, শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে অতি-মুনাফা করে মুনাফার হারের পতন ঠেকাতে চেষ্টা করে।

এই সাম্রাজ্যবাদী পর্বে অনুন্নত দেশগুলিতে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভূমিকা কী হতে পারে? এটা ঠিক যে সামন্তবাদী সম্পর্ক সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ক্ষয়ের যুগে রয়েছে। তাই মনে হতে পারে যে কালের নিয়মেই সামন্ততন্ত্র ক্রমাগত ক্ষয় পেতে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে এমন চিন্তাভাবনা করা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার যে পুঁজিবাদও তার ক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করেছে। অনুন্নত বিশ্বে উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগ সহ বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্রিয়াকলাপ যদি মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ঘটায় তাহলে বলতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে এখনও পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষিত হয় নি। বলা বাহুল্য এ ধারণা হবে লেনিনীয় নীতির বিরোধী। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেছেন বস্তুগতভাবে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র কেবল তার নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক ভাবেও তার সমস্ত কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অনুন্নত দেশের সেইসব প্রাক-পুঁজিবাদী শ্রেণীর সাথেই জোট গড়ে তোলে যাদের শ্রেণীস্বার্থ স্বাধীন পুঁজিবাদ গড়ে তোলার বিপক্ষে কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এই দেশগুলি থেকে অতি-মুনাফা লুণ্ঠন করে দেশগুলির পুঁজির সঞ্চয়নে বাধা দেয় যা দেশটির পশ্চাদপদ সম্পর্কটিকে পুনরুৎপাদিত করে চলে। এই প্রক্রিয়াতেই উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের পশ্চাদভূমি নিশ্চিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও ভারতীয় কৃষি

দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ভারত ছিল উপনিবেশ। একথা আমরা সবাই জানি যে ব্রিটিশরা কেবল এদেশের সামন্ত অর্থনীতি ভাঙতে চায়নি কেবল তাই নয়, অত্যধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য পুরনো সামন্ত ব্যবস্থার বদলে এক সাংঘাতিক শোষণমূলক সামন্ত ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং তার সাথে সাথে দেশীয় শিল্প বিকাশের যে ধারা বজায় ছিল তাকেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। অপরদিকে বাণিজ্যিক ফসলের চাষ, মুদ্রায় রাজস্ব ইত্যাদির কারণে উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য কিছু মাত্রায় পণ্য হয়ে উঠতে থাকে ও এইভাবে কৃষিতে পুঁজিরও অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরনো সামন্ত ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে এবং তা ক্রমে ক্রমে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আমরা যারা ভারতীয় অর্থনীতিকে বুঝতে চাই ও তা নিয়ে সৃষ্টিশীল বিতর্ক চালাতে চাই তাদের মধ্যে খুব কম অংশই মনে করে যে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর ভারত সরকার এমন কোন নীতি গ্রহণ করেছে যাতে দেশের কৃষি ব্যবস্থাটি পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারে। জমিদার প্রথা বিলোপ আইন ও সরকারি ভূমি সংস্কার যে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি।

যাই হোক সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত যে দুটি বিষয় ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে ক্রমাগত নাড়া দিয়ে চলেছে তা হলো:

১) বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম যার মূল লক্ষ্য হলো আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো।

২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরিচালিত কর্মসূচি।

আমরা সবাই জানি যে ব্রিটিশ আমল থেকেই বৃহৎ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণী বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামকে ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে, ব্রিটিশের দমন নীতিকে সমর্থন করেছে এবং নিজেরা শাসক হয়ে আজও সেই দমন নীতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। ভারতের কোণে কোণে চলমান বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম ক্রমাগত সামন্ত ব্যবস্থাকে আঘাত করে চললেও তা জয়যুক্ত হয়ে গুণগতভাবে ভারতের কৃষি সম্পর্কের বদল ঘটানোর সুযোগ পায় নি।

অপরদিকে ১৯৪৭-পরবর্তী পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরিচালিত যেসব উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি সরকারি মদতে রূপায়িত হয়েছে তার মূল দুটি হলো:

ক) সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি;

খ) কাঠামোগত সংস্কার তথা বিশ্বায়নের কর্মসূচি যা বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের চাপে ও পরবর্তীতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে।

সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি রূপায়ণ হবার পর থেকে ভারতের কৃষিতে কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। মার্কিন নির্দেশিত এই কর্মসূচির ফল হিসাবে প্রথমে ভারতের কিছু অঞ্চলে বাজারের জন্য বড় আকারে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে এই বিষয়গুলি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। সবুজ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে মূলত তার ভিত্তিতেই বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ গত শতাব্দীর সেই সত্তরের দশক থেকেই ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে মূলগতভাবে পুঁজিবাদী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। বুদ্ধিজীবীদের অপর একটি অংশ দেখাতে চেষ্টা করে যে ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিলেও উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে ভারতীয় কৃষি তার আধা-সামন্ততান্ত্রিক স্তরেই থেকে গেছে।

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু তার ক্ষয়ের স্তরে রয়েছে তাই সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত কর্মসূচি অনুন্নত দেশে উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে না কেবল তাই নয়, বরং সেই ধরনের বিকাশকে ধ্বংস করতে সর্বব্যাপী উদ্যোগ নেয়। যদিও এই তাত্ত্বিক যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু কেবলমাত্র এই তাত্ত্বিক যুক্তি কাঠামোয় আপনা আপনি ভারতের সমাজটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক এটা প্রমাণ হয়ে যাবে না। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট একটি দেশে সেখানকার শ্রেণীসংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের সাথে তার সম্পর্ক ও কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া ভারসাম্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ব্যতিক্রম হিসাবেও সেখানকার উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তাত্ত্বিকভাবে বাতিল করা যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষিতে বিরাজমান শ্রেণী সম্পর্কের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই উৎপাদন ব্যবস্থাটি চিহ্নিত করতে হবে। ভারতীয় কৃষির চরিত্র যে আধা সামন্ততান্ত্রিক সেটা বোঝার জন্য প্রথমে আমরা যারা এই মতের বিপক্ষে তাদের যুক্তিগুলি দেখে নেব।

ভারতীয় কৃষিকে পুঁজিবাদী প্রমাণ করবার উদ্যোগ

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা প্রমাণ করবার জন্য সেই ১৯৮১ সালেই গেল ওমভেট দাবি করেন: ক) গ্রামীণ জনগণের ৬৫ শতাংশ প্রলেতারিয়েত কিংবা প্রলেতারিয়েত হবার পথে, খ) শস্যের একাংশ বাজারে বিক্রি হয়, গ) কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে, বিশেষত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে, ঘ) যারা কৃষিজ যন্ত্রপাতি কেনে তারা তা শ্রমশক্তি শোষণের কাজেই ব্যবহার করে, ঙ) সমস্ত ধরনের বর্গাপ্রথা কমছে, যেটুকু টিকে আছে তাতেও পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রধান্য।

অতি সম্প্রতি অমিত বাসোলে ও দীপঙ্কর বসু ইপিডাবলু, এপ্রিল ৯, ২০১১-তে প্রকাশিত তাদের একটি প্রবন্ধে নতুনভাবে এই একই দাবি করেছেন। আমাদের আলোচনায় দীপঙ্কর বসু ও Aspect of India's Economy, No. 46, 2008-এর দেওয়া তথ্যই বিবেচনা করব, যার অনেকটাই সাম্প্রতিককালের এনএসএসও-র সংগৃহীত তথ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

তবে লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী মাথায় রাখতে হবে যে কোন সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিমূর্তভাবে ভোগ, বণ্টন, পুঁজির বিনিয়োগ, বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা সঠিক নয়। এগুলি কোন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের সূচক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিজে থেকেই উৎপাদন সম্পর্ককে নির্ধারণ করে দেয় না। রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল বিষয় উৎপাদন নয়, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী মানুষদের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করা। তাই কৃষিতে সার, কীটনাশক, উচ্চফলনশীল বীজ, ফসলের বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদির বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিজে থেকেই কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় না, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীগুলির কার্যকলাপ ও তাদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতেই উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ধারণ করা দরকার।

যাইহোক তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যে বৈশিষ্টগুলি দেখা যায় তা হল:

১) প্রজাকৃষককে উচ্ছেদ করে ভূস্বামীরা কিছু পরিমাণে উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে কৃষিকাজ সংগঠিত করে।

২) ক্ষুদ্র বর্গাচাষের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই ব্যবস্থা ক্রমহ্রাসমান।

৩) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোতের প্রাধান্য এবং জমি খণ্ডীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি।

৪) ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভূস্বামী চাষ ও ভারতে শিল্পের বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক

ভারতের উপরের দিকের ৯.৫ শতাংশ পরিবারের হাতে মোট কৃষি জমির ৫৬.৬ শতাংশের মালিকানা রয়েছে আর বাকি ৯০.৫ শতাংশের হাতে আছে ৪৩.৪ শতাংশ জমি। এই হিসেব থেকেই বলা যায় এখনও ভূস্বামীদের হাতে বড় আকারে জমি আছে। তবে একথাও ঠিক যে ১৯৫৫ সালে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ আইন প্রণয়ন হবার পর সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রজাকৃষককে উচ্ছেদ করে ভূস্বামীরা কিছু পরিমাণে নিজেদের জমি ও কৃষি উপকরণ ব্যবহারে করে কৃষিকাজ সংগঠিত করে। ঐতিহাসিকভাবে এই ধরনের চাষের চরিত্র পুঁজিবাদী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। কিন্তু তাই বলে সময়ের সাথে সেটা অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী চাষ হয়ে ওঠে না। এই ধরনের চাষের বিষয়টি নিয়ে মার্কস নিজে অলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের সাধারণ গতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এই ধরনের ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী

বাজার ব্যবস্থার যা বৈশিষ্ট্য তথা (অনপেক্ষ ও পার্থক্যমূলক) ভূমি খাজনা ও মুনাফার পার্থক্য তৈরি হয় না। বাইরে থেকে দেখতে পুঁজিবাদী হলেও গোটা উদ্বৃত্ত শ্রম আসলে ভূমি খাজনার রূপ পায় এবং এই ভূমি খাজনার সীমা পুঁজিবাদী বাজারের নিয়ম দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই এই উদ্বৃত্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ধৃত্তমূল্য নয়, ভূস্বামী ও উৎপাদকদের সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নির্ধারিত সামন্ততান্ত্রিক ভূমিখাজনা। এই ধরনের শোষনের ভিত্তি পুঁজি নয়, জমির মালিকানা। কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিবাদী হয়ে ওঠার আবশ্যিক দুটি শর্ত হলো:

ক) জমি থেকে উৎখাত হওয়া প্রজাকৃষকের কৃষি সর্বহারায় রূপান্তরিত হওয়া, ও

খ) অর্জিত উদ্বৃত্তমূল্যের পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্ধিত পুনরুৎপাদন।

যে দেশগুলিতে প্রাক সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিপ্লবী বা সংস্কারের পথে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে তার মূল গতিটা এসেছে শিল্পের বিকাশের উপর দাঁড়িয়ে, যে শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়, তেমনি একইসাথে কৃষিতে উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থান করে এবং সামগ্রিকভাবে ক্রয়ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। এই ধরনের বিকাশই শেষ পর্যন্ত কৃষিতেও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে শিল্পের এই ধরনের বিকাশের অনুপস্থিতিতে এই দুটি শর্তই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে ভারতে শিল্পের বিকাশের এই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বাধায়। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা তার পরোক্ষ সহায়তায় যে শিল্পের বিকাশ ঘটে তা শুরুতেই ছিল একচেটিয়া চরিত্রের, আমদানিকৃত উৎপাদন-যন্ত্রের সাথে এই অঞ্চলের উৎপাদন বিকাশের কোন সম্পর্ক ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবার মধ্যে দিয়ে মুনাফা অর্জনই ছিল এই পুঁজির চরিত্র। আর তাই এই ধরনের শিল্প কৃষিতে উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, উল্টে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পের ধ্বংসসাধন করে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ আরো বাড়িয়ে দেয়। প্রসঙ্গত ভারতে এখনও বৃহৎ একচেটিয়া মালিকানায় সংগঠিত শিল্প মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ২% পূরন করে। অসংগঠিত ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান করেও ব্যাঙ্ক ঋণ সহ নানা সরকারি বৈষম্যের শিকার হয়ে সরল পণ্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার বেড়ে ওঠার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় উৎখাত হওয়া কৃষক সর্বহারার বদলে রূপান্তরিত হয় নিঃস্ব কৃষকে, যাদের যত না আগ্রহ থাকে মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে তার চেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে জমির মালিকানা পাবার। ব্যাপক নিঃস্ব কৃষকের অস্তিত্ব আবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করে এবং ঐতিহাসিকভাবেই ভারতীয় জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা এই বস্তুগত ভিত্তিকে আরোও শক্তিশালী করে। আবার ভূস্বামীরা আবদ্ধ শ্রমিক কাজে লাগিয়ে যে উদ্বৃত্ত শোষণ করে তার বড় অংশটিই অনুৎপাদক তথা মহাজনি ও বাণিজ্যিক খাতে চলে যায় কারণ এই আবহে সেটাই লাভজনক। এইভাবে উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগের প্রক্রিয়াটিও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আরোও উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড় জোত বলতে বড়ই বোঝায়, বড় জোত বলতে উন্নত কৃষি উপকরণের সাহায্যে অধিক নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ বোঝায় না। ছোট জোতের তুলনায় বড় জোতে একর প্রতি উৎপাদনও কম। তাই এই ধরনের বড় জোতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে একথা বলা যায় না। অপরদিকে পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে লেনিন যা বলেছিলেন অর্থাৎ পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনের (যেখানে প্রতিযোগিতায় না পেরে ছোট জোতের মালিক জমি বেচে দিয়ে সর্বহারায় রূপান্তরিত হয়) মধ্যে দিয়ে বড় জোত গড়ে ওঠা ও তার মধ্যে দিয়ে বিচ্ছিন্ন শ্রমের সামাজিকীকরণ ঘটার কোন প্রক্রিয়াও চালু নেই।

ক্ষুদ্র জোত, মজুরি শ্রম ও পুঁজিবাদী সম্পর্ক

এনএসএসও-র তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬০-৬১ সালে গ্রামীণ জনগণের ১১.৭% ছিল ভূমিহীন আর ২০০২-২০০৩ সালে ভূমিহীন হচ্ছে ১০% । এখানে ভূমিহীন ধরা হয়েছে তাদের যাদের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে। আমরা যদি এক একরের নীচের জমির মালিককে ভূমিহীন ধরি তাহলে এ তথ্য অনুযায়ী ভূমিহীন হবে ৬২%, যেখানে ১৯৬০-৬১ সালে এরকম ভূমিহীন ছিল ৪৪% । আর যাদের জমির পরিমাণ ২.৫ একরের নীচে সেই প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীনদের একসাথে ধরলে এদের সংখ্যা ১৯৬১ সালে গ্রামীণ জনগণের ৬৬% থেকে বেড়ে ২০০৩ সালে ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে।

অপরপক্ষে যাদের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশি সেই জমিদার ও বড় কৃষকের সংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ১২% এবং ২০০২-০৩ সালে তা নেমে ৩.৬%-এ পৌঁছেছে। যাদের জমি ২.৫ থেকে ১০ একরের মধ্যে সেই ছোট ও মধ্য কৃষকের অনুপাত ১৯৬১ সালে ২৩% থেকে ২০০৩ সালে সামান্য কমে ১৭%-এ এসেছে। জমির পরিমাণ দিয়ে দেখলে ভূস্বামী ও বড় চাষিদের হাতে থাকা মোট জমির পরিমাণ কমেছে, মধ্য চাষির সামান্য বেড়েছে, ক্ষুদ্র কৃষকের বেশ বেড়েছে, প্রান্তিক কৃষকেরও সামান্য বেড়েছে।

ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক, ছোট ও মধ্য কৃষক এদের একসাথে ধরলে এরাই গ্রামীণ জনগণের ৯৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী এদের বড় অংশই পুঁজি সঞ্চয় তো দূরের কথা, কৃষি থেকে যে আয় হয় তাতে পরিবারের সারা বছরের খরচই ওঠে না। তাই পরিবার চালানোর জন্য কেবল ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষকই নয়, অনেক অঞ্চলে এমনকি মধ্য কৃষকদেরও মজুর হিসাবে খাটতে হয়। আবার বছরের অন্য সময়ে এমনকি ছোট ও

প্রান্তিক কৃষকও চাষের কাজে মজুরি-শ্রম নিয়োগ করে। এই বিবরণ হাজির করে দীপঙ্কর বসু এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কৃষিতে মজুরি-শ্রম শোষণই প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আদায়ের প্রধান ধরনে পরিণত হয়েছে, যা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য।

তবে মজুরি-শ্রম সম্পর্কে দীপঙ্কর বসুদের এই সাধারণীকরণ অতিরঞ্জিত হতে পারে, কারণ সাম্প্রতিককালের এনএসএসও-র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মোট কৃষি শ্রমে মজুরি-শ্রমের পরিমাণ কমেছে এবং পারিবারিক শ্রমের পরিমাণ বেড়েছে। বর্তমানে মোট কৃষি শ্রমে পারিবারিক শ্রমের পরিমাণ ৬৪.২%, যা ১৯৮৩ সালের তুলনায় বেশি। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে কৃষি ব্যবসার গতিপ্রকৃতি সাংঘাতিকভাবে কৃষকের বিরুদ্ধে যাওয়ায় কৃষকেরা কৃষির খরচ কমাতে মজুরি-শ্রমের চেয়ে পারিবারিক শ্রমের অনুপাত বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো যে কৃষিতে যুক্ত অধিকাংশ মানুষের জীবিকা যদি মজুরি-শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহলে উৎপাদনে যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় তা কোন্ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে যায়? এই উদ্বৃত্তমূল্য কীভাবে পুনর্বিনিয়োজিত হয়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার ঘটায়? এই সব অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দীপঙ্কর বসুরা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি যদিও এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্কের অন্যতম প্রধান দিকটি লুকিয়ে আছে।

গ্রামীণ কোন্ শ্রেণীগুলির হাতে উদ্বৃত্ত জমা হয়

যাদের জমি ১০ একরের উপরে সেইসব ভূস্বামী ও ধনী চাষির হাতে কৃষিতে উদ্বৃত্তমূল্যের একটি অংশ জমা হয় ও এই উদ্বৃত্ত মূল্যের কিছু অংশের পুনর্বিনিয়োগ ঘটে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে এই উদ্বৃত্তের মাত্র ১০.৫% উৎপাদন খাতে ব্যয়িত হয়। যদিও পাঞ্জাবে উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি (২৩%)।

আমরা আগেই দেখেছি ভারতের কৃষিতে ক্ষুদ্র জোতেরই প্রাধান্য এবং এই ধরনের জোতের মালিক কৃষিকাজ চালিয়ে সারা বৎসরের পরিবারের ভরণপোষণের খরচ অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু, কৃষি উপকরণের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ও সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ ও ভর্তুকি কমে যাচ্ছে। ছোট ও প্রান্তিক চাষীর ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবেই সমাজে খোরাকি ঋণ ও উৎপাদন খরচের জন্য ঋণ দেবার মতো সুদখোর মহাজন ও ফসল ব্যবসায়ী শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে। আর এর সামগ্রিক ফল হল ফসলের দামের মরসুমি ওঠানামা এবং তা নিশ্চিতভাবেই কৃষকের স্বার্থের বিপক্ষে যায়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকের তৈরি উদ্বৃত্ত কৃষকের হাতে থাকে না; তা এই সম্পর্কগুলির মধ্যে দিয়ে মহাজন ও ফসল ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। আবার উৎপাদন ক্ষেত্রে এই উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ খুবই কম থাকে কারণ মহাজনি ব্যবসা ও ফসল নিয়ে ব্যবসা লাভজনক হওয়াতে সেই অনুৎপাদক খাতেই এই উদ্বৃত্ত আবার বিনিয়োজিত হয়। আর এই ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক বজার রাখতে মহাজনি ও বাণিজ্যিক পুঁজি ক্ষুদ্র উৎপাদকের পণ্যের উপরই দখল রাখে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নয়। তাই এই প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র কৃষককে ক্ষুদ্র উৎপাদক হিসাবেই রেখে দেয়, সেখান থেকে উদ্বৃত্তকে শুষে নেয়, কিন্তু পুঁজি হিসাবে তার শ্রমশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে তাকে সর্বহারায় রূপান্তরিত করে না, আবার অন্যদিকে তাকে পুঁজিপতি হয়ে ওঠারও সুযোগ দেয় না। পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের পর্যায়ে থাকলে এর উল্টোটা ঘটে অর্থাৎ উৎপাদনে নিয়োজিত পুঁজি বাণিজ্যিক পুঁজি ও মহাজনি পুঁজিকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং কালক্রমে মহাজনি পুঁজি বিলুপ্ত হয়।

এবার তথ্যের বিষয়ে আসা যাক। গড়ে কৃষকদের মোট আয় তাদের পরিবার চালাতে যা খরচ তার ৩৫% পূরণ করে। কৃষিকাজ, মজুরি, অন্যান্য কাজ, পশুপালন ও অকৃষি ব্যবসা থেকে গড়ে একটি কৃষক পরিবারের মাসিক আয় হয় ২১১৫ টাকা। আর পরিবারের ভরনপোষণের জন্য মাসিক খরচ হলো ২৭৭০ টাকা, যেখানে এই খরচ দৈনিক মাথাপিছু ১৭ টাকা ধরা হয়েছে।

এনএসএসও-র তথ্য অনুযায়ী ৪৯% কৃষক পরিবারই ঋণগ্রস্ত। যদিও এই হিসাবটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ বেশি। এবারে দেখা যাক ঋণ শোধের জন্য সুদ বাবদ কত অর্থ ব্যয় হয়? তথ্য অনুযায়ী গড়ে একটি কৃষক পরিবারের ঋণের পরিমাণ ১২,৫৮৫ টাকা, যার ৩০.৯% আসে গ্রামীণ মহাজন ও ফসল ব্যবসায়ীদের থেকে আর বাকীটা প্রাতিষ্ঠানিক সহ অন্যান্য উৎস থেকে। ফলে মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ ১১২,০০০ কোটি টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদ ১২-১৫ এবং ১৫-২০%-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ৪০% অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ৩০% বা তার উপরে। তাই কোন বিতর্কে না গিয়ে সুদের হার যদি ২৪% ধরে নেওয়া হয় তাহলে সুদ মেটাতে কৃষকদের খরচ হয় ২০, ০০০ কোটি টাকা।

Aspect of India's Economy, No. 46-এর মতে কিন্তু এই হিসাব যথেষ্ট নয়। কেন? এনএসএসও-র তথ্য অনুযায়ী অধিকাংশ কৃষক চাষ করে তাদের পরিবারের সারা বছরের খরচ তুলতে পারে না। অপরপক্ষে চাষের খরচের খুব সামান্য অংশই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ হিসাবে পাওয়া যায় (২০০৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ছিল কৃষি খরচের ১৫%)। তাই ঋণের ব্যাপারে এনএসএসও-র তথ্য মেনে নিলে কীভাবে আদৌ কৃষিকার্য সম্পন্ন হয় সেটাই ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ আরো বেশি হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক

ঋণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দ্বিগুণ ধরে নিলে দেখা যায় যে ২০০৬ সালে মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ ১৯৫,০০০ কোটি টাকা আর গড় সুদ ২১% ধরলে মোট সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১,০০০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত ২০০২-০৩ সালের কথা ধরলে কৃষিতে মোট বিনিয়োগ ছিল ৩৩, ৫০৮ কোটি টাকা আর নীট বিনিয়োগ ছিল ৭,৭৮৪ কোটি টাকা। এই হিসাব থেকেই বোঝা যায় কীভাবে কৃষির উদ্বৃত্তের বিরাট অংশ মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হয়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজির সঞ্চয় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণের ফলে ক্ষুদ্র জোতে এমনকি উন্নত বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে নিবিড় চাষ করেও বর্ধিত পুরুৎপাদনের শর্তটি ব্যাহত হয় এবং ব্যবস্থাটি সরল পণ্যোৎপাদনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তাই ভারতীয় কৃষিতে নীচে থেকে পুঁজিবাদ বিকাশের সম্ভাবনাটিও নষ্ট হয়।

ফসলের দামের মরসুমি ওঠানামা প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ফসল

অনেকে কৃষি পণ্যের বাজারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ দেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই কৃষকদের জোর করে বাজারের জন্য উৎপাদন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, কিন্তু এতে তারা না করতে পারে পুঁজির সঞ্চয়, না পারে কৃষি থেকে বেরিয়ে আসতে।

এখন প্রশ্ন হল যে ফসলের দামের এই মরসুমি ওঠানামা কেন থাকে? অনেকে ফসলের দামের এই ওঠানামাকে একটি সাধারণ নিয়মের স্তরে নামিয়ে আনেন আর না হলে চাহিদা যোগানের বিষয় হিসাবে দেখেন। এই বিষয়ের সাথে উৎপাদন সম্পর্কের যে গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা প্রায়শই ভেবে দেখা হয় না। এমনটা ভাবার কারণ নেই যে ফসল ওঠার পর বাজারে ফসলের যোগান বৃদ্ধির জন্যই দাম কমে যায়। অন্যান্য জায়গার তুলনায় পাঞ্জাবে ফসল ওঠার পর গমের যোগান অনেক বেশি হয়, কিন্তু সেখানে গমের দামের বিরাট হেরফের হয় না। আসলে সামন্ত সম্পর্কের প্রাধান্যে বাজার এমনভাবেই বিকাশিত হয়েছে যে সেই বাজারের উপর কৃষকের তথা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফসলের দামের এই মরসুমি ওঠানামার অস্তিত্ব রয়েছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। ব্রিটিশ প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থা ও নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা সমাজে মহাজনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। মহাজনি ঋণের অস্তিত্ব ও সেই ঋণ শোধের শর্ত এমনভাবেই নির্ধারিত হয় যে কৃষক ফসল উঠবার পরই সেই ফসল বেচতে বাধ্য হয়। আর এরই সুযোগ নেয় খোদ মহাজন বা ফসল ব্যবসায়ীরা। পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হলেও আজও গ্রামীণ এই উৎপাদন সম্পর্ক অটুট রয়ে গেছে। নতুন পরিস্থিতিতে অনেক জায়গায় সার, কীটনাশক বা অন্যান্য কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ীরা মহাজনি কারবার ও ফসল ব্যবসায়ীদের ভূমিকা পালন করছে।

প্রসঙ্গত এই বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে চিন্তার দৈন্যতা প্রকাশ পেয়েছে 'মার্ক্সিস্ট ইনটেলেকশন, ২০১০' পত্রিকায় শুভ্রকেতন বসুর লেখায়। তিনি এই কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ীদের ঋণদায়ী ভূমিকাকে প্রাক-পুঁজিবাদী মনে করেন না কারণ এরা যে কোন ধরনের উচ্চ কৃষি প্রযুক্তির ব্যবসা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো যে তাদের উচ্চ কৃষিপ্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসা কি কৃষিতে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের শর্ত পালন করতে সহায়তা করে? তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা এখানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণী হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করছি। তবে উৎপাদন-সম্পর্ক বোঝার বিষয়ে তাঁর যে গুরুতর বিভ্রান্তি আছে তা বোঝা যায় যখন তিনি এমনকি খোরাকি ঋণের অস্তিত্বকেও প্রাক-পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে মানতে চান নি।

বাণিজ্যিকীকরণের বৃদ্ধি ও মহাজনি ব্যবসার সম্পর্ক

মনে রাখা দরকার যে ভারতের কৃষিতে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা ও মহাজনি ব্যবসার প্রাধান্য বরাবরই রয়েছে। তাই এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠবে যে কেন গত ১৫ বছরেই এত বেশি সংখ্যক কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আসলে এই ঘটনার সাথে নয়া উদার অর্থনীতির মদতে কৃষির অধিকতর বাণিজ্যিকীকরণ ও তার সাথে গ্রামীণ সমাজে বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মনে রাখা দরকার যে এই অস্বাভাবিক ঋণগ্রস্থতার সাথে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতার সম্পর্ক নেই, যে সব অঞ্চলে এই বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে সবচেয়ে বেশি (৬৯-৮১%) সেইসব অঞ্চলে আত্মহত্যার ঘটনাও বেশি ঘটেছে। ফলে কৃষিতে উন্নত পাঞ্জাব, হরিয়ানায় যেমন বিপুল সংখ্যায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তেমনি কৃষিতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকেও এটা ঘটেছে। এটা আসলে দেখিয়ে দেয় যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ক্রমবর্ধিত অনুপ্রবেশ এবং মহাজনি ও ফসল ব্যবসায়ীদের শোষণ পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে নি, বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদের মিলিত আক্রমণ কৃষককে আরোও দুর্বিসহ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে।

এবার এই মহাজনি কারবারের প্রতি আমাদের শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমত উদারীকরণের জমানায় সরকারি বিনিয়োগের ও কৃষি ঋণ ক্রমাগত কমে আসছে যা মহাজনি ব্যবসাকে নতুনভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে। বিপুল সংখ্যক কৃষক আত্মহত্যার পরিপ্রক্ষিতে ২০০৭ সালে এস সি গুপ্তের নেতৃত্বে গ্রামীণ ঋণ সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি টেকনিকাল গ্রুপ তৈরি করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া তাদের রিপোর্টে ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ মহাজনদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রস্তাব রেখে বলা হয়, "ব্যাঙ্কের উপর খুব বেশি দায়িত্ব দেবার কোন

উদ্যোগ নিলে তাতে হিতে বিপরীত হবে, কারণ এতে মহাজন শ্রেণী আদৌ সন্তুষ্ট হবে না''। আসলে সরকারের লক্ষ্য মহাজনি ব্যবসার উচ্ছেদ নয়, ব্যাঙ্কের কারবারের সাথে জুড়ে নিয়ে মহাজনদের একটু আধুনিকীকরণ ঘটানো যাতে এই ব্যবসায়ে ভবিষ্যত দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মহাজনদের প্রভাব বিস্তৃত জালকে ব্যবহার করে নিজেরাও মুনাফা লুঠতে পারে।

কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক

উদার অর্থনীতির ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যেই কৃষিতে দেশি বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে পুর্বাঞ্চলে এই অনুপ্রবেশ বড় আকারে ঘটতে চলেছে। কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ কি কৃষির বন্ধ্যা দশা কাটাতে সাহায্য করবে? উদ্বৃত্ত পুনর্বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে কি পুঁজির সঞ্চয় ও ক্ষেতমজুর-ভূমিহীন কৃষকদের সর্বহারাকরণ ঘটবে?

দেখা যাক কর্পোরেট পুঁজি ঠিক কী কী করছে বা করতে চাইছে:

১) উৎপাদনের দায়িত্ব কৃষকের উপর রেখে তারা চুক্তি চাষ করতে চাইছে। চুক্তি চাষের ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ফসল নির্বাচন, বাণিজ্যকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের হাতে রাখবে।

২) বৃহৎ বীজ কোম্পানিগুলি এখানে জিন প্রযুক্তিজাত বীজের প্রচলনের মধ্যে দিয়ে বীজের উপর দখলদারি কায়েম করবে।

৩) ওয়ালমার্টের মত বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি ফসল নিয়ে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে।

৪) এই লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, জলসেচ ইত্যাদি বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেট পুঁজির হাতে চলে যাবে। ব্যবস্থাটি তারা এমনভাবেই গড়ে নেবে যাতে কৃষি ব্যবস্থাটির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় ও সেই নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে একদল সুশিক্ষিত বাহিনীও থাকে। প্রথমত যেখানে ইতিমধ্যেই উন্নত পরিকাঠামো আছে সেইসব অঞ্চলেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে এই ধরনের কর্মসূচীর মধ্যে কোনভাবেই কৃষিতে বিরাজমান আধা-সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের উপাদান নেই কারণ তা নিজে থেকেই ভূমি সংস্কার করবে না, নিঃস্ব কৃষকের সর্বহারাকরণও ঘটবে না, আর লুণ্ঠিত উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগ তো দূরের কথা কৃষির উদ্বৃত্তের আরোও বড় অংশ বিদেশে পাড়ি দেবে। উৎপাদন সম্পর্কের বিচারে এর মধ্যে দিয়ে যা হতে পারে তা হল বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির কার্যকলাপের সাথে ইতিমধ্যেই কৃষিতে বিরাজমান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তথা বড় ভূস্বামী, সুদখোর-মহাজন, ফসল ও কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ীদের সাথে সাথে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিও নিজেদের যুক্ত করে নেবে এবং নিশ্চিতভাবেই নতুন কাঠামোতে কর্পোরেট পুঁজির সেবায় অংশগ্রহণ করে তাদের অতি-মুনাফা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিজেদেরও সমৃদ্ধ করবে।

পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি অগ্রগতির সূচক নয়

প্রথমত মনে রাখা দরকার যে এই উদারীকরণের জমানায় কৃষি জমির পরিমাণ কমছে, দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে, অতীতে ভোজ্যতেল সহ বেশ কিছু খাদ্যপণ্যে স্বনির্ভর থাকলেও এখন আমদানি করতে হচ্ছে, দেশের মানুষের গড় খাদ্যগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, গণবণ্টন ব্যবস্থা ও সরকার কর্তৃক ফসল কেনার ব্যবস্থা প্রায় ভাঙনের মুখে, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

অপরদিকে ১৯৮৩ থেকে ২০০৪-০৫ এই সময়কালে মোট জাতীয় আয়ে ও মোট শ্রমে কৃষির অংশ কমেছে, দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পের অংশ অতি সামান্য বেড়েছে, কিন্তু পরিষেবা ক্ষেত্রটির এতটাই বৃদ্ধি ঘটেছে (জাতীয় আয়ের ৫৩% ও কর্মে নিযুক্ত মানুষের ২৪ %) যে তা উন্নত দেশগুলির সাথে তুলনীয়। পরিষেবা ক্ষেত্রটি বলতে বোঝায় বাণিজ্য, হোটেল, পরিবহন, যোগাযোগ, আর্থিক কারবার, বিমা, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিষেবা ইত্যাদি। আসলে এই ক্ষেত্রই দুটি মেরুতে বিভক্ত। তার এক মেরুতে আছে আর্থিক কারবার, বিমা, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত এবং এই ক্ষেত্রগুলি মিলিতভাবে মাত্র ২ % কর্মসংস্থান করে কিন্তু জাতীয় আয়ে তার অংশ ১৩.৫%। এগুলি পরিষেবা রপ্তানি ও উচ্চমধ্যবিত্তদের বাজারের সাথে সম্পর্কিত, দেশের ব্যাপক অংশের মানুষের জীবনযাত্রার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অন্য মেরুতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে তার বেশির ভাগটাই কর্মসংস্থান বলা যায় না। ফুটপাথ ট্রেন বাসে লক্ষ লক্ষ হকার, অসংখ্য ক্ষুদে দোকানদার, গৃহ পরিচারিকারা কোনভাবে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে আর তাই একে কখনই কৃষির বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আর আমাদের মত পিছিয়ে পড়া দেশে যেখানে ৭৭% মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকার নীচে সেখানে পরিষেবা ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্তের অর্থ হল ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের ভোগ ও পরজীবী কার্যকলাপের বৃদ্ধি।

আধাসামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে উচ্ছেদ না করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

ঐতিহাসিকভাবেই একথা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও অনুন্নত দেশে তার দেশীয় দোসর একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির ভূমিকা কখনই অনুন্নত দেশের উৎপাদন সম্পর্ক বদলের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না, কিছু সংস্কার চালিয়ে তার রূপ বদলে নেয় মাত্র। একভাবে তাকে দুর্বল করলে অন্যভাবে তার পুনরুজ্জীবন ঘটায়। ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

উপরন্তু ভারতের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাড়তি শক্তি যোগায়। বিশেষত আদিবাসী মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন বিভাগের কর্মী-আমলাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজেই সামন্তশক্তির ভূমিকা পালন করে। দেশে কোন বড় প্রকল্প গড়ার অর্থই হল বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই আদিবাসী মানুষের উচ্ছেদ, যার মাধ্যমে বাড়ে নিঃস্ব কৃষকের ভীড়। উদারীকরণের জমানায় এই প্রবণতা আরো বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ভারতে একচেটিয়া মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বাহক হিসাবে কাজ করে এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক এই ধরনের শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

রাজনীতি হল অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঘনীভূত রূপ আর তাই এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগের সবচেয়ে ঘনীভূত প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক অঙিনাতে। যে কোনও ধরনের বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার আন্দোলনের উপর ভারতীয় রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইদানীং কালে কর্পোরেট পুঁজির হাত থেকে জল, জঙ্গল, জমি রক্ষার আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রশক্তি যে অভিনব উপায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে তা যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদত পাচ্ছে তাতে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, দেশীয় বৃহৎ পুঁজি ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক একেবারে জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জনগণের এই শত্রুদের চিনে নিতে অসুবিধা হবে না।

সাহায্যকারী গ্রন্থসমূহ

১) 'আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি', রতন খাসনবিশ, পিপলস বুক সোসাইটি

২) 'ভারতের আধা সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন', র‍্যাডিক্যাল পাবলিকেশন, ২০০৭

ভারতীয় কৃষির চরিত্র— পুঁজিবাদী, না প্রাক্-পুঁজিবাদী

চিত্তরঞ্জন দাশ

ভারতীয় কৃষির বর্তমান চরিত্র পুঁজিবাদী, না আধা-সামন্ততান্ত্রিক? গত শতাব্দীর সত্তর-আশির দশকে এই প্রশ্নের একদফা সমাধান হয়েছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় সূচিত বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আবার ফিরে এসেছে সেই প্রশ্ন, নতুন করে যার সমাধান হওয়া দরকার।

ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশ এমনই এক বাস্তব ঘটনা যাকে অস্বীকার করা যায় না। আর, এর প্রারম্ভকাল বিশ্বায়ন নয়, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন। গুপ্তযুগে (খ্রীস্টীয় চতুর্থ-ষষ্ঠ শতক) প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বিকশিত, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-সমাজের ওপরে মুঘল শাসন (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত এক জবরদস্ত রাষ্ট্রীয় সামন্তপ্রথার প্রবর্তন করেছিল। সনাতন ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো জমির ওপর সাধারণ অধিকার এবং কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ। আর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার দ্বারা কৃষি উৎপাদনের প্রচলিত ধারার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট তার মৌলিক চরিত্র (ধ্রুপদী সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পশ্চিম ইউরোপে যেখানে বিদ্যমান ছিল ভূস্বামীদের বিশাল বিশাল কৃষিখামার আর ভূমিদাসপ্রথা)। রাজস্বগ্রাহী জায়গিরপ্রথা দ্বারা মুঘলরা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের ওপর যে রাষ্ট্রীয় সামন্ততন্ত্র চাপিয়েছিল তা সনাতন ভারতীয় গ্রাম-সমাজের স্বাভাবিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সমাজকে ভাঙতে পারেনি। সামন্ততন্ত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করার এবং দেশীয় বুর্জোয়ারা একটি শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হওয়ার আগেই এদেশে কায়েম হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন। রাজস্বের স্থায়িত্ব ও হারবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্রিটিশরা এক নয়া ভূমি-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করল, জমির ওপর কৃষকের চিরাচরিত অধিকারের অবসান ঘটিয়ে জমিকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অর্থাৎ পণ্যে রূপান্তরিত করল। ফলস্বরূপ, কৃষির বাণিজ্যিকরণ বর্ধিত হল, প্রসারিত হল পণ্য-মুদ্রা সম্পর্কের পরিধি। রেলপথ ও সেচব্যবস্থার প্রচলন, নতুন নতুন ফসল উৎপাদন এবং কিছু সংখ্যক শিল্প স্থাপনের দরুন সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন এলো যা কিনা পুঁজির অনুপ্রবেশের সূচক। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী সময়ে আরও তীব্র, আরও ব্যাপক হয়েছে পুঁজির এই অনুপ্রবেশ, যদিও স্থান ও কাল ভেদে তা অসম ছিল।

প্রশ্ন হলো, ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় কৃষির যে পুঁজিবাদী বিকাশের সূচনা ঘটেছিল, সেটা কি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন।

ব্রিটিশরা এদেশে ভূমি-রাজস্বের যে নয়া বন্দোবস্ত চালু করেছিল, (বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত), তা থেকে জন্ম নিল এক নয়া জমিদারশ্রেণী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালেই পুরানো জমিদারদের একটা বড়ো অংশ তাদের জমিদারি হারিয়েছিল। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা হারিয়েছিল তাদের স্বাধীন চরিত্র। সেই ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ পরে জমিদারি কিনে 'অনুপস্থিত জমিদার' (absentee land-lord) হিসেবে শহরে বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটাতে লাগল, অন্যেরা ব্রিটিশ পণ্য ও ব্রিটিশ শিল্পে কাঁচামালের আমদানি-রফতানির ব্যবসা মারফত হয়ে উঠল ব্রিটিশ পুঁজির মুৎসুদ্দি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাষ্ট্র ও কৃষকদের অন্তর্বর্তী স্থানে জমিদার ও বিভিন্ন স্তরের পত্তনিদারদের নিয়ে একটি শক্তিশালী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ভারতের যেসব অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল না, সেখানেও অনুরূপ জমিদারশ্রেণী জন্ম নিয়েছিল (রায়তওয়ারি, মহলওয়ারি বা ভাইয়াচারি বন্দোবস্ত মারফত), যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রামীণ মহাজন ও কোম্পানির বানিয়া, আর তহশিলদার প্রভৃতি কর্মচারীরাই। এক কথায়, ব্রিটিশদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট নয়া জমিদারি-প্রথাই ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সামাজিক ভিত্তি। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক পুঁজি ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতকে ইংলন্ডের শিল্পপণ্যের বাজার আর শিল্পের কাঁচামালের জোগানদার অর্থাৎ "ইংলন্ডের কৃষিখামার" বানানোর তাগিদে তা দেশীয় শিল্পের স্বাধীন বিকাশকে রুদ্ধ ও ধ্বংস করেছিল, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ না-ঘটিয়ে সামন্ততন্ত্রকে পুনর্গঠিত ও রক্ষা করেছিল, সর্বস্তরে স্থাপন করেছিল পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের আপস ও পারস্পরিক সহাবস্থান। ঔপনিবেশিক পুঁজির সংস্পর্শে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই যে রূপান্তর সেটাই, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায়, আধা-সামন্ততন্ত্র।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, মোটামুটি গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জমিদারি অধিগ্রহণ মারফত খাজনাভোগী মধ্যশ্রেণীর বিলোপ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু তাতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জমিদাররা জোতদারে পরিণত হয়েছে। আর, জমিদারদের মতো অনপেক্ষ (absolute) ভূমি-খাজনা হিসেবে কৃষকের উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করে জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতরাষ্ট্রই। মধ্যস্বত্ব বজায় রাখার জন্য রাজকোষে যে বিপুল লোকসান হত

তা এড়াতে, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ প্রশমিত করতে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জমিদার-বিরোধী ধনী ও মাঝারি চাষিদের যুদ্ধকালীন সমর্থন হাসিল করতে ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনই জমিদারি-প্রথা বিলোপের সুপারিশ রেখেছিল। তার আগে, ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনেও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের (অর্থাৎ মুৎসুদ্দি বানিয়াদের) শাসনক্ষমতায় অংশীদার করার পাশাপাশি জমিদারি-প্রথা পরিবর্তন করার বিধানও ছিল। যাই হোক, কৃষির বাণিজ্যিকরণ ও বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় যাদের উৎপত্তি ঘটেছিল সেই জোতদাররা জমিদারি-প্রথা পরিবর্তন মারফত গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতায়িত হলো এবং কালক্রমে সামন্তী শোষণ-শাসনের অন্যতম প্রতিভূ হয়ে উঠল তারাই।

কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান আধা-সামন্ততন্ত্রের পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের আপস ও সহাবস্থানের ফলস্বরূপ দেখা যায়, একজন ভূস্বামী অনাবদ্ধ (free) শ্রমিক নিয়োগ করে, উন্নত উৎপাদনশৈলী প্রয়োগ করে, জমি ভাড়া বা লিজ দেবার সময়ে বিভেদাত্মক (differential) খাজনার সম্ভাবনা যাচাই করে— যেগুলি সবই পুঁজিবাদী লক্ষণ। আবার, ওই একই ভূস্বামী আবদ্ধ (un-free) শ্রমিক নিয়োগ করে, মহাজনি ও বাণিজ্যিক পুঁজি মারফত ছোটচাষিকে শোষণ করে, সনাতনী উৎপাদনশৈলীও রক্ষা করে, এমন কি, ছোট বর্গাদারকে জমি বর্গায় দিয়েও চাষ করে— যেগুলি প্রাক-পুঁজিবাদী লক্ষণ। কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন, নগদ অর্থে মজুরি প্রদান, কৃষিজাত দ্রব্যের (খাদ্যশস্য সহ) পণ্যরূপ ধারণ এবং কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশের পরিচায়ক। কৃষিজমির কেন্দ্রীভবন, ভূমিহীন কৃষক অর্থাৎ খেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ভূস্বামীর মালিকানা প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলি আপাতদৃষ্টিতে কৃষির পুঁজিবাদী চরিত্রেরই অনুষঙ্গ ঠিকই, কিন্তু ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে এগুলি কি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের উপাদান? পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবন ঘটে বৃহদাকার উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণসমূহের নিবিড়তর প্রয়োগ এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মে বৃহৎজোতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মারফত। অন্যদিকে জবরদস্তি, প্রথামাফিক কিংবা বাজার-বহির্ভূত কোন নিয়মে জমি অধিগ্রহণ দ্বারাই ঘটে প্রাক-পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবন। কৃষি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া, উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাওয়া (ফসলের অভাবি বিক্রি সহ), মহাজনি শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততার দরুন ক্রমশ জমি থেকে উচ্ছেদ হয় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক। ফলস্বরূপ, অল্পসংখ্যক গ্রামীণ পরিবারের হাতে বেশিরভাগ জমির মালিকানার হস্তান্তর অর্থাৎ কৃষিজমির মেরুকরণ ঘটে আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটতে থাকে ভূমিহীন ও নিঃস্ব কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি। যেহেতু বিকল্প নিয়োগের সম্ভাবনা প্রায় নেই আর অধিকাংশ জমির মালিকানা ভূস্বামীদের করায়ত্ত, এইসব ভূমিহীন কৃষকদের তাই আবদ্ধ কৃষি-শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা সহজ। স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক ছাড়াও, খেতমজুরদের একটা বড়ো অংশই স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন চুক্তিতে আবদ্ধ শ্রমিক, যা ভারতীয় কৃষির আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি। জমিদারি অধিগ্রহণ ও সিলিং আইন প্রবর্তন প্রজা-কৃষকের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজ্যে রাজ্যে যে ভূস্বামী চাষের প্রচলন ঘটিয়েছে তাতে আধা-সামন্ততন্ত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ হিসেবে আমরা দেখি, জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানা বাবদ ভূস্বামী এমন একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী যার সুবাদে সে বাণিজ্যিক ও মহাজনি পুঁজি (আবদ্ধ শ্রমিকের দাদন সহ) হিসেবে উদ্বৃত্তের উৎপাদন-বিমুখ ব্যবহার ঘটায়, আবার উদ্বৃত্তের একটা অংশ দিয়ে কৃষি-যন্ত্রপাতি, সেচ, সার ও অনাবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ মারফত কৃষিতে জোগান দেয় স্থির ও পরিবর্তনীয় পুঁজি।

সবুজ বিপ্লব-অধ্যুষিত পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু অগ্রণী জেলার কৃষি উৎপাদনের ওপর গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল দু'টি ভিন্ন চিত্র। পাঞ্জাবে জোতের আকার যত বড়ো, কৃষি-যন্ত্রপাতি, সেচ, সার ইত্যাদির মতো অ-শ্রম উপকরণের (material inputs) ব্যবহার তত বেশি এবং বড়ো জোতগুলি ছোট জোতের তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল।[১] বড়ো জোতে পুঁজিবাদী রূপান্তরের পরিচিত ছক এটাই। হরিয়ানায় কিন্তু জোতের আকার যত বড়ো একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ এবং অ-শ্রম উপকরণের ব্যবহার তত কম।[২] হরিয়ানার সবুজ বিপ্লব-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ক্ষুদ্রতর জোতগুলির অধিকতর উৎপাদনশীলতার কারণ হিসেবে সমীক্ষকেরা পারিবারিক শ্রমের (family labour) অধিকতর ব্যবহার এবং চাষের অধিকতর নিবিড়তাকেই চিহ্নিত করেছেন,[৩] যা পুঁজিবাদী চাষের ওপর কৃষক চাষের (peasant farming) প্রাধান্যেরই অভিব্যক্তি। পুঁজিবাদী বিকাশের মাপকাঠিতে পাঞ্জাবের বড়ো জোতগুলিও কিন্তু সমসত্ত্ব ছিল না। পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে তিন ধরনের জোত গড়ে উঠেছিল—বিকাশমান, স্থানু ও ক্ষয়িষ্ণু। ট্রাক্টরের ব্যবহার, মজুর নিয়োগ, সেচের নিবিড়তা, চাষের নিবিড়তা এবং একর প্রতি মূলধন বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি সমস্ত সূচকেই স্থানু ও ক্ষয়িষ্ণু জোতের তুলনায় অগ্রণী ছিল বিকাশমান জোতগুলি।[৪] অর্থাৎ অন্যের জমি লিজ বা বন্ধক নিয়ে নিজেদের মালিকাধীন জোতের তুলনায় কর্ষিত জোতের আয়তন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে বিকাশমান জোতগুলি গড়ে উঠেছিল, সেই সময়ে তারা পুঁজিবাদী বর্ধিত পুনরুৎপাদনের শর্ত পালন করেছিল উদ্বৃত্তের একটা বড়ো অংশ কৃষিতে স্থির ও পরিবর্তনীয় পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ দ্বারা। এটা কিন্তু পাঞ্জাবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, দেশের সবুজ বিপ্লব-অধ্যুষিত এলাকাগুলির

সামগ্রিক চিত্র তো নয়ই। ভারতের প্রায় সর্বত্র জোতের গড় আয়তনের সঙ্গে শ্রমদিবস ব্যয়ের, অ-শ্রম উপকরণ ব্যবহারের এবং চাষের নিবিড়তার নেতিবাচক সম্পর্কই বিদ্যমান।[৫] ভারতবর্ষে, সত্যি বলতে কী, বৃহৎ-জোতে বৃহদাকার চাষের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রক্রিয়া ব্যতিক্রম হিসেবেই লক্ষণীয়। জোতের বিন্যাসে যে বৈষম্য রয়েছে তার উৎস পুঁজিবাদী পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া নয়, বরং প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কই।

লক্ষণীয় বিষয় হল, সবুজ বিপ্লবের নামে বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ, 'ঋণমেলা' ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে আধুনিক কৃষিপদ্ধতির ফায়দা কুড়িয়েছে প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জমিদার ও ধনীচাষিরা। রাষ্ট্রের অকৃপণ সহযোগিতায় তারা কৃষিতে যথেষ্ট পুঁজি ঢেলেছে, আর বিক্রির জন্য খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার বানিয়েছে। একই সময়ে তীব্র ও অমানবিক মহাজনি শোষণের খপ্পরে পড়ে জমি হারাতে বাধ্য হয়েছে এইসব এলাকার বহু দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্য কৃষক। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ এই দশ বছরে পাঞ্জাবে সমগ্র প্রান্তিক জোতের (এক হেক্টরের কম) ৬৯.৯ শতাংশ এবং ক্ষুদ্রজোতের (১-২ হেক্টর) ২৩.৩ শতাংশ বিলীন হয়েছে।[৬] সবুজ বিপ্লব-অধ্যুষিত অন্যান্য রাজ্যের চিত্রও মোটামুটি একই। আরও লক্ষণীয়, সবুজ বিপ্লবের 'বিপুল সাফল্য' সত্ত্বেও ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশের কৃষিতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মোটামুটি অপরিবর্তিতই ছিল। এই সময়সীমায় কৃষিজীবীদের মধ্যে 'নিজ-চাষে নিযুক্ত' কৃষকের অনুপাত কমেছে, তুলনায় বেশ বেড়েছে কৃষিমজুরের অনুপাত। 'নিজ-চাষে নিযুক্ত' কৃষকদের আয়ের পুরোটাই আবার প্রত্যক্ষ কৃষি উৎপাদন নয়, আয়ের একটা অংশ হল মুনাফা, খাজনা ও সুদ। অন্যদিকে, কৃষিমজুরের অনুপাত বাড়লেও কৃষি-আয়ে তাদের অংশ কিন্তু কমেছে। ১৯৭৯-৮০ সালে কৃষিতে কৃষিমজুরের আয় ছিল ২৮ শতাংশ, ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৯ শতাংশ।[৭] এক কথায়, পশ্চিমী অধিজাতিক বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি-সরঞ্জাম উৎপাদন কোম্পানির বাজার তৈরি আর ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের শিল্প প্রসারের খাতিরে বৃহৎ ভূস্বামীদের তোয়াজ করতে গিয়ে রাষ্ট্র সবুজ বিপ্লব-অধ্যুষিত এলাকার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষিদের একটা বড়ো অংশকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, অবশিষ্টাংশকে দাঁড় করিয়েছে আরও দারিদ্র ও দুর্দশার মুখোমুখি।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে সবুজ বিপ্লব কিছুটা সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রচলিত ভূমি-সম্পর্কের কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। আর, সেটা আনা তার উদ্দেশ্য ছিল না, সম্ভবও ছিল না।

পরবর্তীকালে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংকটের বোঝা বিশ্বের পশ্চাদপদ কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে চালান করার, অর্থাৎ এইসব দেশকে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের অর্থনৈতিক স্রোতে সরাসরি টেনে আনার সর্বাধুনিক বাহন হিসেবে হাজির হলো বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নকে স্বাগত জানাতে ১৯৯১ সালে ভারত সরকার গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলার সময়েই শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তির (GATT) অষ্টম রাউন্ডের চূড়ান্ত পর্যায়ে গৃহীত হয় ডাঙ্কেল-সাদারল্যান্ড চুক্তি। অন্য বহু বিষয়ের মধ্যে ওই চুক্তিতে অধিজাতিক কৃষি-রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী অনুমোদিত হয় ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য এবং উদ্ভিদ প্রজাতির নতুন নতুন উদ্ভাবনের নিছক প্রক্রিয়ার পেটেন্টই নয়, উৎপাদিত দ্রব্যের পেটেন্ট আর মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ। ১৯৯৪ সালে ভারত সহ ১১৫টি দেশ কর্তৃক চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে এই দেশগুলি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় নিয়ম-নীতির আওতায় এলো, সাথে সাথে পুরোপুরি উন্মুক্ত হল ভারত ও সমগোত্রীয় দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগে অধিজাতিক সংস্থাসমূহের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব কায়েমের পথ। বিশ্বায়নের দুই দশকে ভারতীয় কৃষির মৌলিক চরিত্রের কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে কিনা সেটাই বড়ো প্রশ্ন।

বিশ্বায়নের পরিবেশে ভারতীয় কৃষির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কৃষি-ভর্তুকির পর্যায়ক্রমিক অপসারণ এবং কর্পোরেট চুক্তি চাষের ঢালাও প্রবর্তন। সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি থেকে সরকারি ভর্তুকি ধাপে ধাপে কাটছাঁট হওয়ার পরিণামে কৃষি উৎপাদনে ব্যয় বাড়ছে, অথচ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দর সেই তুলনায় বাড়ছে না। কৃষকদের এই দূরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁদের চুক্তিচাষে প্রলুব্ধ করেছে বহু দেশি-বিদেশি কর্পোরেট এজেন্সি। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা ও সস্তাশ্রম যুক্ত করে বহুজাতিক ও তাদের ভারতীয় সহযোগী মিলিয়ে কয়েকশো সংস্থা পাঞ্জাব-হরিয়ানা ছাড়াও কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ সহ দেশের অধিকাংশ রাজ্যে চুক্তিচাষে নেমেছে। কর্পোরেট চুক্তিচাষ দ্বারা এইসব স্থানে চলছে বিভিন্ন ক্ষেতি ফসল ও সবজির উৎপাদন, জিনগতভাবে পরিবর্তিত (genetically modified) বীজের উৎপাদন। চুক্তিবদ্ধ কৃষক নিজের জমিতেই উৎপাদন করে। উৎপাদিত দ্রব্যের দাম, গুণমান ও পরিমাণ পূর্ব-নির্ধারিত। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, কোম্পানি কৃষককে যাবতীয় কৃষিসামগ্রী, পরামর্শ ও আর্থিক ঋণ জোগায়, ফসল উঠলে 'কোটা স্লিপ' মারফত চাষির থেকে তা সংগ্রহ করে, সুদসহ ঋণের টাকা আর ধারে জোগান-দেওয়া কৃষিসামগ্রী ও পরিষেবার (পরামর্শের) দাম মিটিয়ে নিয়ে চাষিকে এককালীন বা কয়েক কিস্তিতে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, চুক্তিচাষে উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই যেহেতু রফতানিযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য, তাই কোম্পানির মর্জি আর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা-জোগানের

দোলাচলে ভাসতে থাকে চুক্তিবদ্ধ কৃষকের লাভ-লোকসান। শুধু তাই নয়, উৎপাদনের যাবতীয় দায় যেহেতু কৃষকের নিজের, তাই অতিরিক্ত দাদন আর উৎপাদন সমস্যার কারণে যখন-তখন ঋণের ফাঁদে পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট কৃষক।

সরকারি ভর্তুকিতে কাটছাঁট এবং কর্পোরেট এজেন্সির হস্তক্ষেপের দরুন ভারতীয় কৃষিতে বিপ্রতীপ প্রজাস্বত্ব (reverse tenancy) ক্রমশই বাড়ছে। চাষের খরচ ও মহাজনের ঋণ বৃদ্ধির কারণে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষিদের একটা উল্লেখ্যযোগ্য অংশ তাদের জমি বড়োচাষিদের কাছে বিক্রি করে দিতে কিংবা বন্ধক বা লিজ রাখতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে পাঞ্জাবে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যার অনুপাত ছিল মোট জোতের ৪৪.৭৪ শতাংশ, আর ২০০০-০১ সালে সেটা কমে মাত্র ২৯.৬৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ এই দশ বছরে দু'লক্ষেরও বেশি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের বিলোপ ঘটেছে।[৮] পাঞ্জাব ছাড়াও হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটকের যেসব এলাকায় সবুজ বিপ্লব ও কর্পোরেট চুক্তিচাষের কল্যাণে কৃষির আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকরণ ঘটেছে, সেখানকার বিরাট সংখ্যক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি ক্রমশই ঋণগ্রস্থ হয়ে জমি খোয়াচ্ছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে বহু কৃষক পরিবার।

পাশাপাশি লক্ষণীয়, সবুজ বিপ্লব ও কর্পোরেট চুক্তিচাষের অঞ্চলগুলিতে কৃষির আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকরণের ধাক্কায় বিপ্রতীপ প্রজাস্বত্ব বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বৃহৎ-জোতের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রাক-পুঁজিবাদী উপাদান জোরালো থাকায় জমির পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবন সেই অনুপাতে ঘটছে না। আবার, বৃহৎ-জোতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক সংগ্রাম চলতে থাকায়, মালিকানাধীন জমির প্রাক-পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনও সবল নয়। পরন্তু জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটের ওপর ভারতে ক্ষুদ্রজোতের সংখ্যাই বাড়ছে, বাড়ছে জমির খণ্ডীভবন (fragmentation)। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯০-৯১ সালে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের সংখ্যা ছিল ভারতের মোট কর্ষিত জোতের ৭৮ শতাংশ এবং তাদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ ছিল মোট কর্ষিত জমির ৩২ শতাংশ। ২০০০-০১ সালে সেই সংখ্যা ও পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৮১ এবং ৩৯ শতাংশে দাঁড়ায় এবং এইভাবে খণ্ডীভবন ঘটতে থাকলে পরবর্তী দশ বছরে তা আরও বেড়ে যথাক্রমে ৮৩ এবং ৪৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে সেই সময়েই সমীক্ষকরা অনুমান করেন। এই সময়কালে বৃহৎ জোতের সংখ্যা ও গড় আয়তন কিন্তু ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে : ১৯৯০-৯১ সালে বৃহৎ-জোতের সংখ্যা ছিল ১৬.৫৪ লক্ষ এবং তাদের গড় আয়তন ছিল ১৭.৩৩ হেক্টর; ১৯৯৫-৯৬ নাগাদ তা যথাক্রমে ১৪.০৪ লক্ষ এবং ১৭.২১ হেক্টরে দাঁড়ায়।[৯] ফলস্বরূপ, নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় সারা ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন ছিল ১.৫৭ হেক্টর আর এই দশকের শেষে তা কমে হয় ১.৪৯ হেক্টর।[১০]

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের দুই দশকে কৃষি ভর্তুকিতে কাটছাঁট আর কর্পোরেট চুক্তিচাষ ছাড়াও, কৃষকের ঋণগ্রস্ততা ও ভূমিহীনতা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্যশস্য সহ বেশ কিছু কৃষিপণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করার সরকারি পলিসি আর শিল্পায়ন, নগরায়ণ, 'সেজ' ও পরিকাঠামো নির্মাণের নামে রাজ্যে রাজ্যে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণের দরুন। ১৯৯৩-৯৪ সালে সারাদেশে যেখানে মোট গ্রামীণ পরিবারের ৩০.৩৪ শতাংশ ছিল ভূমিহীন খেতমজুর পরিবার, ১৯৯৯-০০ সালে তা বেড়ে হলো ৩২.২৩ শতাংশ। ১৯৯২ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে দেশে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা ৭.৪৬ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১০.৭৪ কোটি।[১১] কিন্তু এই খেতমজুররা কি চরিত্রের দিক দিয়ে সমসত্ত্ব, অর্থাৎ এরা সবাই কি স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক? ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে দ্রুতহারে কমছে কৃষিতে বার্ষিক গড় শ্রমদিবস (১৯৯১ সালে দেশের কৃষিতে বার্ষিক গড় শ্রমদিবস ছিল ১০০, ২০০১ সালে তা কমে হয়েছে ৭৮, আর ২০০৫ সালে মাত্র ৭০[১২])। অর্থাৎ খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাড়ছে কৃষিতে উদ্বৃত্ত (অব্যবহৃত) শ্রমের পরিমাণ, যা কিনা খেতমজুরদের সমসত্ত্ব চরিত্র অর্জনের একটা বড়ো প্রতিবন্ধক। কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমের অস্তিত্ব ও তার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণেই স্বাধীন সর্বহারা অর্থাৎ অনাবদ্ধ মজুরি শ্রমিকের অস্তিত্বের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই বিপুল সংখ্যক স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন চুক্তিতে আবদ্ধ ('মাহিন্দার' থেকে 'বন্ধুয়া মজদুর' পর্যন্ত) কৃষিশ্রমিক। ভূস্বামীর সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিক প্রকৃতই একজন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত (pauperised) কৃষক। কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত হতে না পারায় তাকে জমিতেই আবদ্ধ হতে হয়। তার পেটে থাকে জমির ক্ষুধা, আর চোখে জমি ফিরে পাবার স্বপ্ন।

এক কথায়, বিশ্বায়নের পরিবেশে মূলত অপরিবর্তিতই থেকে গেছে ভারতীয় কৃষিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যেহেতু কৃষির স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতিবন্ধক এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সামাজিক ভিত্তি, তাকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ ভারতরাষ্ট্রই। বিভিন্ন সময়ে কৃষক বিদ্রোহের ধাক্কায় যখন তা কেঁপে উঠেছে, তাকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র একদিকে বলপ্রয়োগ মারফত বিদ্রোহ দমন করেছে, অন্যদিকে তার গায়ে সংস্কারের প্রলেপ লাগিয়ে জনগণের কাছ তাকে সহনীয় করে তোলার প্রয়াস করেছে। গত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ 'কৃষকের হাতে জমি'র যে প্রশ্ন তুলেছিল, ষাটের দশকে পুনরায় ও আরও জোরালো ভাষায় তাকে সামনে আনল নকশালবাড়ির

কৃষক অভ্যুত্থান। তেলেঙ্গানায় যেটা মোটামুটি আঞ্চলিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে জাতীয় স্তরে উত্থিত করে সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্নকে তার সঙ্গে যুক্ত করল নকশালবাড়ি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে অভ্যুত্থান দমন করার পাশাপাশি নকশালবাড়ির আগুনে সবুজ বিপ্লব যাতে 'লাল' হয়ে না যায় তার জন্য সেই সময়ে বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে ভূমিসংস্কারের একপ্রস্থ কর্মসূচি হাতে নিয়ে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার।

ভূমিসংস্কার আইনে ঘোষিত উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ছিল ৭২.৫৬ লক্ষ একর, যা দেশের মোট কৃষিজমির মাত্র ১.৮ শতাংশ। ঘোষিত উদ্বৃত্ত জমির সবটাই সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হল না। অধিগৃহীত জমির সবটাও আবার বণ্টিত হল না। ৭২.৫৬ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির মধ্যে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জমির পরিমাণ ৬২.৬৩ লক্ষ একর। আর, ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত জমির পরিমাণ ৪৮.৪৫ লক্ষ একর। বণ্টিত জমির একটা বড়ো অংশ আবার চাষযোগ্য ছিল না। জমিদারি অধিগ্রহণের সময়ে মালিকরা তাদের অনাবাদী বা পতিত জমিও সরকারে ন্যস্ত করেছিল। কিছু জমি আইনের বেড়াজালেও আটকে ছিল। যাই হোক, বণ্টিত জমির পরিমাণ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে যদি তালিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাকে বাদ দেওয়া হয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালায় বণ্টিত হয়েছে ৯.৭৬ লক্ষ একর অর্থাৎ সারাদেশে বন্টিত মোট কৃষিজমির ২০ শতাংশ, অথচ এই দুই রাজ্যে রয়েছে দেশের মোট কৃষিজমির মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষক অসন্তোষ প্রশমিত করতে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া আর যেসব রাজ্যে ভূমিসংস্কার ত্বরান্বিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে তাগাদা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। অথচ ওই তিন রাজ্যে মাত্র ১.৯০, ১.৮০ এবং ১.১৪ শতাংশ কৃষিজমি উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছে, আর বণ্টিত হয়েছে উদ্বৃত্ত কৃষিজমির যথাক্রমে ৬৩.৫১, ৫৬.৪২ এবং ৬৭.৮৬ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদ্বৃত্ত, অধিগৃহীত ও বণ্টিত জমির পরিমাণের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দেশের মধ্যে সবার ওপরে থাকলেও কৃষিজমির অংশ হিসেবে উদ্বৃত্ত ও বণ্টিত জমির পরিমাণ কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বাধিক— ২৫.১৫ এবং ২৪.৮২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বণ্টিত জমি ঘোষিত উদ্বৃত্ত জমির ৭২.২৮ শতাংশ আর জম্মু ও কাশ্মীরে তা ৯৮.৬৮ শতাংশ।[১৩] ভূমিসংস্কারের কল্যাণে যে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকেরা জমি পেয়েছেন, ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী সারাদেশে তাঁদের সংখ্যা ৪৬.২৮ লক্ষ[১৪]— দেশের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার মাত্র ০.৮ শতাংশ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের কারণেই উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারি ভূমিসংস্কার স্রেফ একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের কারণে এদেশে ভূমিসংস্কার যে একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে সেটা যেমন ঠিক, আবার প্রচলিত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোয় ভূমিসংস্কার কর্মসূচি যদি 'কৃষকের হাতে জমি' পর্যন্ত গড়ায় তাহলেও তা দ্বারা আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। সংস্কার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির চিত্র থেকে এটা আজ প্রমাণিত নয় কি?

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট শাসনে যে শ্রেণীটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছিল (নয়া-জোতদারশ্রেণী) মূলত তাদের হাত ধরেই কৃষিতে প্রাধান্য বজায় রেখেছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক, তাদের হাত ধরেই ভূমিহীন ও ভূমি-দরিদ্র কৃষকসহ গ্রামীণ শ্রমজীবীদের বৃহত্তর অংশের ওপর কিছুটা মার্জিত রূপে জাঁকিয়ে বসেছে অর্থনীতি-বহির্ভূত শোষণ ও উৎপীড়ন। জোতদারদের সিলিং-উদ্বৃত্ত জমির একটা বড়ো অংশ প্রথমে যুক্তফ্রন্ট ও পরে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ভূমিহীন ও ভূমি-দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, বর্গা নথিভুক্তকরণ এবং কৃষিজমির ক্রমাগত খণ্ডীভবনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষির অর্থনীতিই আজ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি। আশির দশকে রাজ্যের কৃষি-উৎপাদনে যে একটা 'উল্লম্ফন' ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল ভূমিসংস্কারে অনুপ্রাণিত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির পারিবারিক শ্রম-নির্ভর নিবিড় চাষের পদ্ধতির সঙ্গে সরকারি সহযোগিতালব্ধ সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির সদর্থক প্রয়োগ। কিন্তু তা কখনোই উচ্চ-মাত্রায় পণ্য উৎপাদন ও বর্ধিত পুনরুৎপাদন ভিত্তিক পুঁজিবাদী কৃষি-অর্থনীতি হয়ে উঠতে পারেনি, বরং বরাবরই থেকে গেছে সরল পুনরুৎপাদনের নিয়মে চালিত প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষি-অর্থনীতিই। কারণ, প্রথমত খুব অল্প ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও শ্রমশক্তি দুই-ই পণ্যরূপ ধারণ করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উৎপাদক নিজেই উৎপাদনের উপকরণের একটা অংশ ও শ্রমশক্তির মালিক। দ্বিতীয়ত, গ্রাম-বাঙলার প্রায় ৭২ শতাংশ উৎপাদকের চাষ-আবাদ করার পিছনে থাকে পারিবারিক ভরণ-পোষণের তাগিদ। একজন উৎপাদক-কৃষক তাঁর পরিবারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য বিভিন্ন দ্রব্য কিনতে নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করেন। মুদ্রার বিনিময়ে এক্ষেত্রে অর্জিত হয় পণ্যের শুধু ব্যবহার-মূল্যই। তৃতীয়ত, জোতদার, ধনীচাষি কিংবা বর্গায় দেওয়া জমির 'অনুপস্থিত' মালিক কৃষি থেকে যে উদ্বৃত্ত শোষণ করে তার একটা বড়ো অংশ তারা কৃষিপণ্য ও কৃষি-সরঞ্জামের ব্যবসায়ে কিংবা মহাজনি ও বন্ধকি কারবারে খাটায়, আর স্থির ও পরিবর্তনীয় পুঁজি হিসেবে কৃষিতে বিনিয়োগ করে কৃষি-উদ্বৃত্তের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই।

পশ্চিমবঙ্গে খেতমজুরদের একটা বড়ো অংশ আবদ্ধ কৃষিশ্রমিক, যারা সারা বছর কাজ পায় না, ন্যায্য মজুরিও পায়

না। পশ্চাদপদ জেলাগুলি থেকে কাজের সন্ধানে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা (migrant labours) প্রায়শই বহুফসলি জেলাগুলির জোতদার, ধনীচাষি ও ঠিকাদারদের প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার। বহুক্ষেত্রে মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আর জমির মালিকানাই হয়ে দাঁড়ায় শোষণের ভিত্তি। 'অপারেশন বর্গা'র কল্যাণে উৎপাদিত ফসলের অন্তত ২৫ শতাংশ পরজীবী শ্রেণী হিসেবে জোতদার ভোগ করে চলেছে উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয়ভার ও ঝুঁকির দায় ছাড়াই। ছোট বর্গাদাররা এখনও মালিকের সঙ্গে বাজার-বহির্ভূত সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা, সুদের কারবার ও জমির মালিকানা হাত-ধরাধরি করে চলায়, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এমন কি মাঝারি চাষিদের জীবনে ব্যবসায়ী ঋণের প্রতাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষি তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। মহাজনি ঋণের জাল বিস্তার, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির উৎপাদিত ফসলের অভাবি বিক্রি, ফসলের দামের মরসুমি হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি অ-সম বিনিময় সূত্র দ্বারা কৃষি উৎপাদনের ওপর নয় বরং কৃষিপণ্যের ওপর দখলদারি কায়েম রেখেছে বাণিজ্যিক পুঁজি, যা আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম অভিব্যক্তি।

তাছাড়া, আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় পুঁজির পরিবর্তে ভূসম্পত্তিই যেখানে উদ্বৃত্ত শোষণের ভিত্তি, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে নয়, বরং ভূমি-খাজনা থেকেই। সারাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও আবদ্ধ শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমজীবীদের দারিদ্রের সঙ্গে বর্ণব্যবস্থার ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভূস্বামী চাষে যে ধরনের শোষণ ব্যক্ত হয় তা সামন্ততান্ত্রিক ভূমিখাজনারই এক বিকশিত রূপ। বর্গাচাষে যেখানে শ্রমের (নিজের বা অন্যের) এবং প্রয়োজনীয় পুঁজির একাংশ কৃষক জোগান দেয় আর ভূস্বামী জোগান দেয় জমি ছাড়াও প্রয়োজনীয় পুঁজির বাকি অংশ (হাল-বলদ ইত্যাদি), সেখানে উৎপন্ন ফসলের যে অংশ ভূস্বামী আত্মসাৎ করে তা বিশুদ্ধ ভূমিখাজনা নয়, উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বাভাবিক রূপ ধরেও তা আসে না। এ ধরনের খাজনায় থাকে আগাম-দেওয়া পুঁজির ওপর সুদ ও জমির খাজনা হিসেবে কৃষকের উদ্বৃত্ত শ্রমের প্রায় সবটাই। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য ও তার উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত অনপেক্ষ ভূমিখাজনা প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষি-অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, যা কৃষিতে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের পরিপন্থী।

সরকারি ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সবচেয়ে সদর্থক প্রয়োগ ঘটেছিল যে রাজ্যে, সেই পশ্চিমবঙ্গেই ২০০১ সালে দেখা গেল ভূমিহীন হয়েছিল ১৩.২৩ শতাংশ পাট্টাদার আর ১৪.৩৭ শতাংশ নথিভুক্ত বর্গাদার।[১৫] ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জোতের বিন্যাস অর্থাৎ কৃষিজমির মালিকানায় বিদ্যমান বৈষম্য, কৃষিজীবীদের শ্রেণী-বিভাজন তথা গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনের চিত্র।[১৬]

রাষ্ট্রই যেহেতু ভারতীয় কৃষির আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক, পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের অপসারণ মারফত উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি ঘটানোর পূর্বশর্ত হিসেবে 'প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি'র সঙ্গে তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে 'কৃষক কমিটি'র হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন—তেলেঙ্গানার আঞ্চলিক স্তর থেকে নকশালবাড়ি যে প্রশ্নকে জাতীয় স্তরে করেছিল, সর্বভারতীয় পরিসরে ঘটিয়েছিল তার প্রসারণ।

তথ্যসূত্র

১) A Rudra and M Chattopadyaya, 'Size Productivity Revisited', *Economic & Political Weekly*, Sep. 25, 1976

২) *Changing Structure of Agricuture in Haryana (A Study of Impact of Green Revolution) 1969-70*, Dept. of Economics, Punjab University, Chandigarh, 1972

৩) R S Rao, *Towards Understanding Semi-Feudal Semi-Colonial Society (Studies in Political Economy)*, 1975, p. 20-21

৪) H S Shergill, 'Physiognomy and Anatomy of Growing, Decaying and Static Farms in Punjab', *Economic & Political Weekly*, March 30, 1985

৫) A Rudra and M Chattopadhyaya, op. cit

৬) S S Gil, 'Contradictions of Punjab Model of Growth and Search for an Alternative', *EPW*, October 19, 1988

৭) Abhijit Sen, *Shocks and Instabilities in a Agriculture Constrained Economy : India 1964-1985*

৮) Govt of Punjab, *Statistical Abstract of Punjab, 2004*, Economic Advisor of Govt. of Punjab, ESO, Publication No. 905, Chandigarh, Feb. 2005

৯) Sukhpal Singh, 'Changing Structure & Organisation of Agriculture and Small Farmers in India', *Rural Development & Social Change*, Vol. 1, NIRD, Discovery Publishing House, New Delhi, 2006, pgs. 381-407

১০) Govt. of Punjab, op cit

১১) Rural Labour Enquiry : *Report on Wages and Earnings of Rural Labour Households (1983, 1993-94) & Report on General Characteristics of Rural Labour Households (1999-2000)*, Labour Bureau, Simla

১২) *গণশক্তি*, ২৪ মার্চ, ২০০৬

১৩) হরকিষেণ সিং সুরজিতের 'ল্যান্ড রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া' (পৃ. ২৬৩) এবং সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৯২ থেকে সংকলিত তথ্য

১৪) রঞ্জন কুমার মিত্র, 'ভূমিসংস্কার, সবুজ বিপ্লব ও কৃষিবিপ্লব', *অনীক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ১২২

১৫) *Human Development Report 2004*, Development & Planning Department, Govt. of West Bengal, p. 41

১৬) বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য: চিত্তরঞ্জন দাশ, *পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি*, এমএলআরসি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৭৬-১৮০

ভারতীয় কৃষির বৈপরীত্যের আকার ও কৃষি সংকট

কার্তিক পাল

ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে আজও যেমন সামন্ত অবশেষ বিদ্যমান, তেমনি পুঁজিবাদের বিকাশের গতি মন্থর। ভারত আজ "পরমাণু শক্তিধর" দেশ। তথ্য প্রযুক্তিতেও বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দেশ। কিন্তু পাশাপাশি অনাহার, মৃত্যু, কৃষক আত্মহত্যা, দারিদ্র্য বেড়ে উঠেছে। অ-কৃষি ক্ষেত্রে বিকাশ ৬ শতাংশের বেশি। কিন্তু কৃষির বার্ষিক গড় বিকাশ ১.৬ শতাংশ। বিগত ১৫ বছরে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। কিন্তু উপকরণের ব্যবহার বাড়ছে এবং কৃষি উৎপাদনের হার কমছে। কৃষি উপকরণের মূল্য ক্রমেই তীব্র হয়েছে কিন্তু কৃষকরা সহায়ক মূল্য যথাযথ পাচ্ছে না। কৃষির এই বিপরীত আকার বেড়ে চলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কৃষি ক্ষেত্রে ক্রমেই কমছে, পাশাপাশি মহাজনি পুঁজির বৃদ্ধি ঘটছে।

কৃষির ও গ্রামীণ আয়ের ছবিটা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তারই পাশাপাশি কর্পোরেট চাষ, চুক্তি চাষ, কৃষিজাত দ্রব্যের খুচরো ও পাইকারি ব্যবসা নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ও বড় বড় কর্পোরেটদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কার কর্মসূচি ক্রমেই বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে শিল্পায়ন, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, নগরায়ণ-পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণ, জমি লুঠ অবাধে চলছে। দেশের খনিজ দ্রব্য ব্যাপক লুঠ হচ্ছে। খাদ্যপণ্যের উৎপাদনের এলাকা কমে যাচ্ছে, কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ ও গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। প্রথম সবুজ বিপ্লবের পর কৃষকদের সংকট বেড়ে যাওয়া, উদার বাণিজ্যনীতি, দেশের কৃষিকে কর্পোরেট ও উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর কৃষিনীতি পর্যালোচনা না করেই আবার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ওকালতি করা হয়েছে।

আমি কৃষির অন্তর্নিহিত দিকগুলো নিয়ে সংক্ষেপে চর্চা করবো। ভারতীয় কৃষির অনেক দিক আছে, সব দিক আলোচনা সম্ভব নয়। মূল মূল বৈশিষ্ট্যমূলক দিকগুলো নিয়েই আলোকপাত করবো। যেমন— সামন্ত অবশেষের মধ্যে জড়িয়ে ভারতীয় কৃষির পুঁজির বিকাশ, সামন্ত অবশেষের রূপ, পুঁজিবাদী বিকাশের গতিরুদ্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের তীব্রতা, উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি ও বিক্রয়মূল্য হ্রাস, সংকটগ্রস্ত কৃষিতে সরকারি বাজেট হ্রাস, ঋণ ফাঁদে কৃষকরা জর্জরিত ও নতুন করে মহাজনি ব্যবস্থা প্রবর্তন, ভূমি সংস্কার-সরকারি সংস্কার এবং দারিদ্র— কৃষিতে কর্মসংস্থান, কর্পোরেট সংস্থার মাধ্যমে কৃষি জমি ও দেশের খনিজ সম্পদ লুঠ। এই ধরনের বিষয়গুলো বর্তমানে ভারতীয় কৃষিকে বোঝা এবং সত্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থাকবে।

সামন্ত অবশেষের মধ্যে জড়িয়ে ভারতীয় কৃষির পুঁজিবাদী বিকাশ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ার জন্য ব্রিটিশরা বুঝেছিল অর্থনীতিতে আপেক্ষিকভাবে একটা স্থিতিশীলতা না রাখলে তাদের শাসন দীর্ঘদিন বজায় রাখতে পারবে না। ব্রিটিশরা ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোকে বিলোপ না করেই গ্রামীণ সমাজ পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাসকশ্রেণী একই দিশা অনুসরণ করে চলেছে। আমরা দেখতে পাই কৃষিতে পরিবর্তন এবং উৎপাদনশীলতা অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আজও বজায় আছে। আধা-ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে।

ব্রিটিশ রাজত্বে জমিদারি ব্যবস্থার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের তীব্র কৃষক বিদ্রোহগুলো (সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রভৃতি) ভারতের সামন্ত শক্তি ও জমিদারদের ভিত্তিভূমিকে টলিয়ে দিয়েছিল। ফলে ভারতের নতুন শাসক শ্রেণী বাধ্য হয়ে বিধিবদ্ধভাবে জমিদারিতন্ত্রের বিলোপ ঘটায়। ১৯৫০-এর দশকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে কৃষকদের দ্বারা জমিদারদের বা ভূস্বামীদের ৬০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা করা হয়। প্রায় ২ কোটির কাছাকাছি প্রজাকে এইভাবে রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি সম্পর্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের জমিদারদের বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী তা করা হয়। বাস্তবে এই ভূমিসংস্কার কর্মসূচির প্রধান সুবিধাভোগী ছিল দখলিস্বত্ব প্রজারা— যাদের বৃহৎ অংশই নতুন জমিদারে রূপান্তরিত হল। ক্ষতিগ্রস্ত হল স্বেচ্ছাধীন প্রজারা। নিজেদের হাতে চাষ করার নামে লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাধীন প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ভূস্বামীদের চাপে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনগুলো বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিমাণে হলো। এই আইন রচনা ও তাকে এমনভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল যাতে জমিদাররা বিরাট আকারে তাদের উদ্বৃত্ত জমি গোপন রাখার সুযোগ পেল, গরিব কৃষক ভূমিহীন কৃষকদের ক্ষেত্রে কঠিন কঠিন শর্তভিত্তিক মৌখিক প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা টিকে থাকার ব্যবস্থা হলো। প্রকৃত অর্থে বলা যায় এই ভূমি সংস্কার আইন ও ব্যবস্থাগুলো হয়ে দাঁড়ালো সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর মধ্যে জমির পুনর্বণ্টন। ছয় দশকের মধ্যে সারা দেশে প্রায় ৩০০ মতো ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন হওয়ার পরও দেশের মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ২ শতাংশ পুনর্বণ্টিত হয়েছে এবং ভাগচাষি বা বর্গাচাষির ক্ষেত্রে সাড়ে ৪ শতাংশ জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া

হয়েছে। এমনকি বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ টিকিয়ে রাখা হলো। বর্গাদারদের জমির মালিকানা দেওয়া হল না।

ভূমি সংস্কারের অর্থাৎ জমির উর্ধ্বসীমার বাইরে ৬৩ মিলিয়ন একর উদ্বৃত্ত জমির একটা হিসাব ৮ বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে পেশ করেছিল। তার মধ্যে সারা দেশে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ছিল ৭৩.৭৪ লক্ষ একর। বিভিন্ন রাজ্য সরকার দ্বারা অধিগৃহীত হয়েছে ৬৫.১১ লক্ষ একর। এর মধ্যে মাত্র ৫৩.০৫ লক্ষ একর বণ্টন করা হয়েছে। বণ্টিত জমিও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অধিগ্রহণের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণে নথিভুক্ত অ-নথিভুক্ত বর্গাদার-পাট্টাদার উচ্ছেদ হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ জমি সরকার এখনও অধিগ্রহণ করতে পারে নি।

আর্থিক দিক থেকে বিচার করলে, এই ভূমি সংস্কারে একদিকে প্রজাস্বত্ব কমে যায় তেমনি কৃষি-শ্রমিকদের মাধ্যমে চাষের বৃদ্ধি ঘটে। ভারতের ক্ষেত্রে কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশে জমিদারি পথের ধরনটি সামনে আসে। কিন্তু তা কৃষি উৎপাদনের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সার্বিকভাবে ভূমিসংস্কার যেহেতু হতে পারে নি তাই বৃহৎ বুর্জোয়াদের সাথে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির আঁতাত গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে এখনও মুষ্টিমেয় জমির মালিকদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত রয়েছে। দেখা যায় মাত্র ১.৬ শতাংশ জমির মালিকদের হাতে ১৭.৩ শতাংশ চাষযোগ্য জমি দখলে আছে। জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায়— প্রায় ৬০ শতাংশ জমির মালিকদের হাতে মাত্র ১৫.১ শতাংশ চাষযোগ্য জমি আছে। জমির মালিকানার এই বৈষম্যই কৃষি সংকটেরও অন্যতম বড় কারণ হয়ে আছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৮.৭ শতাংশ কৃষি জমি আছে প্রান্তিক ও ছোট চাষির হাতে। এদের গড় জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের কম। এই স্তরের কৃষকরা মোট জমির ৩২.২ শতাংশ চাষ করে। ৮.৭ শতাংশ কৃষি জমি রয়েছে মাঝারি ও বড় কৃষকদের হাতে। এই স্তরের কৃষকদের মাথাপিছু গড় জমির পরিমাণ ৪ হেক্টরের বেশি। তারা সামগ্রিক কৃষিজমির ৪৪.৪ শতাংশ জমি চাষ করে।

আমাদের সকলের জানা আছে, '৬০-এর দশকের শুরুতে আমাদের দেশকে মার্কিনদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। খাদ্য সংকটের সমাধান হিসাবে আমাদের দেশের শাসকরা সবুজ বিপ্লবের পথ গ্রহণ করলো মার্কিন কৃষি নীতি অনুযায়ী। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, নিয়ন্ত্রিত জল সরবরাহ— এই ধরনের নতুন প্রযুক্তির প্যাকেজই নতুন কৃষিনীতি। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্প চালু করতে যে নগদ অর্থের প্রয়োজন তা করা হল, তার জন্য জমিদার-ধনী চাষিদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া ও সমবায় ঋণের ব্যবস্থা হলো। এই নীতি জমিদার ও ধনী চাষিদের ওপর নির্ভর ছিল। তার ফলে গরিব, নিম্ন-মধ্য কৃষক, ভাগচাষি, বর্গাদার সকলেই আরও বেশি বেশি দারিদ্রের দিকে চলে গেল। গ্রামাঞ্চলে বৈষম্য বেড়ে গেল। এই নীতিটি দেশের কয়েকটি রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলে বাস্তবায়িত হল। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হল। যে সবুজ বিপ্লবের সামগ্রিক নীতি অনুযায়ী পুঁজিবাদী বিকাশের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সামনে এলো তার সামাজিক ভিত্তিটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। ব্যাপকভাবে বিরাজমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই নীতিগুলোর অকার্যকারিতা ও সংকটের লক্ষণগুলো ফুটে বের হল। ১৯৭০-এর শুরু থেকেই তেলের আন্তর্জাতিক দাম তীব্র মাত্রায় ক্রমেই বাড়তে থাকে। সবুজ বিপ্লবের মডেল দেশের অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যেমন মার খায়, তেমনি 'সবুজ বিপ্লবের' এলাকাগুলো ব্যাপক সংকটের মুখে পড়ে। কৃষি উপকরণের খরচ বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে চাষিরা ফসলের লাভজনক দামের দাবি জানাতে থাকে। সে সময়ে শারদ যোশী, টিকায়েত প্রভৃতি কুলাক লবির কৃষক নেতাদের চাষিদের পক্ষে আন্দোলন করতে দেখেছি। তখন সবুজ বিপ্লবের কার্যকারিতা ফুরিয়ে আসছে এবং সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

ঠিক এইরকম এক পরিস্থিতিতে ১৯৯০ দশকের শুরুতে নয়া-উদারনৈতিক শিল্প ও আর্থিক নীতিগুলো গ্রহণ করা হলো। কৃষির ক্ষেত্রে এই সব নীতিগুলো ভালোভাবে কার্যকর বা প্রয়োগ করার জন্য ভারতীয় কৃষিকে ডব্লিউটিও জমানার অধীনস্থ করা হলো।

আমরা দেখলাম ভারতীয় শাসকশ্রেণী এই সংকটের জন্য কৃষিনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন না করে একই কৃষিনীতি চালু রেখে কৃষি সংকটকে ঘনীভূত করে তুলল। এই বিপর্যয়ের ফলে প্রতিবছর হাজারে হাজারে ছোট ও মাঝারি কৃষককে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে ভারতের শাসকশ্রেণী। জমির মালিকানার আরও কেন্দ্রীভবন এবং কৃষির কর্পোরেটকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিসংস্কার আইনগুলোকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, গুজরাট, পাঞ্জাবে ভূমিসংস্কার নীতিগুলো পাল্টানো হয়েছে। বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে সেই চেষ্টা চলছে।

কৃষি সংকট শুধু উন্নত বাণিজ্যিক চাষের এলাকায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে বলে অনেকে মনে করে। সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ ঋণভারের জন্যই শুধু আত্মহত্যাকে বোঝে। কিন্তু কৃষি সংকটের গভীর কাঠামোগত ঘাটতির দিকগুলো বিচারে আসে না। নয়া উদারনীতি জমানায় ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি সংকটের কবলে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে দেখেছিলাম তাদের শাসনকালের শেষদিকে জমির উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার চেষ্টা

করে, কিন্তু বাইরের প্রতিবাদ ও শরিকের চাপে তা সাময়িক বাতিল করতে বাধ্য হয়। ২০০৩ সালেও কেন্দ্রীয় 'সেজ' আইনের মতই একটি আইন তৈরি হয়। বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস সরকার ২ এপ্রিল ২০১২, ১৯৫৫ সালের ভূমিনীতি ও ভূমিসংস্কারের ৬টি ধারা সংশোধন করে। এই আইনের ফলে ভূমিসংস্কারের নীতির উল্টোপথের যাত্রা আরও তীব্র হবে। একইভাবে বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে কৃষিজমি এবং এমনকি আদিবাসীদের জঙ্গল ও জমির অধিকারকে খর্ব করে কর্পোরেটের জমি অধিগ্রহণ সমানে চলছে।

সামন্ত অবশেষ কীভাবে রয়েছে— তার কিছু চিত্র

নতুন ধরনের পুঁজিবাদী জমিদাররা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ ও ভাড়া করা শ্রম ব্যবহার করলেও অর্থনীতি-বর্হিভূত নানা ধরনের শোষণের আশ্রয় নেয়। কৃষি সংকট বৃদ্ধির সাথে মহাজনি প্রথা ও বাঁধা মজুর প্রথার মতো সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো উন্নত কৃষির অনেক অঞ্চলে অত্যন্ত নগ্নভাবে ও আক্রমণাত্মকভাবে ফিরে এসেছে। এই নতুন ধরনের জমিদারিপ্রথার পাশাপাশি অনুপস্থিত জমিদারিপ্রথা সহ পুরনো ধরনের জমিদারিপ্রথাও ব্যাপক আকারে টিকে আছে। আজও মন্দির, বিভিন্ন ধর্মীয় ট্রাস্ট ও মসজিদের নামে অনেক জমি রয়েছে। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের পুরি জেলায় (অবিভক্ত) ৫৪ হাজার একর জমি রয়েছে। বর্তমানে সেখানেও ভাগচাষিরা অধিকার ও অর্থ দাবি করছে। এখানে প্রজাদের বা ভাগচাষি কিংবা নথিভুক্ত-অনথিভুক্ত ভাগচাষি-বর্গাদারদের কাছ থেকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত শোষণ করা হয়। এই ধরনের প্রজাস্বত্বে চাপানো চরম ভূমিখাজনার প্রাধান্য পুঁজিবাদের বিকাশের পথে বাধা। বামফ্রন্ট রাজত্বে বর্গাজমি রেকর্ডভুক্ত করার মাধ্যমে যে ভূমি সংস্কারের গর্ব করা হত তা বাস্তবে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষকে টিকিয়ে রাখার জন্য আইনি পদক্ষেপ। বর্গাজমির মালিকানা দিলে তা ইতিবাচক পদক্ষেপ হত।

প্রজাস্বত্বের দিকগুলো যদিও ভালো পরিমাণে বিরাজমান এবং নগদ খাজনার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তবু নগদ খাজনার রূপটি কিন্তু নিজে থেকেই প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশকে চিহ্নিত করে না। কারণ চাষবাস থেকে কৃষকদের যে লাভ হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ খাজনার মধ্যে তার থেকে অতিরিক্ত কোনও পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার প্রতিনিধিত্ব থাকে না। বরং এর মধ্যে ভূমি-মালিকদের দ্বারা শ্রমসেবা সহ উদ্বৃত্ত জবরদস্তির মাধ্যমে নিতে দেখা যায়। জমির বাজারটিও মুক্ত নয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিজারিতন্ত্র এই বাজারকে বিকৃত করে রেখেছে। কারণ একচেটিয়া জমি মালিকানার বাইরেও জমির দাম কমিয়ে রাখার মাধ্যমে অতিরিক্ত মাত্রায় খাজনা আদায় করা এবং জোর করে জমি দখলে রাখা। পাশাপাশি জমির কেন্দ্রীভবনও ঘটে চলেছে।

কৃষি ভিত্তিক সর্বহারার আপাত বিকাশ সত্ত্বেও, কৃষিমজুররা এবং কৃষির শ্রমের বাজারটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে মুক্ত নয়। শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতপাতের আধিপত্য সহ সমস্ত ধরনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক বিকৃতি রয়েছে। তবে বর্তমানে কৃষিমজুরদের স্বাধীন সত্তা বিকাশ লাভ করছে। নিজেদের শ্রম বিক্রির জন্য নিজেরাই দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়েছে। আজকাল কৃষিমজুরদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বাজার বসে, যেখান থেকে মজুরদের ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিকা প্রথায় কৃষিমজুররা কাজ অনুযায়ী মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার দিকগুলো বিকাশ করছে। যখন চাষের কাজ থাকে না তখন অত্যন্ত কম মজুরিতে শ্রম বিক্রি করতে হয়। কাজের সন্ধানে বিভিন্ন মরশুমে কৃষিমজুরদের বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে। দালালি-ঠিকাদারি-জমিদার ও পুলিশের হাতে বঞ্চনা ও অত্যাচারের হাতে পড়তে হয়।

আমাদের দেশে জাতপাতের জন্য রণবীর সেনা ও ভূমিসেনার দ্বারা দরিদ্র কৃষক-কৃষিমজুরের (বিশেষ করে দলিত) ওপর হামলা ও গণহত্যাগুলো দেখতে পাই। আর এই ধরনের সেনার গঠন সামন্ত শক্তি ও কুলাক শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিফলন। কিছু রাজ্যে 'খাপ পঞ্চায়েত'-এর যে খবর আমরা সাম্প্রতিককালে শুনতে পাই— সেটিও সামন্ত শক্তির প্রকাশ।

পুঁজিবাদী বিকাশের গতিরুদ্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের তীব্রতা বৃদ্ধি

বিদেশি সার, বীজ, কীটনাশকের সম্প্রসারণ প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিতে বিদেশি পুঁজির সূচনা ঘটে 'সবুজ বিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি ভারতীয় কৃষিকে এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক মাত্রা দিতে শুরু করে। সবুজ বিপ্লবের পর কৃষিতে সংকট বেড়ে ওঠায় ডব্লিউটিও-র অধীনে কৃষি বাণিজ্যের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং পাইকারি ও খুচরো ব্যবসা অর্থাৎ কর্পোরেট ও চুক্তি চাষে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে এই মাত্রাটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। চিরাচরিত বীজ ও সারের ব্যবসার ওপরও এদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বীজ প্রস্তুতকারী বহুজাতিক সংস্থা মনসান্টো ভারতে জিএম শস্যের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াকরণেও এফডিআই-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, কৃষকদের দ্বারা বাড়িতেই কৃষি প্রক্রিয়াকরণ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারত-মার্কিন অনেকগুলো চুক্তি সাক্ষর করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল কৃষিতে মেধা উদ্যোগ (কেআইএ)। এর শর্ত অনুযায়ী অগ্রবর্তী জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলোতে গবেষণা চালানোর জন্য ভারতে কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও সহায়তাগুলোকে মার্কিনের

বহুজাতিকদের অধীনে নিয়ে আসা। উল্লেখ্য আমেরিকার ওয়ালমার্ট ও মনসান্টো উভয়েরই ভারত-মার্কিন কেআইএ-র পরিচালন সংস্থায় নিজেদের প্রতিনিধি রয়েছে।

তুলো চাষে ইতিমধ্যে তার প্রয়োগ হয়েছে, ক্রমেই বেগুন-ধান প্রভৃতিতে প্রচেষ্টা রয়েছে। উন্নত বীজ-এর প্রজননের নাকি এই ব্যবস্থা। নতুন বীজ আইন তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা দেখছি, বিশ্বব্যাঙ্ক খোলাখুলিভাবে বেসরকারি রপ্তানিকারী ও ব্যবসায়িক সংস্থার স্বার্থগুলোকে মদত দিচ্ছে। যেমন, মহারাষ্ট্রের তুলোচাষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তুলো কর্পোরেশনের দ্বারা একচেটিয়া তুলো সংগ্রহের যে ব্যবস্থাপনা চলছিল এবং তুলোচাষিদের স্বার্থ রক্ষা করে আসছিল তা পরিকল্পিতভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা তুলোচাষিদের আত্মহত্যা ও সংকটের অন্যতম উৎস। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটিকের খামারগুলোতে ফুলচাষ ও তুলোবীজের খামারগুলোতে শিশুশ্রমের শোষণ খুবই যন্ত্রণাদায়ক। কীটনাশক-জনিত বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর ঘটনা অনেকেরই জানা। চুক্তিচাষে কম মজুরি দিয়ে থাকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। পাঞ্জাবে পেপসিকো দ্বারা টমেটো চাষিদের চরম প্রতারণা এবং ক্ষয়ক্ষতি দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় আলু চাষীদের সাথে পেপসির চুক্তি-চাষে আমরা একই ছবি দেখতে পাই।

বিদর্ভ ও তেলেঙ্গানার তুলোচাষিদের ঋণগ্রস্ততা ও আত্মহত্যার ঘটনাগুলোতে মুক্ত বাণিজ্যের ভয়াবহ পরিণতি হিসাবে দেখা উচিত। ১৯৯০ দশকে আন্তর্জাতিক দামের পটভূমিতে তুলোর রপ্তানির উদারিকরণ করা হয়। দেখা গেছে ১ বছরের মধ্যে কাঁচা তুলো রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটে ৩,৭৪,০০০ টন। ঠিক এর আগের তিন বছরের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪,০০০ টন, সেটা একলাফে দশগুণ বেড়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশি দামের লোভে তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ, পাঞ্জাব, কর্নাটিক এবং অন্যত্র তুলোচাষিরা বেশি বেশি তুলো চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্য চাষ থেকে তুলো চাষে চলে আসার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ, তুলো চাষের উপকরণের খরচ মেটাতে চড়া সুদে প্রচুর ঋণ নেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তুলোর দাম কমে যাওয়ায় চাষিরা সংকটে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের আখচাষিরাও একই ধরনের সংকটে পড়েছিল '৯০ দশকের শেষে এবং ২০১০ সালে। আন্তর্জাতিক বাজারে আখের মূল্য হ্রাস এবং নির্বিচার আমদানির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে আখ পড়ে থাকে। মুনাফাবাজ চিনিকল মালিকরা চাষিদের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়। সরকারি সহায়ক মূল্য কম থাকায় তাতে লাভ হয় না। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার তখন ৭০০ মতো কৃষিপণ্যের ওপর থেকে পরিমাণগত বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তার কোন পরিবর্তন করেনি। দেখা গেছে ১৯৯৮-২০০১ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের আমদানি ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় আর রপ্তানি ৭ শতাংশ হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক বাজারের কম দামের পণ্য সম্ভাব্য আমদানির ভয়ে দেশের ভেতরে দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। মুক্ত বাণিজ্য নীতির কোন পর্যালোচনা সরকার করে না। আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে বর্তমানে ভর্তুকি প্রথা ক্রমে তুলে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ আমেরিকায় মাত্র ৯ লক্ষ চাষির জন্য ভর্তুকি ১৫ বছরে ৭০০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মার্কিন সরকার চাষি প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ হাজার মার্কিন ডলার ভর্তুকি দেয়। 'মুক্ত বাণিজ্যে'র এই নীতিতে ভারতের গরিব চাষিরা কোনভাবে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। অথচ মার্কিন নির্দেশেই আমাদের দেশে কৃষকদের ভর্তুকি তুলে দেওয়া বা হ্রাস করার কথা বলা হচ্ছে। দেশের কৃষি ও কৃষিবিজ্ঞানীদের দেশের স্বার্থে ব্যবহার না করে বহুজাতিক কোম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি ও ফসলের বিক্রয়মূল্য হ্রাস

কৃষি উপকরণের খরচ তীব্র হারে বেড়ে উঠছে, কিন্তু ফসলের বিক্রয়মূল্য ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের উপকরণ—সার, বীজ, কীটনাশক, জল, পরিবহন, হিমঘর, বিদ্যুৎ, ডিজেল প্রভৃতি কৃষকদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বিগত ১ বছরে ১৩ বার। পেট্রোলিয়াম-জাত সমস্ত দ্রব্যের দাম বেড়েছে। বিগত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সারের ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩ গুণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। তার সাথে কালোবাজারি ও ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের দাপাদাপি তো রয়েইছে। বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে সেচের জলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। এর সাথে তাল দিয়ে বীজ, কীটনাশক, হিমঘরের খরচ বৃদ্ধি ঘটেছে। অনেক রাজ্যে বিদ্যুতের অভাবে কৃষকদের ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা যেমন বেড়েছে, তেমনি ডিজেলের মূল্য ২০০০ সাল থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ফসলের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারি প্রয়োজনীয় সহায়ক মূল্য নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চিত্র দেখা যায়— এক কুইন্টাল পাট উৎপাদন করতে খরচ পড়ে কমপক্ষে ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা, এক কুইন্টাল ধান উৎপাদন করতে খরচ হয় ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা, আলুর কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন-খরচ ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। কিন্তু কৃষকরা তার মূল্য পাচ্ছে পাটে ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকা। ধানে গড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। সরকারি সহায়কমূল্য ধানে মাত্র ১০১০-১০৮০ টাকা। আলুতে কোন সহায়ক মূল্য দেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদন বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে সামনে এসেছে। পাট ৫০০০ টাকা, ধান ১৫০০ টাকা, আলু ৮০০ টাকা কুইন্টাল মূল্য হলে কৃষকরা চাষে লাভের মুখ দেখতে পারে। শাক-সব্জির মূল্য এবারে

কৃষকরা পায়নি। শহরের বাজার-দাম থেকে কৃষকদের পকেটে যাওয়া অর্থের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়ে, মিল মালিক, কোল্ড স্টোরেজ মালিকরা লাভটা পায়। দেখা গেছে, ধানের সহায়ক মূল্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা আত্মসাৎ করেছে। তাছাড়া সব থেকে বড় সমস্যা, গরিব ও নিম্নমধ্য কৃষক ও ছোট চাষিরা অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মহাজনি ঋণ পরিশোধ করতে বা সংসার চালাতে গিয়ে তা করতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১ বছরে ৬২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। তদন্তে দেখা গেছে ঋণ পরিশোধের চাপ ও যথাযোগ্য মূল্য না পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার কৃষকদের আত্মহত্যার কথা মানতে চায়নি।

কেন্দ্র একদিকে কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, পাশাপাশি কৃষিতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষকদের ভর্তুকি ছিল তা ক্রমে ক্রমে তুলে নেওয়া হয়েছে। পেট্রোলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বড় তেল কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাঝে মাঝেই সারের ও কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধানের সহায়ক মূল্য ২০০২ সাল থেকে বার্ষিক ৪.৫ শতাংশের বেশি হারে বাড়েনি। গমের ক্ষেত্রে ২ শতাংশের কিছু বেশি। আলু এবং শাক-সব্জির সহায়ক মূল্য নেই।

বড় বড় শহরগুলোতে শাক-সব্জির খুচরো দাম ও চাষিদের যে দামে বিক্রয় করতে হয় তার অনুপাত ১১ঃ১ থাকে। শাক-সব্জি সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী হিমঘরের ব্যবস্থা নেই। ব্যবসায়ী ও বড় বড় আড়তদাররা দামের কারচুপি করে থাকে। কখনও পেঁয়াজ, কখনও আলু খুবই কম দামে চাষিরা বিক্রি করে, তখন বড় বড় শহরে তার মূল্য ১২ থেকে ১৫ গুণ হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পুঁজির ফাটকা ভূমিকা বেশি বেশি থাকে। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে বড় বড় সব্জি মান্ডি বা মলগুলোতে এই ফাটকা কারবার ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।

বিক্রয়মূল্যের হ্রাসে সব সময় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য হয় তা বলা যায় না। উৎপাদনের হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও দাম কমেছে। উৎপাদন মূল্য বাড়া সত্ত্বেও বিক্রয়মূল্য কমেছে। এই ওঠা-নামার মূল কারণ ভ্রান্ত আমদানি-রপ্তানি নীতি।

কৃষিপণ্যের সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং খুচরো ও পাইকারি বিক্রিতে বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অনুপ্রবেশ, আগাম বাণিজ্যে বৃহৎ ফাটকা পুঁজির ভূমিকার দ্বারা গভীরতর হয়ে ওঠা মূল্য সংকট, কৃষি সংকট সৃষ্টির পেছনে একটা বড় কারণ হয়ে উঠেছে। এইগুলো হল উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের উদার অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফল। রাজ্য সরকারগুলোর তরফ থেকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা যদি সরাসরি সরকারি বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা পায় তাহলে ফাটকা ও ফড়েদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে। কৃষি বিপণনের সরকারি পরিকাঠামো যেমন খুবই সীমিত, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসল সংরক্ষণের পরিকাঠামোও খুবই কম।

সংকটগ্রস্ত কৃষিতে সরকারি বাজেটের পরিমাণ হ্রাস

কৃষিতে সংকট বৃদ্ধি ও কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি হলেও কৃষিতে সরকারি বরাদ্দে কোন বৃদ্ধির দিক নেই। বরং দিন দিন কমছে। দেশের মোট পুঁজির গঠনে কৃষির অবদান ১৯৮০-৮১ সালে যেখানে ছিল ১৫.৪ শতাংশ, ২০০১-০২ তা দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। জিডিপি-র শতকরা হিসাব যেখানে একই সময়ে ছিল ৩.৫ শতাংশ, সেটাও কমে দাঁড়ায় ১.৩ শতাংশ।

সরকারি বিনিয়োগ ও পুঁজি গঠনে যেমন হ্রাস ঘটেছে, তেমনি বেসরকারি বিনিয়োগও পুঁজি গঠন বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক দেখা যায়নি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রামীণ পরিবারগুলোর দ্বারা সৃষ্ট মোট পুঁজি গঠনের পরিমাণ ১৯৬২ সালে ৯.৬ শতাংশ থেকে ১৯৮২-তে কমে দাঁড়ায় ৬.৫ শতাংশ এবং ১৯৯২ সালে কমে দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশ। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবার কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে ১৯৭২ সালে ১৯.৩ শতাংশ, ১৯৯১-৯২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১.৮৯ শতাংশ।

কৃষির পরিকাঠামো বিকাশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই করুণ। প্রথমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যেখানে ছিল ২৩ শতাংশ, বিভিন্ন নামের যেমন 'ভারত নির্মাণ' ইরিগেশন বেনিফিট স্কীম পরিকল্পনাগুলো থাকা সত্ত্বেও তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫ শতাংশে। সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাওয়ার বিপরীতে কর্পোরেট শিল্পপতিদের কর-ছাড় প্রতি বাজেটে বেড়ে চলেছে। ২০০৬-০৭ সালের বাজেটে কর-ছাড় আর্থিক মূল্যে ১,৫৮,০০০ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে সেই কর-ছাড় পুঁজিবাদের সংকট দেখিয়ে আরও ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কৃষিতে ভর্তুকির সিংহভাগ চলে যাচ্ছে বড় বড় কৃষকদের পকেটে, যাদের অন্তত ১০ একরের বেশি জমি আছে। সারের ক্ষেত্রে বি-নিয়ন্ত্রণ করার ফলে সার কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে আর ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের ওপর রোলার চালানো হচ্ছে। সারের ক্ষেত্রে দেওয়া ভর্তুকির বেশিরভাগ ভোগ করছে অদক্ষ সার কোম্পানিগুলো।

ঋণ ফাঁদে কৃষকরা জর্জরিত ও নতুন করে মহাজনি ব্যবস্থার প্রবর্তন

কৃষকদের ব্যাপক পরিমাণে ঋণগ্রস্ততাই আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে সামনে এসেছে। জাতীয় সমীক্ষা চালিয়ে ২০০৫ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় ৫৩ শতাংশ থেকে প্রায় ৮২ শতাংশ কৃষক ঋণগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে বেশি। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি রাজ্যে

তুলনামূলক কম। সবুজ বিপ্লবের এলাকা পাঞ্জাবে প্রত্যেক কৃষকের মাথাপিছু আয় ৪১,৫৭৬ টাকা। কৃষি থেকে সামগ্রিক আয়ের চেয়ে মোট ঋণের পরিমাণ বেশি হয় এবং মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৪১,৫৭৬ টাকা হয়—তাহলে প্রমাণ হয় যে অনেক ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা ইতিমধ্যে অপরিশোধযোগ্য ঋণের ফাঁদে জর্জরিত হয়ে পরিশোধ করতে পারছেন না। এর ফলে অনেকে জমি হারিয়ে কৃষিকাজ থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের কৃষি সংকটের দিকগুলো দেখিয়ে দেয়। সরকারি পরিকাঠামো কৃষিতে বিনিয়োগের ঘাটতির জন্য কৃষকরা বেশি আয়ের জন্য মহাজনি ঋণ যেমন নিচ্ছেন তেমনি এটাকেই তারা উন্নতি ভাবেন। পরিণামে কৃষক আত্মহত্যা বেড়ে উঠছে।

সামগ্রিক কৃষি ঋণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ভাগ হল ৪০ শতাংশের কম এবং চাষিরা ঋণের জন্য মহাজনদের ওপরেই নির্ভর করেন। চড়া সুদে সেই ঋণ গ্রহণ করেন তাঁরা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বেশিরভাগ বৃহৎ চাষিদের কাছেই যায়, যাদের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশি। লক্ষণীয় দিক হলো, এই ঋণের টাকা চড়া সুদে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে বেসরকারি ঋণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঋণ পরিশোধের সময়ে সেই সমস্ত কৃষকরা অনাদায়ী স্তরে পড়ে যায় ইচ্ছাকৃতভাবে। এই প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কৃষি ঋণ দিচ্ছে অত্যন্ত চড়া সুদে। পশ্চিমবঙ্গে মহাজনি ঋণের প্রবণতা ৬২-৬৭ শতাংশ। বামফ্রন্ট রাজত্ব থেকেই এর বৃদ্ধি ঘটেছে। এটা লক্ষণীয় যে, অনাদায়ী ঋণের মধ্যে কৃষি ঋণের ভাগ ৪ শতাংশ। ৬০-৭০ শতাংশ বড় ও মাঝারি কোম্পানির ভাগ। কর্পোরেট সংস্থাগুলো ব্যাপক হারে ঋণ পরিশোধ থেকে ছাড় পেয়ে থাকে। ২০১১-১২ বাজেটে দেখা গেছে— কর্পোরেট কর বাবদ ছাড় দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজির সংকটের জন্য এই পরিমাণ ক্রমেই বাড়ানো হয়েছে এবং আরও হবে।

ভূমি সংস্কার, সরকারি সংস্কার, দারিদ্র্য ও কৃষিতে কর্মসংস্থান

ভূমি সংস্কার, বিভিন্ন ধরনের সরকারি সংস্কার সত্ত্বেও কৃষকশ্রেণীর একটা বড় অংশ সহ গরিবদের দারিদ্র-দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলেছে। যখন দেশে দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা নির্ধারণের কথা ওঠে তখন যোজনা কমিশন দাবি করেছিল দেশে গরিবি কমছে। ২০০০ সালে দাবি করেছিল, তা ২৬ থেকে ২৪ শতাংশ হয়েছে। তখনই জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৭তম রাউণ্ডে দেখা গেছে দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া শর্ত বা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষক পুঁজি ও উপকরণের অভাবে ক্রমেই জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের মাত্রা এমন বেড়েছে তাতে গরিব চাষিরাই বেশি উচ্ছেদ হচ্ছেন। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বভাগে ৭০ শতাংশ, উত্তরবঙ্গে ৮৬ শতাংশ, ঝাড়খন্ডে ৮৫ শতাংশ, মধ্য-বিহারে ৭৩ শতাংশ, উড়িষ্যায় ৬২-৮৫ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৭৫-৮৫ শতাংশ। একইভাবে কৃষিতে কর্মসংস্থান এতই কমছে যার ফলে প্রতিটি রাজ্য থেকে, বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা থেকে, পরিযায়ী শ্রমিক এবং নির্মাণ শ্রমিকের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে ধরা পড়ছে, ২০০০ সালেই তা ২.২৩ শতাংশ থেকে ০.০২ শতাংশ হয়েছিল।

কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণও শ্রমকে সংকোচন করে একাধারে, অন্যদিকে শ্রমকে পুনর্স্থাপন করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে উত্তরপ্রদেশে ৫ হেক্টর আয়তনের খামারগুলিতে বছরে ১৪০ দিন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, অথচ যে খামারে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ হয় না সেখানে বছরে ১ হেক্টরে প্রায় ২০০ দিনের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিমজুররা গড়ে কৃষিতে কাজ পায় ৩৬৫ দিনে ১২০-১৫০ দিন। এনআরইজিএস প্রকল্পের যা অবস্থা তাতে বছরে ১৫-২০ দিন কাজ হচ্ছে। ১০০ দিন কাজ কোথাও নেই। তাছাড়া সরকার এই প্রকল্পের জন্য সংস্থান প্রতি বছর ১০০০ কোটি টাকা কম করছে— এবারেই ৪০ হাজার কোটি থেকে ৩৯ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।

ভূমি সংস্কারের জন্য গর্বিত ছিল বামফ্রন্ট সরকার। 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি ও খাস জমি বিতরণ প্রশ্নে মডেল হিসাবে দেখানো হত। বলা হত, এই সমস্ত কর্মসূচির জন্যই নাকি কৃষিতে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল ঠিক তার বিপরীত। ৮০-র দশকের মধ্যেই দেখা যায় বর্গাদার (নথিভুক্ত) ও পাট্টাদারদের জন্য যে আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা ক্রমেই বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি জমির মালিকরা সিপিএমের পতাকাতলে গিয়ে বর্গাদার ও পাট্টাদার উচ্ছেদ করে। তাছাড়া এই দরিদ্র কৃষকরা চুক্তির মাধ্যমে বর্গা ও খাস জমি ছেড়ে দেয়। ২০০৪ সালে ইউএনডিপি-র পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্টে দেখা গেছে, ১৩.২৩ শতাংশ পাট্টাদার জমি হারিয়েছে এবং ১৪.৩৭ শতাংশ বর্গাদার জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। এদের বেশিরভাগ লাভের অভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না পাওয়ার দরুন চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জমি ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ ২০-৩০ শতাংশ। বিভিন্নভাবে জমি অধিগ্রহণের পর্বে তার পরিমাণ বেড়েছে। বর্তমান সরকার অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস জোটের রাজত্বে গ্রামাঞ্চলে জোতদার ও ধনী চাষিদের সামাজিক প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠায় দখলিকৃত খাস জমি থেকে এবং নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত বর্গাদারদের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিমজুরের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে উঠছে,

প্রায় ১ কোটি হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সাচালক প্রভৃতি গ্রামীণ মেহনতি মানুষের ভীড় শহরাঞ্চলে বেড়ে চলেছে। ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচি তা রুখতে পারেনি। অনাহার, অর্ধাহার বেড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে বোরো চাষের বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ও উৎপাদনের হার বেড়েছিল। '৯০-এর দশক থেকে কমতে শুরু করেছে। এই যদি মডেল রাজ্যের পরিণতি হয় তাহলে বাকি রাজ্যগুলো কী অবস্থা বোঝা খুব কঠিন নয়।

কর্পোরেট সংস্থার মাধ্যমে কৃষিজমি ও দেশের খনিজ সম্পদ লুঠ

কৃষিতে একদিকে যেমন বিভিন্নভাবে কর্পোরেটের অনুপ্রবেশ ঘটছে, তেমনি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে—উন্নয়ন ও শিল্পায়নের নামে। এসইজেড (সেজ), ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন নগরায়ণ, উপনগরী প্রভৃতি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের ১৮৯৪ সালের আইনকে ভিত্তি করেই ভারতে কৃষি জমি ধ্বংস ও লুঠ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ১৮৯৪ সালের আইনকে পরিবর্তনের নামে তাকেই প্রতিস্থাপিত করার লক্ষ্যে 'জমি অধিগ্রহণের পুনর্স্থাপন-পুনর্বাসন', 'এলএআরআর' বিল লোকসভায় বিচারের জন্য পেশ হয়েছে। কর্পোরেট ঘরানাগুলো এবং রিয়েল এস্টেট ও ভূমি লুঠের বিরুদ্ধে জনমত ও কৃষক বিদ্রোহ গড়ে উঠেছে। দিকে দিকে 'সেজ' আইন ২০০৫ এবং ১৮৯৪ সালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন বাতিলের আওয়াজ উঠেছে।

লক্ষণীয় দিক হল— ভূমি সংস্কার কর্মসূচি কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে। কর্পোরেট ও শিল্পপতিদের স্বার্থে জমির উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হচ্ছে। কলিঙ্গনগর, পস্কো, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, নয়ডার কৃষকদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সত্ত্বেও ঝাড়খন্ড, বিহার, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। প্রথম প্রথম এই জমি অধিগ্রহণ কৃষি সংকট ও কৃষি অর্থনীতির সাথে সংযুক্তভাবে অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলো বিচার করেনি, কিন্তু ক্রমেই কৃষির সথে তা ভালরকম যুক্ত হয়ে গেছে। কৃষি আবাদের জমি যেমন ধ্বংস হচ্ছে, তেমনি খাদ্যপণ্য উৎপাদনের এলাকা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। ক্রমেই আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে— **কৃষি জমি অধিগ্রহণের জন্য বিল বা আইন বাতিল করতে হবে, বরং কৃষি জমি সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন জরুরি**। দেশে যে হারে আদিবাদীদের জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাতে আদিবাসীদের চিরাচরিত অধিকারগুলো খর্ব হচ্ছে। দেশের খনিজ সম্পদ কর্পোরেট দ্বারা লুঠ হচ্ছে, অন্য দেশে পাচার হচ্ছে। দক্ষিণ উড়িষ্যার ন্যাড়া পাহাড়গুলোতে ডোঙরিয়া কোন্দ উপজাতিদের বহু বছর থেকে বসতি ছিল। তখন উড়িষ্যা নামে কোনো রাজ্যের জন্মই হয়নি। পাহাড়গুলো তারা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে আসছে। বেদান্ত কোম্পানি তা ক্রয় করেছে। বর্তমানে এই পাহাড়গুলো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট রয়েছে। বেদান্ত হলো পৃথিবীর বড় কোম্পানির মধ্যে একটি। যার মালিক অনিল আগরওয়াল, লন্ডনে থাকেন। পাহাড়-জঙ্গল প্রভৃতি লুঠের বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে একটি। ঐ পাহাড়গুলোর ঝর্ণার জল থেকে সমতলে কৃষকদের চাষ-আবাদও হত। সমরেন্দ্র দাস ও ফেলিক্স প্যাডেল তাদের প্রকাশিত "Out of his Earth : East India Adivsasis and Aluminum Cartel" গবেষণাপত্রে হিসাব করে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র উড়িষ্যার সঞ্চিত বক্সাইটের মূল্য প্রায় ২.২৭ ট্রিলিয়ন ডলার (২,২৭,০০০ কোটি ডলার)। ভারতের জিডিপি-র প্রায় দ্বিগুণ। এটা ২০০৪ সালের হিসাব, এখন ধরলে তার মূল্য ৪ ট্রিলিয়ন ডলার হবে। শুধু আদিবাসীদের উচ্ছেদ নয়, যার সাথে সমগ্র অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্যের ক্ষতি হয়েছে। অথচ কর্পোরেটদের কাছে তা কোটি কোটি টাকা ছাড়া কিছুই নয়।

উড়িষ্যার বক্সাইটের সঙ্গে যদি আর ২৮টি খনিজ সম্পদের উৎস হিসাব করা, তার মধ্যে রয়েছে ইউরেনিয়াম, চুনাপাথর, ডলোমাইট, কয়লা, টিন, গ্রানাইট, মার্বেল, তামা, হীরে, সোনা, কোয়ার্টজ, কোরান্ডাম, বেরিল, আলেকজান্দ্রিট, সিলিকা, ক্লোরাইট, গ্রেনেট। তার সাথে যুক্ত করুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ, হাইওয়ে, ইস্পাত, সিমেন্ট কারখানা, অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র এবং নানা ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প— সব মিলিয়ে যা স্বাক্ষরিত 'মউ'গুলোর একটা বড় অংশ, যা ঝাড়খন্ড ও ছত্তিশগড়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এইসব মৌ-চুক্তির মধ্যে ৯০ শতাংশ শুধুমাত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যে রূপায়ণের লক্ষ্যে সই করা হয়েছে। ঝাড়খন্ডের হাজারীবাগে জিন্দাল কোম্পানিকে ৩০০০ একর, আম্বানি ও অন্যান্য কোম্পানিকে ১ লক্ষ একর জমি দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বড়কাগাঁও-এ ব্যাপক কৃষি জমি রয়েছে। রাঁচীর কাছে নাগরী গ্রামে ২২৮ একর উর্বর কৃষি জমি অধিগ্রহণ ও আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ নিয়ে আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে। পালামৌতে হরিহরপুরে জমিদারদের জমি আদিবাসী জনগণ চাষ করতেন— তা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যে জমিদার একসময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে ঐ সমস্ত জমি ক্রয় করেছিল। ঝাড়খন্ড হয়ে উঠেছে কর্পোরেট লুঠের রাজ্য, যেখানে মূলবাসী ও আদিবাসীরাই পরবাসী হয়ে উঠেছে। তা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কয়লা ব্লক নিয়ে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি দুর্নীতি ক্যাগের রিপোর্টে ধরা পড়েছে। কর্পোরেটদের খোলাখুলি লুঠের এটাও নমুনা। লুঠ ও বিকাশের ছবি বর্তমান বিকাশের সাধারণ ছবি।

তামিলনাড়ু সরকারের 'ভিশান ২০২৩' মূলত নগরায়ণের লক্ষ্যে বিশাল কর্মসূচি। যার মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সরকারের ঘোষণা, এক-তৃতীয়াংশ কৃষককে শহরের শ্রমিকে রূপান্তর করা হবে। ব্যাপক আকারে চুক্তি চাষ শুরু হয়েছে। ১ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমি। বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা এই চুক্তি চাষে অনুপ্রবেশ করেছে। নতুন নতুন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে। ১৬ হাজার হেক্টর ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ হয়েছে। অন্যত্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চলছে, কিন্তু সরকার উচ্ছেদ ও কৃষিজমি ধ্বংসের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

বিহারের নীতিশ সরকার কৃষি জমি অধিগ্রহণের রাস্তায় নেমেছে। নীতিশ 'ইন্দ্রধনু ক্রান্তি' নামে বিকাশের পরিকল্পনা করেছে। তারজন্য কেবিনেট কমিটি গঠন করা হয়েছে। খাগারিয়া, মজফফরপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গায় কৃষিজমি অধিগ্রহণ পর্ব চলছে। ভারত-নেপাল সীমান্তে বিহারে জমি অধিগ্রহণ তীব্র হয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় ১০০০ একর জমি নিয়ে লড়াই চলছে। এখানে দেখা গেছে প্রায় ১ লক্ষ বর্গাদার এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। খাগারিয়াতে ২০০ একর কৃষিজমি ধ্বংস করা নিয়ে লড়াই বেশ তীব্র রূপ নিয়েছে। ভাগলপুর এনটিপিসি-র মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকরা সংগঠিত হয়ে লড়াই করছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় সড়ক, বাঁধ নির্মাণ, নগরায়ণ প্রভৃতির নামে সরকারি অনুমোদন দিয়ে কর্পোরেটদের মৃগয়াক্ষেত্র করে তোলা হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিহারের পুরাতন প্রভু ও মাফিয়াচক্র।

সরকারি নীতি যে পথে চালিত হয়েছে— তাতে ক্রমেই দেশের আবাদি জমি কমবে। এমনই একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে: কৃষি আজ লাভজনক নয়। কর্পোরেটকে জমি দিয়ে মোটা পরিমাণ অর্থ নাও— কর্পোরেট যাতে কৃষিতে পুরোপুরি থাবা বসাতে পারে। কর্পোরেট বা বড় বড় শিল্পপতি উৎপাদনমুখী শিল্প বা সংগঠিত শিল্পে আজ লাভ দেখতে পাচ্ছে না। বরং পুঁজির সংকটের বাজারে জমি ও কৃষি নিয়ে মোটা অঙ্কের লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছে। যেখানে কৃষকরা কৃষিতে লাভজনক হতে পারছে না।

ভারতের বিস্ময়কর আর্থিক বৃদ্ধির জাহাজ ইতিমধ্যে ডুবুডুবু। বিরাট অঙ্কের সামাজিক আর পরিবেশগত খরচের জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে। ফিকে হচ্ছে সবুজ বন, নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে জলস্তর। ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির গল্প আর গণতন্ত্র— দুটিকে আর মেলানো সম্ভব নয়। পাহাড় ধ্বংস, কৃষি জমি ধ্বংস, বক্সাইট নিংড়ে বের করতে হলে জঙ্গল ধ্বংস অনিবার্য। ভারতের ৭৫ শতাংশ মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করলে ভয়াবহ রূপ নেবে। খাদ্য সংকট বৃদ্ধি হবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীগুলোর মধ্যেও পুঁজিগত সম্পদের অসম বণ্টন ও কৃষিতে পুঁজিবাদের সংকীর্ণ ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের জমিদারি পথে একের পর এক সংকট চলছে। নয়া-উদারনীতিবাদী নীতিগুলো গ্রহণ করা ও কৃষিক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ ঘটানো (কৃষিকে ডবলিউটিও-র অধীনস্থ করে ফেলার সাথে সাথে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংকট বৃদ্ধি হয়েছে) কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশে মূল বিষয় হল কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ আবার কৃষিতেই পুনর্বিনিয়োগ, তা খুবই কম। বরং ভোগের জন্য উৎপাদন এবং উৎপাদন থেকে লভ্যাংশকে ব্যবসা-বাণিজ্যে চালিত করা হয়। এই সবের মাধ্যমে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বিকাশ লাভ করছে।

বিপুল ঋণগ্রস্ততা, সরকারি বিনিয়োগ কম, কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, বিপরীতে উৎপাদিত ফসলের মূল্য কম, বাণিজ্যের উদারীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কমে যাওয়া, মহাজনি প্রথার টিকে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া, পরিকাঠামোগত সংকট মোচন না হওয়া এবং সর্বোপরি ভূমি সংস্কারের ব্যর্থতার জন্য ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্বের বিন্যাস একপেশে হওয়ার জন্য আমাদের দেশের কৃষির সংকট যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি কর্পোরেট দ্বারা জমি লুঠ বেড়ে চলেছে।

সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ টিকে থাকার জন্য জমিদারিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কটা এমনই যে একটা থেকে আলাদাভাবে অন্যটা আলাদা করা যাবে না। বৃহৎ ভূ-সম্পত্তিবান অভিজাততন্ত্র কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের প্রধান সহযোগী ও মাধ্যমে। এটাই নতুন ধরনের নয়া কর্পোরেট জমিদারি। এই নতুন ধরনের জমিদার হচ্ছে টাটা, রিলায়েন্স, ভারতী, পেপসি, টাইটন, ওয়ালমার্ট, মনসান্টো, কারগিলরা।

স্মরণ : হবস্‌বম

ব্রিটেনের প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরিক হবস্‌বম গত ১লা অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন। 'অনীক' তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

ভারতীয় কৃষি

পশ্চিমবাংলার কৃষি ও কৃষকের বর্তমান অবস্থা

প্রদীপ সিংহ ঠাকুর

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকের পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল, কৃষি ও কৃষক এবং বর্তমানের পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল, কৃষি ও কৃষকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ ঘটে গেছে।

অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল, কৃষি ও কৃষক রয়েছে নিরন্তর গতির মধ্যে, তাই এটা স্বাভাবিক যে, বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে।

অবিভক্ত বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ভবানী সেন লিখেছিলেন : "বাংলার সমস্ত জমিদারীর এক তৃতীয়াংশ নয়টি জমিদার পরিবারের দখলে। বর্ধমানের মহারাজা, কাশীমবাজারের মহারাজা, প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, নাটোরের জমিদার, ময়মনসিংহের মহারাজা, নসিপুর, দীঘাপাতিয়া, শুঠিয়া এবং বজেন্দ্রকিশোর— এই নয়টি জমিদার পরিবার। ইহাদের ভিতর বর্ধমানের মহারাজাই সবচেয়ে বড় জমিদার। তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ময়মনসিংহের মহারাজার বাৎসরিক আয় প্রায় দশ লাখ টাকা।

"বাংলার জমির টাকা কৃষিতেও খাটে না, শিল্পেও খাটে না; তবে সে টাকা যায় কোথায়? যায় ব্যক্তিগত বিলাসিতায়। বাংলার অনেক জমিদার পরিবার বিলাসব্যসনে উচ্ছন্নে গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোন একটি জমিদার মদের দোকানে ৯৩,০০০ টাকা বাকি ফেলায় তাঁহার জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ চলিয়া গিয়াছিল। কোন এক জেলায় একটি প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবার আছে, যাদের ছিল একটি গণিকা পল্লী। এই পল্লীর খরচ জুটাইতে গিয়া জমিদার ফতুর হন এবং শেষ পর্যন্ত তাহার জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গিয়াছিল। নাটোরের জমিদারদের বাৎসরিক আয় ৪ লাখ টাকা, বিলাস-ব্যসনের দেনায় তাঁহার জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ গিয়াছিল।" (*নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ*, পৃ. ৬২-৬৩)।

আজকের পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের জমিদার এবং জমি থেকে আয়ের ব্যবহারের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বর্তমান পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে জমির বিরাট মাত্রার খণ্ডীকরণ ঘটে গেছে। হাজার হাজার বিঘা পরের কথা, শত শত বিঘা জমির মালিক খুঁজে পাওয়াও সহজ বিষয় নয়। সেক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার তেভাগা কৃষক সংগ্রাম, পরবর্তী সময়ের কৃষক সংগ্রাম তথা গণসংগ্রাম, পরবর্তীতে নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম এবং তার তাপ-উত্তাপ থেকে গড়ে ওঠা দেশের নানান প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম— যেমন মুশাহারী, শ্রীকাকুলাম, ডেবরা-গোপীবল্লভপুর এবং এই সংগ্রামগুলিকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্তরের নানা উদ্যোগ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে পশ্চিমবাংলার কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনলো।

এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অন্যতম হচ্ছে যাঁরা বেশী জমির মালিক ছিলেন, জমিদার-জোতদার ছিলেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জমির বণ্টন।

এ বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন জমিদারি অধিগ্রহণ আইন, ভূমিসংস্কার আইন নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেই সময় তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী বলেছিলেন যে, উদ্বৃত্ত জমির পরিমাপ হবে ১৮ লাখ একর। তখন জমির ঊর্ধ্বসীমা ছিল ব্যক্তিভিত্তিক, পরিবার-ভিত্তিক নয়। তারপর ১৯৭২ সালে যখন সিলিং পরিবার-ভিত্তিক হল, সেচ এলাকায় সাড়ে বারো একর এবং অ-সেচ এলাকায় সাড়ে সতের একর হল, তখন ভেস্টজমির পরিমাণ যে ১৮ লাখ একর থেকে অনেকটাই বাড়বে তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কিছু আগে একথা বলেন যে, বর্তমানে ভেস্ট জমির পরিমাণ হওয়া উচিত ৩০ থেকে ৩৫ লাখ একর। বিনয়বাবু দ্বিতীয় সংশোধনীর মারফত আরও ১০ লক্ষ একর বাড়তি ভেস্ট জমি পাওয়ার কথা বলেছিলেন। সর্বমোট ৪০-৪৫ লক্ষ একর ভেস্ট জমি হওয়ার কথা।

বামফ্রন্ট সরকার তার নিরবিচ্ছিন্ন শাসন পর্বে "ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বণ্টিত জমির পরিমাণ (১৫ জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত) ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৪ শ একরে" দাঁড়িয়েছে (সূত্র: *কোন পথে পশ্চিমবঙ্গ*, পৃ. ২০)।

এক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য স্মরণে রাখা খুব জরুরি। বণ্টিত জমির মোট পরিমাণ হিসেবে যা বলা হচ্ছে তা শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার সময়ই এ রাজ্যে বণ্টিত ভেস্ট জমির পরিমাণ ৬ লক্ষ ১২ হাজার একর। তাই সঠিকভাবে বললে বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে ভেস্ট জমি বিলি হয়েছে ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৪০০ একর।

এই তথ্যটি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির সামনে এনে আমাদের দাঁড় করায়, তা হলো, কেন ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকার ভেস্ট জমি বিলি বন্টনে আগের সময়কালের পরিমাণ অর্থাৎ ৬ লক্ষ ১২ হাজার একরে পৌঁছতে পারলো না? কেন ৪০-৪৫ লক্ষ একর জমি, যা ভেস্ট হবে বলে অনুমিত হয়েছিল, তা হলো না?

আসলে এ বিষয়টিকে আমরা বৃহত্তর পরিধিতেও ফেলতে পারি।

জমির সিলিংকে যদি পরিবার পিছু ২০ একরে নামিয়ে

আনা হয়, তাহলে কত পরিমাণ ভেস্টজমি পাওয়া যাবে, তা নির্ণয়ের জন্য মহলানবীশ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। মহলানবীশ কমিটি জানিয়ে দেয় যে, তার পরিমাণ হবে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর।

এই ঘোষণার পর বহু বছর পার হয়ে গেছে। এ বিষয়ে গ্রামাঞ্চলে ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে?

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশিত 'যোজনা'-র অক্টোবর ২০১১ সংখ্যায় বলা হয়েছে— "পরিসংখ্যানে, হিসাব অনুযায়ী ২০০৯ পর্যন্ত সারা দেশের মাত্র ২ শতাংশ জমি সরকারিভাবে 'উদ্বৃত্ত' ঘোষিত হয়েছে এবং দেশের মোট চাষযোগ্য জমির *মাত্র ১ শতাংশ* পুনর্বন্টিত হয়েছে (পৃ. ৪৩)।

অথচ ১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন :

> "ভূমি সংস্কার হলো সবচাইতে নির্ণায়ক পরীক্ষা। টিকে থাকার জন্য আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য এবং জার সাম্রাজ্য ভূমি সংস্কার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল এবং তাদের উভয়েরই পতন ঘটেছে।"

ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, দেশের মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ১ শতাংশ ভূমিসংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে বন্টন করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরা ও 'তাদের রাজনৈতির ব্যবস্থা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো এবং নিজেদের পতন আটকালো।

কীভাবে, কী কারণে তা ঘটলো, এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। তাই আমরা সে আলোচনায় প্রবেশ করছি না। তবে এটা স্পষ্ট যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যা ঘটলো, তারই সাথে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবাংলার ভূমিসংস্কারও এগোলো।

পশ্চিমবাংলার ভূমিসংস্কারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এখানেই নয় যে, যা বণ্টিত হবার কথা ছিল, তার সিকিভাগ মাত্র বণ্টিত হয়েছে। তার চেয়েও উদ্বেগজনক দিক হল এই যে, সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যখন তাদের ভূমিসংস্কারের জয়ঢাক পেটাচ্ছে এবং তার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে বিশাল মাপের পরিবর্তনের গালগপ্পো ফেরি করছে, তখন দেখা যাচ্ছে :

> (ক) "অতি সাম্প্রতিক অতীতের উদ্বেগজনক বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে ভূমিহীনতার দ্রুততম বৃদ্ধি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের অনুপাত যেখানে ১৯৮৭-৮৮ সালে ৩৯.৬ শতাংশ, ১৯৯৩-৯৪ সালে তা বেড়ে হয় ৪১.৬ শতাংশ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯.৮ শতাংশ। অন্য কথায়, এই দশকের শেষে পশ্চিমবাংলায় *গ্রামীণ পরিবারগুলির প্রায় অর্ধেক ভূমিহীন* (*পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট* ২০০৪, পৃ. ৩৯, গুরুত্ব আরোপ আমাদের)।
>
> (খ) "কৃষি শ্রমিকরা রয়ে গেছেন জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশ। তাদের দারিদ্রের হার সবচাইতে কম হ্রাস পেয়েছে। এমনকি ১৯৯৯-২০০০ সালেও এ ধরনের পরিবারের প্রায় অর্ধেক *চরমতম দরিদ্র*" (*ঐ*, গুরুত্ব আরোপ আমাদের, পৃ. ৮১)।
>
> (গ) "কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলি *অর্ধেকেরও* বেশি নিরক্ষর। এই পরিবারগুলি *দুই-তৃতীয়াংশ* মহিলাও নিরক্ষর" (*ঐ*, গুরুত্ব আরোপ আমাদের, পৃ. ১৪৯)।

স্বাভাবিকভাবেই, এই তথ্যগুলো বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে দিচ্ছে।

আমরা যে আলোচনাটি শুরু করেছিলাম, যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলছিলাম, তার অন্যতম ছিল গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে যে ধরনের জমিদার-জোতদার চোখে পড়ত, এবং যাকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত, তা বর্তমানে বিরল প্রজাতি। কিছুটা আকারে ও প্রকৃতিতে নিজেদের পরিবর্তিত করে তারা আজও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান।

অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে মাহিন্দার-মুনিষ-কামিনের যে প্রথাটি আমরা আগে দেখতাম, তাও বর্তমানে বহুলাংশেই অনুপস্থিত। আমরা এ ধরনের বন্ধন দেখতেও অভ্যস্ত ছিলাম যে, যেখানে একটি বড় জমির মালিক পরিবার, জোতদার পরিবারের কাছে একটি গ্রামীণ মজুর পরিবার বছরের পর বছর বাঁধা পড়ে আছে। এক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যটি আছেন মাহিন্দর হিসেবে, তার স্ত্রী আছেন কামিন হিসেবে। পুরুষ সদস্যটি মূলত চাষবাসের সাথে যুক্ত, মহিলা সদস্যটি গৃহস্থালির নানান কাজকর্ম, অবশ্যই ছোঁয়াচ বজায় রেখে, করেন আর তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা রাখালের কাজ করে।

বর্তমানে এ ধরনের বন্ধনগুলো অনেকাংশে শিথিল হয়ে গেছে। আপেক্ষিক অর্থে গ্রামীণ মজুরদের জোতদার-মহাজনদের ওপর অধীনতার পরিমাণ কমে গেছে। এই অধীনতা কমার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ বাড়া, কাজের জন্য গ্রামের বাইরে যাওয়া, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের পরিযায়ী চরিত্রও দেখা গেছে। কাজের সন্ধানে জেলার অন্যত্র, রাজ্যের অন্যত্র, এমনকি ভিন রাজ্যেও পাড়ি জমাচ্ছে যুবকরা। এক কথায়, গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে সচলতার পরিমাণ বেড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খেতমজুরদের মজুরি বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধি আন্দোলনের কারণে নয়, চাহিদা-যোগানের কারণে।

একইভাবে উৎপাদন উপকরণের ক্ষেত্রে নিশ্চলতা, চাষের ধরনে একই পদ্ধতির বছরের পর বছর ফিরে ফিরে আসায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে।

চাষের উৎপাদন উপকরণে প্রথাগত উপকরণকে সরিয়ে দিচ্ছে নতুন নতুন উপকরণ। সেচের ক্ষেত্রে ঢোঙা, সিমনিকে হটিয়ে দিয়ে পাম্প এসেছে। এক্ষেত্রে ডেলিভারি পাইপের সাহায্যে জলের উৎস থেকে দূর-দূরান্তে চাষ সম্ভাবপর করে তুলেছে। ভুতমুড়ি, কমলকাটি, সীতাশালের মতো সাবেকি

ধানকে সম্পূর্ণভাবেই সরিয়ে দিয়েছে উচ্চফলনশীল বীজ। রাসায়নিক সারের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। নির্দিষ্ট বীজের রোগ সারাবার জন্য নির্দিষ্ট কীটনাশক ঔষধ বাজারে হাজির হয়েছে। ধান ঝাড়ার ক্ষেত্রেও প্রথাগত পদ্ধতির জায়গা দখল করে নিয়েছে ধান ঝাড়ার মেশিন। সেক্ষেত্রেও শারীরিক পরিশ্রম লাঘবের স্বার্থে বিদ্যুতের ব্যবহারও হচ্ছে।

চাষের ক্ষেত্রে নিজের ভোগের জন্য যেমন তা করা হচ্ছে, আবার কোন এক অজানা বাজারে অচেনা ক্রেতার কাছে অনির্ধারিত দামে বিক্রি করার জন্য উৎপাদনও হচ্ছে। বাণিজ্যিক চাষ বিরাট মাত্রায় হচ্ছে।

আবার এ ধরনের চাষের সাথে এসে হাজির হয়েছে অন্য এক ধরনের সমস্যা। ২০০৮ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ৪২ শতাংশ কৃষক চাষ-আবাদ আর করতে চাইছেন না। চাষ করতে গিয়ে যা খরচ হচ্ছে, তা হয় উঠে আসছে না অথবা উঠলেও লাভজনক থাকছে না। কিন্তু বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার কারণে তারা কৃষি কাজ থেকে নিজেদের বিযুক্তও করতে পারছেন না।

পশ্চিমবাংলাতেও আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। পশ্চিমবাংলায় যাদেরকে চাষের সমস্ত কাজ ভাড়া করে, মজুর খাটিয়ে করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে চাষ-আবাদ বজায় রাখা সমস্যাসংকুল হয়ে উঠেছে। আবার তারা বর্গা প্রথাতেও যেতে পারছে না, সেক্ষেত্রে আছে বর্গা রেকর্ডের ভীতি।

স্বভাবতই, হয় জমির মালিকানা, উৎপাদনের উপকরণ ও পুঁজি ভালো পরিমাণে থাকতে হবে অথবা গায়-গতরে কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে, লাঙ্গল-বলদ থাকবে, তারাও লাভজনকভাবে চাষ করতে পারবে।

এসব পরিবর্তনের মধ্যেও পশ্চিমবাংলায় গুরুত্বপূর্ণভাবে রয়েছে বর্গাপ্রথায় চাষ। সিপিএম-এর হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার (সূত্র : *কোন্ পথে পশ্চিমবঙ্গ*, পৃ. ২০)। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এই সংখ্যা ৩০-৩৫ লক্ষের মধ্যে। আমরা জানি যে, *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট* ২০০৪-এ মন্তব্য করা হয়েছিল : ''পশ্চিমবাংলার ১৩.২৩ শতাংশ পাট্টাদার এবং ১৪.৩৭ শতাংশ বর্গাদার তাদের পাট্টা ও বর্গাস্বত্ব ধরে রাখতে সমর্থ হননি। এটা গোটা রাজ্যের গড় হিসাব। কিন্তু জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উঃ দিনাজপুর এবং দঃ দিনাজপুরে যথাক্রমে ৩১.৬০, ৩০.৯০, ৩১.৪৯ এবং ৩০.৭৩ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে গেছেন। উঃ দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর এবং দঃ ২৪ পরগনায় যথাক্রমে ২২.৩৫, ১৯.১৭ এবং ২২.০৭ শতাংশ পাট্টাদার জমি হারিয়েছেন।''

এই পাট্টা ও বর্গাস্বত্ব হারানোর ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে সিপিএম-এর মধ্যস্থতায় বোঝাপড়ার মাধ্যমে। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার পর পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় পাট্টাদার ও বর্গাদাররা উচ্ছেদ হচ্ছেন।

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় বর্গাপ্রথায় জমির পরিমাণ কত, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাতে না থাকলেও এটুকু জোরের সাথেই বলা যায় যে, এই সামন্ততান্ত্রিক প্রথাটি গুরুত্বপূর্ণভাবেই পশ্চিমবাংলা গ্রামাঞ্চলে উপস্থিত রয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় একটানা ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকলো। অথচ বর্গাদারদের জমির মালিকানা-স্বত্ব দেবার বিষয়ে প্রাথমিক উদ্যোগটুকুও তারা গ্রহণ করলো না।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে, এই বিবেচনায় বলছি, পরাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ভূমিসংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৩৮ সালে ৫ নভেম্বর ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করে কমিশন গঠন করে। প্রাদেশিক কৃষক সভা সেই কমিশনের কাছ স্মারকলিপি দিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, সভা ''বড় জমির মালিক জমিদার ভূস্বামীদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেবার যুক্তির সরাসরি বিরোধিতা করে। আমরা এটা মানতে পারি না। ...ব্যাপক অংশের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা বলতে চাই, জমির পুরো স্বত্ব চাষীদেরই দিতে হবে— প্রকৃত যারা চাষ করে তাদের হাতে।''

''জমির পুরো স্বত্ব চাষীদেরই দিতে হবে— প্রকৃত যারা চাষ করে তাদের হাতে''— এটিই প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিকে দূর করার বৈপ্লবিক পথ।

সিপিএম সে পথে হাঁটলো না। ঠিকভাবে বললে, তার পক্ষে হাঁটা সম্ভবও ছিল না।

ফলত, সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর 'সমসাময়িক পশ্চিমবাংলার কৃষি সম্পর্ক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> ''পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্কার উত্তর পর্বে *গ্রাম্যধনীর এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে*। এই অংশগুলো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে রয়েছে। বৈষম্যের সার্বিক স্তরে খুব বেশি হ্রাস ঘটেনি। ভূমিসংস্কার উত্তরপর্বে মহাজনির পুরনো ধরনের অবক্ষয় ঘটেছে। কিন্তু *সেই শূন্যস্থান ভরাট করে দিয়েছে নতুন ধরনের মহাজনরা*। গ্রামীণ পশ্চিমবাংলায় উৎপাদনের জন্য ঋণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবসায়ীদের উদ্ভব হয়েছে। এরা ধারে কৃষি উপকরণ দেয়। *এই ধরনের ঋণের সাথে ঐ একই ব্যবসায়ীর কাছে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার শর্ত যুক্ত থাকে, প্রায় ক্ষেত্রেই তার দাম বাজারের দামের চাইতে কম থাকে*'' (গুরুত্ব আরোপ আমাদের)।

সূর্যবাবুর 'ভূমিসংস্কার উত্তর পর্ব' শুনলে মনে হয়, তাঁরা ভূমিসংস্কারের কাজ সমাপ্ত করেছেন। আবার তাঁদের সেই ''উত্তর পর্বে'' ''গ্রাম্য ধনীর এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব'', ''নতুন ধরনের মহাজন'', ''বাজারের দামের চাইতে কম'' দামে তাকেই বিক্রি করার ''শর্তে'' ঋণ দান— এ সবই সূর্যবাবুদের ভূমিসংস্কারের প্রকৃত চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সিপিএম-এর প্রয়াত নেতা হরকিষণ সিং সুরজিৎ বলেছিলেন— "বর্তমান সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে ভূমি সংস্কারের কাজ মোটামুটি রূপায়িত হয়েছে" (*দি মার্কসিস্ট*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)।

সেদিন আমরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলাম— এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে, যেখানে সম্পত্তির অধিকার মৌল অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়, যেখানে জমিদার শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, সেখানে জোতদাররা নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় নিজে সই করছে, একথা ভাবা কোনভাবেই কি সম্ভব?

এক দশক পর ২০০২ সালে সূর্যকান্ত মিশ্র এবং বিকাশ রাওয়াল "সমসাময়িক পশ্চিমবাংলার কৃষি সম্পর্ক ও বামপন্থীদের কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

"এটা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিমবাংলার ভূমিসংস্কার হচ্ছে সীমাবদ্ধ সংস্কারের এক কর্মসূচী, যা উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এটা উৎপাদনের প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বোঝাকে পরিপূর্ণভাবে দূর করতে পারে না।

"ভূমি সংস্কার উৎপাদন সম্পর্কের সীমাবদ্ধ মাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ....প্রাক পুঁজিবাদী শৃংখল নানান রূপে বিরাজ করছে (ভি. কে. রামচন্দ্রন এবং মধুরা স্বামীনাথন সম্পাদিত *কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন*, পৃ. ৩২৯)।

আমরা ১৯৬৭ সাল থেকেই ভারতীয় কৃষির চরিত্রায়ণ করতে গিয়ে আধা-সামন্ততন্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত করে এসেছি। পরবর্তী ৪৫ বছরে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলা তথা গোটা ভারতের গ্রামাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে; কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। তা শুধু সঞ্চালনে (circulation) নয়, উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও দৃশ্যমান। কৃষি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত কৃষিতে পুনর্বিনিয়োগ ঘটছে। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ উপর এবং নীচ দুদিক থেকেই ঘটছে। অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতিও ঘটেছে।

কিন্তু আমরা এসব পর্যবেক্ষণ রাখছি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে যে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি প্রবলভাবেই বিদ্যমান। ভারতবর্ষের কৃষিতেও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ শক্তিশালীভাবেই রয়েছে।

সাধারণভাবে ভারতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ একটা সময়পর্ব গেছে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নী পর্ব।

এ দুটি পর্বকে নানান দিক থেকেই সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করা যায়। যেমন, কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ। প্রথম পর্বে যা ছিল, দ্বিতীয় পর্বে ভালোমাত্রায় কমেছে। প্রথমপর্বে ভারতীয় কৃষি সাম্রাজ্যবাদের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশে উৎপাদিত পণ্যের কাছে যে মাত্রায় ও পরিমাণে উন্মুক্ত ছিল, দ্বিতীয় পর্বে তার মাত্রা ও পরিমাণ বিরাটমাত্রায় বেড়ে গেছে। এই বিষয়টিকে অন্য একটি উদাহরণ দিয়েও সহজেই বোঝা যায়। গড়ে উঠেছে 'কৃষিতে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ জ্ঞান উদ্যোগ' নামক এক সংস্থা। এর পরিচালক সংস্থায় যেমন রয়েছেন ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিরা, তেমনি রয়েছেন মনসেন্টো, মিডল্যান্ডস-এর মতো কৃষি ব্যবসার দানব মার্কিন সংস্থা, আছে খুচরো ব্যবসার অপর এক দানব সংস্থা ওয়ালমার্ট-এর প্রতিনিধিরা। অবশ্যই সঙ্গত কারণেই এই পরিচালক সংস্থায় বিলকুল অনুপস্থিত ভারতীয় কৃষকের কোন প্রতিনিধি।

আমরা দুটি পর্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। সেটি হলো— ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন।

প্রথম পর্বে আমরা শুনতাম ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন। যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতো ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের মধ্যে জমি বণ্টন এবং সেই জমি নেওয়া হত বা নেওয়ার কথা বলা হতো জমিদারদের কাছ থেকে। তার জন্য জমির ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা ধার্য করা হল।

নকশালবাড়ী পরবর্তী সময়পর্বে গোটা দেশ জুড়ে যে আলোড়ন গড়ে উঠলো, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রামের তাপে-উত্তাপে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠলো, তা ভারতীয় শাসনশ্রেণীকে সন্ত্রস্তকরে তুললো। শুরু হল, শাসকশ্রেণীর রাইফেল আর বাইবেল, চাবুক আর বিস্কুটের পলিসি— নৃশংস নিপীড়ন এবং সংস্কারের পলিসি।

সেই সময়ে, গত শতাব্দীর সত্তর দশকের অব্যবহিত আগে বা পরে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক বারবার ডাকতে হয়েছে। এই রকমই এক অধিবেশনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন বলেন বা বলতে বাধ্য হন : "সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যদি *সামাজিক বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লব* না হয়, আমি আশঙ্কা করি, সবুজ বিপ্লব আর সবুজ থাকবে না— এটা সময়ের দাবি" (গুরুত্ব আরোপ আমাদের)।

যাঁরা প্রথম সময়পর্বে সময়ের দাবি হিসেবে সামাজিক বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লবের কথা বলেছিলেন এবং সেটাও এই আশংকা থেকে যে তাদের 'সবুজ বিপ্লব আর সবুজ থাকবে না', সেই চ্যবনদের উত্তরসূরীরাই এখন 'বাজারভিত্তিক ভূমিসংস্কার'-এর মন্ত্র আওড়াচ্ছেন।

'বাজারভিত্তিক ভূমিসংস্কার'— এই শব্দবন্ধগুলো ষোলআনাই উদ্ভট। ভূমি সংস্কার ষোলআনাই সরকারি উদ্যোগ এবং নীচের গণআন্দোলনের-শ্রেণীসংগ্রামের ফসল। এক্ষেত্রে বাজার ষোলআনাই অপ্রাসঙ্গিক।

আসলে বাজারভিত্তিক ভূমিসংস্কার-এর ধারণা বিশ্বব্যাংকের ধারণা। এই ধারণার প্রকৃত অর্থ ভূমি সংস্কারের উল্টো যাত্রা। প্রথম পর্বে ভূমিসংস্কারের জন্য, জোতদার-জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের জমি দেবার জন্য

যে আইন রচিত হয়েছিল, তাকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়ে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে, তাদের প্রয়োজনে, নতুনভাবে ভূমিসংস্কার আইন তৈরি করা হচ্ছে। এ কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এ রাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তার প্রচেষ্টা চলেছিল, তৃণমূল সরকার সেই পথেই হাঁটছে।

কৃষি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের মতো দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নটিকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতেই হবে। আমাদের মতো দেশগুলোতে প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলোকে রক্ষা করা ও ক্ষয় ঘটানোর সাম্রাজ্যবাদী পলিসিকে বিবেচনায় রাখতেই হবে। এই কথাগুলো দ্বিতীয় পর্বের ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নী পর্বে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক।

একইভাবে ভারতের ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলে ও কৃষি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় জাতি-বর্ণগত বৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনার নানান রূপগুলি সম্পর্কেও গুরুত্ব দিতেই হবে।

পশ্চিমবাংলাতে এখনও জাতিবর্ণগত বৈষম্য ও সামাজিক বঞ্চনা নানান রূপে বিদ্যমান। নানান মাত্রায় ক্ষয় ঘটলেও আজও দুর্গাপূজা উচ্চবর্ণের মানুষদের পূজা এবং মনসা পূজা তথাকথিত নিম্নবর্ণের পূজা হিসেবেই থেকে গেছে। এবং এই জাতিবর্ণগত বৈষম্য গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী ও স্তরগুলোর মধ্যে নানান মাত্রায় অধীনতার সম্পর্কও গড়ে তোলে।

এসবের সাথে গ্রামীণ বিত্তবানদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রাধান্যের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য, অস্পৃশ্যতা, গ্রামীণ গরিব মানুষদের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে বিরাটমাত্রায় নিরক্ষরতা প্রভৃতি উপাদানগুলি কৃষি-মজুর এবং কৃষিমজুর নিয়োগকর্তার মধ্যকার সম্পর্ক এক অবাধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান গ্রামাঞ্চলে যাঁরা বড় জমির মালিক, যাঁরা বর্গায় বা মজুর লাগিয়ে চাষ করেন, যাঁদের কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ ধনী কৃষকের চাইতে উন্নততর এক জীবনমানকে নিশ্চিন্ত করে, যারা আধুনিক উৎপাদন উপকরণের মালিক হয়েছেন, নিজের প্রয়োজন ছাড়াও সেসব উপকরণ ভাড়াতেও খাটাচ্ছেন, সেইসব পরিবারগুলির মধ্যে এমন বিকাশও দেখা যাচ্ছে যারা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অন্যদের ধারে দিচ্ছে এবং আবার তারাই উৎপাদিত ফসলের ওপরও নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে। অন্যদের পূর্ব-নির্ধারিত দামে তাকেই বিক্রি করে দিতে হচ্ছে।

এই স্তরটির গ্রামীণ জীবনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানান মাত্রায় আধিপত্য রয়েছে। এরই পাশাপাশি রাজ্যের সরকারি ক্ষমতা যাদের দখলে, সেই দলের কর্মীদেরও গ্রামীণ ক্ষেত্রে এক ধরনের আধিপত্য দেখা গেছে। পঞ্চায়েতগুলোর হাতে যেহেতু নানান সুযোগ-সুবিধা আছে, সে কারণে গ্রামীণ মানুষদের বিশেষভাবে গরিব মানুষদের, এ ধরনের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের আদেশে-নির্দেশে-অনুরোধে-উপরোধে সঙ্গ দেওয়া, মিছিল-মিটিং-এ সামিল হওয়ার প্রবণতাও দেখা গেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিবিশেষ গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আমরা গত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষ বছরগুলোতে বা সত্তর দশকের প্রথমার্ধে গ্রামীণ দারিদ্র্যের যে তীব্রতা দেখেছি, তা বর্তমানে কিছুটা পরিমাণে কমেছে। কিন্তু এখনও গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে দারিদ্র ভালোমাত্রাতেই বিরাজ করছে, আবার বহুক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলে যাদের সরকারি দান-অনুদান-খয়রাতি পাইয়ে দেবার ক্ষমতা আছে তাদের ওপর নির্ভর করার মানসিকতাও এই দরিদ্র অংশের মানুষদের মধ্যে ভালোমাত্রাতেই আছে।

সিপিএম তাদের ভূমিসংস্কার ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে যত কথাই বলুক না কেন, বাস্তবতা হলো যেমনটি যথাযথভাবে বলেছিল 'পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪':

> "কৃষি মজুররা জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশ হিসেবে রয়ে গেছেন এবং তাদের মধ্যে দারিদ্রের মাত্রা সব চাইতে কম হারে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি ১৯৯৯-২০০০ সালেও কৃষি মজুর পরিবারের প্রায় অর্ধেক চরম দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন।"

যদিও মানব উন্নয়ন রিপোর্টে উল্লেখিত তথ্যগুলো ২০০০ সালের, তারপর ১২ বছর সময় পেরিয়ে গেছে, তাহলেও এইটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পরবর্তী ১২ বছরে কৃষি মজুরদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

কৃষি মজুরদের এই দারিদ্র বামফ্রন্টের ভূমিসংস্কারের চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। বিষয়টি অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে।

সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অন্যতম দাবি ছিল :

(১) "রাজ্যে সেচ ক্ষমতাযুক্ত জমির অনুপাত ১৯৭৭-৭৮ সালে ৩২ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ সালে ৭২ শতাংশকে অতিক্রম করে।

(২) "উন্নত বীজের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে, ১৯৭৭-৭৮ সালে চাষের জমির যে অনুপাত ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ, তা ২০১০-১১ সালে পৌঁছয় ৯৮ শতাংশে।

(৩) "কৃষিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করার সূচকের ভিত্তিতে, সমগ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উন্নীত হয় দ্বিতীয় স্থানে, পাঞ্জাবের ঠিক পরেই।

(৪) "এ রাজ্যে চালের মোট উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন (তখন পশ্চিমবঙ্গ ছিল ঘাটতি রাজ্য) থেকে ১০০ শতাংশেরও অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরগুলিতে গড়ে ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টনকে অতিক্রম করে (এবং চালের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উন্নীত হয় উদ্বৃত্ত রাজ্যে)" (সূত্র : *কোন্ পথে পশ্চিমবঙ্গ*, বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত)

তথ্যগুলোর বাস্তবতা নিয়ে আমরা এক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন তুলছি না। আমরা যে প্রশ্ন তুলতে চাইছি তা হলো— ৩৪ বছরের সময়কালে বামফ্রন্ট তার উপরোক্ত সাফল্য সত্ত্বেও জমির উর্ধ্বসীমাকে কেন ১৯৭২ সালেই আটকে রাখলো? কেন জমির উর্ধ্বসীমাকে কমানোর জন্য সামান্যতম উদ্যোগও গ্রহণ করলো না?

আসলে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতা দখলের কয়েক বছরের মধ্যে সিপিএম বর্তমান সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থা রক্ষায় এমনভাবে ভূমিকা পালন করলো, যার পক্ষে জমির উর্ধ্বসীমা সংশোধন করার মতো বর্তমান সংবিধানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণও সম্ভবপর হল না।

গ্রামাঞ্চলে বর্গাপ্রথার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে বিপরীতমুখী বর্গার উল্লেখও দরকার।

চাষের খরচ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে নিজেদের জমি নির্দিষ্ট ফসলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি পাট্টাদার তার পাট্টা পাওয়া ডাঙ্গা জমি অন্যকে লিজে দিয়ে দিচ্ছে, যারা এ জমিতে সবজি চাষ করছে। একইভাবে ডাঙ্গাজমি এই শর্তে নেওয়া হচ্ছে, সেখানে ইউকিলিপটাস গাছ লাগানো হবে। গাছ বেড়ে কাটার মতো হলে প্রথম বছর ৫০:৫০ ভাগে, দ্বিতীয় বছর জমির মালিক ৬০ এবং ৪০ ভাগ যিনি গাছ লাগিয়েছেন তিনি পাবেন। তার পরের বছর ৭০:৩০-এ ভাগ হবে। মাছ চাষেও অনুরূপ পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুকুরের মালিক মালিকানা সুবাদে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাচ্ছেন এবং প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ খাবার জন্য পাচ্ছেন।

এই বর্ণনার গুরুত্ব এখানেই যে, পুকুর হতে পারে, ডাঙ্গা জমি হতে পারে, সব ক্ষেত্রগুলোকেই উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহারের একটি আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা বাণিজ্যিকভাবেই হচ্ছে।

একইভাবে মহাজনি ঋণ হোক বা খেতমজুরের মজুরি হোক ফসলে তা দেওয়ার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। আগে মহাজন ১ মন ধান ধার দিত, ধার শোধ করতে হতো ফসলেই। ১ মনের কারণে ২ মন। একইভাবে বর্তমানে ধানে মজুরি দেওয়ার প্রথার বদলে নগদ টাকায় দেওয়ার প্রথাই সার্বিক চেহারা নিতে চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কারণে ব্যাংক এবং সমবায় থেকে ঋণদানের পরিমাণ যেমন যেমন কমেছে, তেমন তেমন জায়গা দখল করছে মহাজনি ঋণ। এক্ষেত্রেও মহাজনি ঋণের অস্তিত্ব যেমন বাস্তব, তেমনি এটাও সমান বাস্তব যে, মহাজনি ঋণের মালিক-মহাজনদের যে চেহারায়, যে ভূমিকায় আমরা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেখেছি, এক্ষেত্রে সেই ভূমিকাতেও পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছুটা লঘু করে যদি প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে বলি 'অর্থনীতি বহির্ভূত দমন-পীড়নের বদলে অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত দমন-পীড়ন' তার জায়গা নিচ্ছে।

এক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহাজনি ঋণকে সংকুচিত করতে কিছুটা পরিমাণে হলেও ভূমিকা রাখছে।

আমরা বিগত ষাট বছরে যে দুটি পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষি গেছে এবং যাচ্ছে, তার বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর ভূমিসংস্কার এবং সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্কারের বর্ণনা দিয়েছি। আমরা ১৯৯১ সাল থেকে যে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের হাত ধরে উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ চলছে তারও উল্লেখ করেছি।

এই সমস্ত আলোচনা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিসংস্কার প্রধানত জমিদারদের সংস্কার করেছে। সিপিএম-এর ভূমিসংস্কার প্রধানত যাদের স্বার্থে এই সংস্কার, তাদের বিরাট অংশকে স্পর্শ করতেই পারলো না। আর বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের সময় যে 'বাজারভিত্তিক ভূমিসংস্কার' এবং দেশের কৃষিকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেবার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা ভিন্নরূপে আমাদের দেশকে ঔপনিবেশিক সময়কালের পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই নানান নামে চুক্তি চাষ শুরু হয়েছে।

আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র ও আধা-সামন্ততন্ত্রকে কিছুটা পরিবর্তিত করে ওপর থেকে পুঁজিবাদ বিকাশের যে উদ্যোগ শাসকশ্রেণীরা গ্রহণ করে চলেছে, তার সীমাবদ্ধতাও অতি স্পষ্ট। একইভাবে স্পষ্ট বর্তমান সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যেও যে সংস্কার করা সম্ভব ছিল, তা করতে সিপিএম-এর মতো একটি দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ নীচু থেকে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে অর্গলমুক্ত করার ক্ষেত্রে সিপিএম-এর সচেতন নেতিবাচক সিদ্ধান্ত।

পশ্চিমবাংলার সাথে পাঞ্জাবের ও বিহারের যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। এই বৈসাদৃশ্যের একটি দিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র জোতের বিরাট পরিমাণ প্রাধান্য, তেমনি অন্য একটি দিক হচ্ছে বিশাল পরিমাণের জমির মালিকের অনুপস্থিতি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমবাংলায় জমির দাবিতে আন্দোলন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবাংলায় নির্দিষ্ট অবস্থায় আধা-সামন্ততন্ত্র যে চেহারা নিয়ে বর্তমানে বজায় রয়েছে, যেভাবে প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বহাল রয়েছে, যেভাবে জাতপাতগত বৈষম্য ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধেই গড়ে উঠবে কৃষক আন্দোলন।

অবশ্য তারই সাথে বর্তমানে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

আমরা দৃঢ় ভাবেই মনে করি যে, কৃষি প্রশ্নই হচ্ছে ভারতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্ন এবং কৃষি বিপ্লব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষ হিসেবেই বিদ্যমান। সেই বিপ্লবের সফল সমাপ্তিই কৃষি ও কৃষক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য কোন বিকল্প নেই।

ভারতীয় কৃষি

ভারতে পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশ ও বর্তমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব নির্মাণে ভুলের বৌদ্ধিক উৎস

অভিনব সিংহ

ভূমিকা

ভারতীয় কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রশ্নটি অনেক দিন ধরেই মার্কসবাদী অ্যাকাডেমিকদের মধ্যে ও কমিউনিস্ট বিপ্লবী শিবিরে একটা বিতর্কের বিষয়। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও বেশ কিছু মার্কসবাদী পণ্ডিত (অমিত ভাদুড়ি, টি নাগি রেড্ডি, কে বালাগোপাল, ডি ভেঙ্কটেশ্বর রাও, প্রধান এইচ প্রসাদ ইত্যাদি) ও বেশির ভাগ এম-এল বিপ্লবী পার্টি/সংগঠন/গ্রুপ ভারতের সামাজিক সংগঠনকে প্রধানত আধা-সামন্ততান্ত্রিক মনে করেন। তাঁদের মতে, যেসব কারণে ভারতের সামাজিক গঠনকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক মনে করার সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় সেগুলি হলো জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য, ব্যাপক বর্গাচাষ, উৎপাদিকা শক্তির পিছিয়ে থাকা অবস্থা, মহাজনি পুঁজির আধিপত্য, এবং অনেকে আবার আধা-সামন্ততন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে সামাজিক জীবনে জাতি-ধর্ম সচেতনতার প্রাধান্যেরও উল্লেখ করেন। তবে এ ধরনের বিশ্লেষণ অনেক সময় মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশেষ ধরনগুলির পবিত্রতা রক্ষা করে না বা সেগুলিকে খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করে। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশের ওপর তাঁর চমৎকার রচনাটিতে লেনিন দেখিয়েছেন, যে তথ্যকে নারোদনিকরা রাশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদ নেই প্রমাণ করার কাজে লাগিয়েছিল, সেই একই তথ্যকে কীভাবে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ দেখাতে কাজে লাগানো যায়, এবং কীভাবে রাশিয়ার গ্রামগুলির কৃষক অর্থনীতিতে যে তথাকথিত সাম্যভিত্তিক নিয়ম চলে তার কারণে এবং রাশিয়ার কৃষকদের সমসত্ত্ব ধরনের/বিভিন্নতাবিহীন চরিত্রের কারণে কীভাবে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের স্তরটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। লেনিন আরও বলেছিলেন যে, কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের জটিলতার ফলে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের মতে, ভারতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বায়ন প্রধানত সেরকম বিভ্রান্তিরই ফসল। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কাঠামোর যেসব মৌলিক বিষয়গুলি স্থির করে দেয় কোনো একটি সামাজিক গঠন (ফর্মেশন) আধা-সামন্ততান্ত্রিক কি পুঁজিবাদী, সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। তারপর আমরা গ্রামীণ ভারতে উৎপাদন সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার উপায়গুলির বিষয়ে অর্থনৈতিক প্রমাণাদির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব— যার মধ্যে থাকবে আদিম সঞ্চয় ও ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন, দেশীয় বাজার তৈরি ও কৃষিতে মজুরি-উপার্জনকারী শ্রেণীর প্রশ্ন, বর্গার প্রশ্ন, মহাজনি পুঁজি ও গ্রামীণ ঋণকাঠামোর প্রশ্ন, ভূমি খাজনার চরিত্র, ভূমি সম্পত্তির চরিত্র ও বিকাশের প্রশ্ন, ভূমিদাস/বেগার/আবদ্ধ শ্রমের প্রশ্ন, এবং বাজারের জন্য/ভোগের জন্য উৎপাদনের প্রশ্ন।

মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো এবং বর্তমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বায়নের ভুলের নয়া-নারদনিক-সিসমন্ডীয় উৎস—

আদিম সঞ্চয় ও তার ফলাফল

মার্কস তাঁর *পুঁজি, ৩য় খণ্ডে* কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী ভূমিখাজনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। তার পরে যাব এ বিষয়ে কাউটস্কি ও লেনিনের বক্তব্যে। মার্কসের মতে, সম্পত্তি-সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার পদ্ধতিই উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ধারণ করে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সারবস্তু প্রকাশিত হয় সামন্ততান্ত্রিক খাজনায়। সামন্ততান্ত্রিক খাজনা শ্রম, বা দ্রব্য বা অর্থ রূপে থাকতে পারে। অর্থমূল্যে খাজনা এসেছিল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার শেষের দিকে, কারণ অর্থ সঞ্চলন ও বাজার ব্যবস্থার বেশ খানিকটা বিকাশ হওয়ার পর তবেই তা হতে পারে। অর্থমূল্যে খাজনা কৃষককে খানিকটা স্বাধীনতা দিয়েছিল— উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে সে এখন পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু, মার্কস পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন, যতদিন *জমিদার-ভূমিদাস সম্পর্ক* থাকবে, যতদিন কৃষি শ্রমিক আবদ্ধ থাকবে, যতদিন *সামন্ত প্রভু* টাকায়, দ্রব্যে বা শ্রম রূপে *খাজনা আদায় করবে*; যতদিন উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না কৃষকের; যতদিন ভূমিদাস/বর্গাচাষি/কৃষক উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; যতদিন সামন্ত প্রভু প্রকৃতপক্ষে আংশিক রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করবে, আইন তৈরি, তাকে লাগু করা ও বিচার করার ক্ষমতা সহ; যতদিন কৃষকের অর্থনীতি-বহির্ভূত শোষণ চলতে থাকবে; এবং উৎপাদন হবে মূলত কৃষক পরিবারের নিজের ভোগের জন্য আর উদ্বৃত্তটা বিনিময়ে কিছু না পেয়েই ভূস্বামীকে সমর্পণ করতে হবে; ততদিন যে কোনো রূপের খাজনাই (এমনকি টাকার রূপে খাজনাও) থেকে যাবে সামন্ততান্ত্রিক খাজনা; প্রধান উৎপাদন সম্পর্কটিও থেকে যাবে সামন্ততান্ত্রিক। মার্কস আরও বলছেন যে, পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের জন্য প্রধান শর্ত হলো *কৃষি-সর্বহারা তৈরি হওয়া*। এই শ্রেণীর গ্রামীণ মজুরি-শ্রমিক তৈরি হয় *আদিম সঞ্চয়ের* প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যেটি আবার একই সঙ্গে পুঁজির জন্য একটা *দেশীয় বাজারও* তৈরি করে। দেশীয় বাজার তৈরি হয় কারণ শ্রমশক্তি নিজেই একটা পণ্য হয়ে যায়, সামন্ততন্ত্রের অধীনে কৃষকদের ভোগের জন্য যে সম্পদ

ছিল সেগুলি এখন বিক্রির জন্য মুক্ত, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, আর তাই সেগুলি এখন কেনাবেচা করতে হবে, আর উৎপাদন এখন হবে মুনাফার জন্য, বাজারের জন্য। আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটি বিশদে বর্ণনা করেন মার্কস এবং দেখান যে ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, ভূমিদাস ও সামন্ততান্ত্রিক প্রজাচাষিরা কীভাবে মাতায়ার (আধা-কৃষক) ও সাধারণ পণ্যোৎপাদক হওয়ার মধ্যবর্তী স্তরের মধ্য দিয়ে কীভাবে পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামী, পুঁজিবাদী প্রজা-কৃষক ও কৃষিমজুরে রূপান্তরিত হয়। স্থানাভাবে আমরা এখানে এই প্রক্রিয়াটির বিশদ বিবরণ দিতে পারছি না। উৎসাহী পাঠক বিশদ বিবরণের জন্য *পুঁজি* গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ড দেখে নিতে পারেন।

পুঁজিবাদী ভূমিখাজনার প্রশ্ন এবং নয়াউদারনৈতিক ও বর্তমান আধাসামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে কোথায় মিল

এর পর মার্কস *পুঁজিবাদী ভূমিখাজনার* রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যাডাম স্মিথের ভূমিখাজনার সংজ্ঞা মার্কস মেনে নেন, এবং দেখান যে রিকার্ডোর ভূমিখাজনার ধারণা আসলে উদ্বৃত্ত-মুনাফা, যা আসে বিভিন্ন খামারে উৎপাদনের অবস্থার বিভিন্নতা থেকে, আর সেই কারণে খাজনার এই 'ধরনটি' শিল্পেও থাকতে পারে; স্মিথের ধারণাটিকে মার্কস নাম দেন *অনপেক্ষ ভূমিখাজনা* (absolute ground rent), আর রিকার্ডোর ধারণাটির নাম দেন *বিভেদাত্মক ভূমিখাজনা* (differential ground rent)। কোনো একটি কৃষিক্ষেত্রে গড় উৎপাদনব্যয়ের চেয়ে কম উৎপাদনব্যয় ও গড় হারের চেয়ে বেশি মুনাফার হারের জন্য কৃষকদের যে বাড়তি মুনাফা হয় সেটাই হলো বিভেদাত্মক ভূমিখাজনা। শিল্পের (যেখানে উৎপাদনের গড় অবস্থাই গড় মুনাফা নির্ধারণ করে) বিপরীতে, কৃষিতে নিকৃষ্টতম ধরনের জমিই গড় মুনাফা নির্ধারণ করে। সেজন্য, নিকৃষ্টতম জমিওয়ালা খামারের চেয়ে ভালো জমি আছে এমন প্রতিটি খামারই বাড়তি মুনাফা পাবে, কারণ সাধারণ বাজারদর নির্ধারিত হবে নিকৃষ্টতম জমি দিয়ে। রিকার্ডোর যুক্তি এই যে, এই বাড়তি মুনাফাই খাজনার একমাত্র ধরন, যাকে *তিনি* খাজনা বলেন। ফলে, রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে, নিকৃষ্টতম জমি থেকে কোনো বাড়তি মুনাফা বা বিভেদাত্মক ভূমিখাজনা পাওয়া যাবে না। ফলে নিকৃষ্টতম জমিতে কেউ চাষ করবে না, কারণ কোনো পুঁজিবাদী ভূস্বামীই বিনে পয়সায় জমি দেবে না। কেবল খাজনার বিনিময়েই সে জমি চাষ করতে দেবে। অ্যাডাম স্মিথ, রিচার্ড জোন্স, এবং পরে মার্কস দেখান যে নিকৃষ্টতম জমিও চাষ হবে এবং তা থেকেও খাজনা পাওয়া যাবে। এই খাজনা হলো *অনপেক্ষ ভূমিখাজনা*। এটি আসে পুঁজিবাদে জমির মালিকানায় যে একচেটিয়া ব্যবস্থা থাকে তার থেকে। জমির উন্নতির জন্য ভূস্বামী যখন কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করে না, কোনো বাড়তি মুনাফা হয় না, এবং কোনো কৃষিকাজও হয় না (জমিটা জমির প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের কাজে লাগে, যেমন কাঠ, ঝর্ণা ইত্যাদি) তখনও এই (অনপেক্ষ) ভূমিখাজনা থেকে যায়। মার্কস দেখান যে রিকার্ডো এই ধারণা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ তিনি (রিকার্ডো) *মূল্য ও দামের মধ্যেকার*, এবং *উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার মধ্যেকার, তফাত* বুঝতেন না। তিনি (রিকার্ডো) ভেবেছিলেন যে পণ্যের বাজার-দামের মধ্যে যদি উৎপাদন ব্যয় [স্থির-পুঁজি + চল-পুঁজি + গড় মুনাফা (অর্থাৎ সমান করা উদ্বৃত্ত মূল্য)] ছাড়া আর কিছু ধরা হয় তাহলে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু মার্কস দেখান যে রিকার্ডোর ভীতির উৎস—দামই মূল্য— ছিল ভুল। তিনি (মার্কস) দেখান যে, পণ্যের বাজার-দাম হতে হবে উৎপাদন মূল্যের চেয়ে সেটুকু বেশি, যাতে ভূস্বামী খাজনা (অনপেক্ষ) পেতে পারে। অর্থাৎ মূল্যের শ্রমতত্ত্ব কাজ করে বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এর অর্থ এই নয় যে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব আর কাজ করছে না। এটা শুধু এটা দেখিয়ে দেয় যে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ক্ষেত্রে মুনাফা হতে পারে উদ্বৃত্ত মূল্যের বেশি, কম বা (কখনো সখনো) সমান, কিন্তু মোট মুনাফা হবে মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান। কৃষিতে পুঁজিবাদ নিয়ে তাঁর চমৎকার লেখায় কাউটস্কি এটা পরিষ্কার করে দেখান। কাউটস্কি বলেছেন, ''পণ্যের মূল্যকে কেবল একটি *প্রবণতা* হিসাবে দেখা যায়, যেন নিয়মের মতো একটা চলন, যা বিনিময় বা ক্রয়বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়ার *ফল হলো* প্রকৃত বিনিময়-অনুপাত, বা বাজারে চলতি দাম। স্বাভাবিকভাবেই, কোনো নিয়ম আর তার ফল, এ দুটো আলাদা জিনিস।'' ('দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্যারেক্টার অফ মডার্ন এগ্রিকালচার', *দ্য অ্যাগ্রারিয়ান কোয়েশ্চেন*, কাউটস্কি, *দ্য অ্যাগ্রারিয়ান কোয়েশ্চন ইন মার্কস অ্যান্ড হিস সাকসেসর্স*, উৎসা পট্টনায়ক (সম্পা.), খণ্ড ১, পৃ. ১৮৮) অন্যত্র তিনি বলেছেন, ''ফলত, 'উৎপাদন ব্যয়' দিয়ে উৎপাদনের যে দাম নির্ধারিত হয় তা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের থেকে আলাদা; তবে এটা মূল্যতত্ত্বের একটা পরিবর্তন, তাকে নাকচ করা নয়। উৎপাদন দামের পেছনে এটির নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা থেকে যায়, এবং সমগ্র পণ্যরাজি ও মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণতই খাটে, এভাবে তা পণ্যের দামের ও উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তি তৈরি করে— যা না থাকলে এগুলি শূন্যে ভেসে বেড়াত।'' (পৃ. ২০২-০৩, *পূর্বোক্ত*) তাহলে, এটা পরিষ্কার যে অনপেক্ষ ভূমিখাজনার জন্য উৎপাদন-দামের বৃদ্ধি আদৌ মূল্যতত্ত্বের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় না, রিকার্ডো যে খেপে গিয়ে অনপেক্ষ ভূমিখাজনাকেই নাকচ করে দিলেন তার কোনো জোরালো কারণ নেই। ভূস্বামী ও উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলে তখনই কেবল রিকার্ডোর বিভেদাত্মক ভূমিখাজনার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, কারণ কেবলমাত্র তখনই অনপেক্ষ খাজনার পাশাপাশি বাড়তি-মুনাফাটাও জমি-মালিককে সঁপে দিতে হয়।

কাউটস্কি দেখিয়েছেন, ভূস্বামীকে খাজনা দিয়ে দেওয়ার পর অনপেক্ষ আর বিভেদাত্মক খাজনার মধ্যে তফাত করা কঠিন। *রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ* গ্রন্থে লেনিনও অনপেক্ষ খাজনা আর বিভেদাত্মক খাজনার প্রশ্নটিতে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। পুঁজিবাদী খাজনা (অনপেক্ষ ও বিভেদাত্মক) ও সামন্ততান্ত্রিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তিনি। কাউটস্কিও পরিষ্কারভাবে এই ফারাকটি দেখিয়েছেন, ''সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরা কৃষকদের উপর যে বোঝা চাপিয়ে দিত তার সঙ্গে পুঁজিবাদী ভূমিখাজনাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। প্রথম দিকে, মোটামুটি পুরো মধ্যযুগ জুড়ে, এগুলো ছিল লর্ডকে যেসব কাজ করতে হতো— পরে রাষ্ট্র যে কাজগুলোর দায়িত্ব নেয়— তার সমান, কৃষকরা যার জন্য কর দিত। অভিজাত শ্রেণীকে আইন ব্যবস্থার দেখাশোনা করতে হতো, পুলিশের ব্যবস্থা করতে হতো, এবং বাইরের বিশ্বে সামন্তদের (ভ্যাসেল) স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হতো, অস্ত্র নিয়ে তাদের রক্ষা করতে হতো, তাদের হয়ে সামরিক পরিষেবা দিতে হতো।

''এগুলো কোনোটাই পুঁজিবাদী সমাজে ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। বিভেদাত্মক খাজনা হিসাবে ভূমিখাজনা প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত; অনপেক্ষ খাজনা হিসেবে তা একচেটিয়া উদ্ভূত। কোনো সামাজিক কাজ করার জন্য নয়, শুধুমাত্র জমিতে, ভূমিতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণেই ভূস্বামী সেটি পেয়ে থাকেন।'' (পৃ. ২১৬, *পূর্বোক্ত*)

উৎসা পট্টনায়ক সঠিকভাবেই বলেছেন যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের ভুল এই জায়গায় যে তারাও অনপেক্ষ ভূমিখাজনার ধারণাটা বোঝেন না, এবং বিস্ময়ের কথা, এ বিষয়ে তাঁদের ও নয়া-উদারনৈতিকদের একই ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে। নয়া-উদারনৈতিক তত্ত্বে বর্গাচাষিকে (টেনান্ট ফার্মার) মজুরি-শ্রমিকের সমান ধরা হয়, তফাত শুধু এই যে তাদের মজুরিটা টাকায় হয় না, হয় জিনিসে। এ বিষয়টা তাঁরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন যে, বর্গাচাষির নিজের উৎপাদনের উপকরণ থাকে, সে পুঁজি বিনিয়োগ করে, শ্রমপ্রক্রিয়ার তার নিয়ন্ত্রণ থাকে, উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও সেই নিয়ে থাকে। এটা হয় এই কারণে যে নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা অনপেক্ষ ভূমিখাজনার ধারণার সঙ্গে পরিচিত নন, তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত নন। পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামীকে বলা হয় পুঁজিবাদী কৃষক, বর্গাচাষিকে বলা হয় শ্রমিক (মজুরি-শ্রমিক); আর খাজনাকে গুলিয়ে ফেলা হয় মুনাফার সঙ্গে; বর্গাচাষির অংশকে খেয়ালখুশিমতো বলে দেওয়া হয় মজুরি (টাকায় কি জিনিসে, তাতে কিছু এসে যায় না!)। এসব গুলিয়ে ফেলা হয় কারণ নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা শুধু পুঁজিবাদী কৃষক-ভূস্বামী আর মজুরি-শ্রমিক বোঝেন, তারা শুধু মুনাফা বোঝেন, খাজনা বোঝেন না। এখন আমরা এর সঙ্গে ভারতের আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের গন্ডগোলের তুলনা করব।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা বর্গাচাষিকে বলেন প্রায়-শ্রমিক, নিঃস্ব, উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ও শ্রমপ্রক্রিয়ার উপর যাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; ফলত তারা 'অ-মুক্ত', 'সামন্ততান্ত্রিক' ভূস্বামী ও মহাজনদের জোয়ালে বাঁধা। স্পষ্টতই তাঁরাও অনপেক্ষ খাজনার ধারণাটি বোঝেন না। পুঁজিবাদী বর্গাচাষিকে তাঁরা অ-মুক্ত, অ-পুঁজিবাদী শ্রমিক বা প্রায়-শ্রমিক, প্রায় আবদ্ধ শ্রমিক/ভূমিদাস ভাবছেন। পুঁজিবাদের অধীনে কৃষি উৎপাদনে মহাজনি পুঁজির ভূমিকাও তাঁরা বোঝেন না। এ বিষয়ে আবার পরে আসব। তাঁদের কাছে, এই বর্গাচাষি একজন অ-মুক্ত, নিঃস্ব শ্রমিক, উৎপাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিবাদী বর্গাচাষি নয়। পুঁজি দিতে হবে মালিককে, ভাগচাষি শুধু তার শ্রম দেবে। এই নিঃস্ব ভাগচাষি শুধু দ্রব্যে মজুরি পায়, আর ভূস্বামী পায় খাজনা (রিকার্ডো-র খাজনা)। কিন্তু আমরা যদি আর একটু খুঁটিয়ে দেখি, এই তাত্ত্বিকরা যাকে 'মজুরি' বলছেন তা আসলে পুঁজিবাদী বর্গাচাষির মুনাফা, যাকে তাঁরা 'খাজনা' বলছেন তা আসলে ভূস্বামীর দেওয়া পুঁজির উপর মুনাফা, সুদ রূপে। উদাহরণস্বরূপ, *অমিত ভাদুড়ি*র মতে, ভারতীয় ভাগচাষিদের কাছে উৎপাদনের উপকরণ নেই বা প্রায় নেই, তাদের কোনো সঞ্চয় নেই, বাঁচার কোনো উপায় নেই, তাই তারা জমিদারের কাছ থেকে 'ভোগব্যয় ঋণ' নেয়। কিন্তু 'ভোগব্যয় ঋণ' আসলে আগাম মজুরি ছাড়া কিছুই নয়, ফসল ওঠার পর মজুরি হিসেবে সে ফসলের যে ভাগ পাবে তা থেকে সুদসহ কাটা যাবে। এটা স্পষ্ট যে, শ্রী ভাদুড়ি যাকে 'খাজনা' বলছেন তা আসলে পুঁজিপতির মজুরকে দেওয়া পুঁজির উপর মুনাফা। শ্রীভাদুড়ি যাকে বর্গাচাষি (টেনান্ট) বলছেন সে আসলে শ্রমিক, তিনি যাকে 'খাজনা' বলছেন সেটা আসলে মুনাফা; উনি যাকে 'ভোগব্যয় ঋণ' বলছেন তা আসলে আগাম মজুরি, পরে ফসল উঠলে যা সুদসহ মজুরি থেকে যা কাটা যাবে।

ভারতের ক্ষেত্রে যেটা আছে তা এইরকম (পরে উদাহরণসহ দেখানো হবে): বর্গাচাষিকে ঋণ হিসাবে বা অন্যভাবে পুঁজি আগাম দিক আর না দিক, পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামী অনপেক্ষ ভূমিখাজনা নেবে। জমি ও উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করে তার বিনিময়ে সে (জমি মালিক) যা পায় সেটা পুঁজিবাদী বর্গাচাষিকে দেওয়া ঋণের সুদ ছাড়া কিছু নয়। বর্গাদার মজুরি-শ্রমিক নয়। তার নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণ, তার পরিবারের শ্রম ও ভাড়া করা শ্রম, এবং ভূস্বামীর কাছ থেকে খাজনার বিনিময়ে ভাড়া করা জমিতে নিয়োগ করা পুঁজির ওপর উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে— খাজনাটা উদ্বৃত্তের অংশ, তার নিজের জীবনধারণের খরচ সহ উৎপাদন ব্যয়ের ওপর যে উদ্বৃত্ত সে উৎপাদন করে।

এখন, উৎপাদনের অবস্থার ওপর নির্ভর করে পুঁজিবাদী

কৃষিতে পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামীর বা পুঁজিবাদী কৃষক ভূস্বামীর আধিপত্য থাকতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ও জমির উন্নতির ফলে খাজনা যখন এত বেড়ে যায় যে পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামীর বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট পুঁজি হয়, তখন তারা নিজেদের পুঁজিবাদী কৃষক ভূস্বামীতে রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন দুই অভিমুখেই হতে পারে, বিভিন্ন কারণে পুঁজিবাদী কৃষক ভূস্বামীও পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই রূপান্তর কতটা উদ্বায়ী, উৎসা পট্টনায়ক তা দেখিয়েছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, সবুজ বিপ্লবে খাজনার বাধা অতিক্রম করা হয় এবং অনেক খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামী জমি চাষ করতে শুরু করেন। এখন অবস্থা অন্যরকম। বিশ্বায়নের যুগের কৃষিতে এখন একটা পুঁজিবাদী সংকট চলছে (আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকেরা যাকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে দেখেন, কিন্তু মার্কস, কাউটস্কি ও লেনিন যেমন দেখিয়েছেন, যা আসলে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রমাণ, বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের কৃষি অংশ)। আমরা আজ যা দেখছি তা আসলে খাজনা প্রথায় ফিরে যাওয়া এবং নির্মাণশিল্প, মহাজনি ও ফাটকাবাজির মতো বিনিয়োগের অন্য পথ নেওয়া। এই সময়ে বর্গা বা টেনান্সির প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই আমরা এবার সেই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব।

বর্গা বা টেনান্সির প্রশ্ন

প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের দাবি মতো *কৃষি অর্থনীতিতে বর্গার প্রাধান্য থাকার সঙ্গে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক হওয়ার কোনও সরাসরি সংযোগ নেই*। কাউটস্কি তাঁর লেখায় উনবিংশ শতকের শেষাশেষির ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর অতলান্তিক ইউনিয়ন থেকে প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের সাথে সাথে বর্গাচাষ আরও বেড়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী কৃষিতে মালিক কৃষক আছে, আবার বর্গাদারের চাষও আছে। বর্গাচাষি তার পারিবারিক শ্রম ও ভাড়া করা শ্রম দিয়ে বর্গা-জমিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। এই উদ্বৃত্তের একটা অংশ যায় ভূস্বামীর কাছে খাজনা হিসেবে, আর একটা অংশ যায় মহাজনের কাছে সুদ হিসেবে, বাকিটা সে মুনাফা হিসেবে পকেটস্থ করে; ঋণ থাকলে তার সুদ বাদ দিলে বাকি সবটাই মুনাফা হিসেবে পায় মালিক-চাষি; আর পুঁজিবাদী মালিক পায় খাজনা। তবে, কাউটস্কি দেখাচ্ছেন, পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের সাথে সাথে মালিক-চাষির মালিকানা-অধিকার শুধু আইনি কাগুজে অধিকারে পরিণত হয়। বাজারে প্রতিযোগিতা করতে মালিক-চাষির আরও আরও পুঁজির দরকার হয়। এটার জন্য তাকে তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নিতে হয়। এই ঋণের বিনিময়ে তাকে বন্ধকী ঋণদাতার হাতে ভূমিখাজনা তুলে দিতে হয়— এই ঋণদাতা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হোক, কিংবা ব্যক্তি-মহাজন হোক। এর অর্থ আসলে জমি থেকে উৎপাদকের বিচ্ছিন্নতা। কাউটস্কি এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন: ''ভূস্বামী আর উদ্যোগপতির মধ্যেকার বিভাজন— যা বিশেষ ধরনের আইনি ধরনগুলির আড়ালে থাকে— সেটি এখনো আছে/থাকছে। লিজ ব্যবস্থায় ভূস্বামী যে ভূমিখাজনা পায় বন্ধকী প্রথায় সেটা ঋণদাতার পকেটে চলে যায়। ভূমিখাজনার মালিক হিসেবে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিই (মহাজন) তাই জমির আসল মালিক। এর বিপরীতে জমি যার নামে আছে সে একজন পুঁজিবাদী উদ্যোগপতি যে তার উদ্যোগের মুনাফা ও ভূমি খাজনা আহরণ করে, আর তারপর ভূমিখাজনাটা বন্ধকী-ঋণের সুদ হিসেবে ভূমিখাজনাটা তার (মহাজনের) হাতে তুলে দেয়... লিজ ব্যবস্থা ও বন্ধকী ব্যবস্থার মধ্যে তফাত এই যে বন্ধকী ব্যবস্থায় জমির আসল মালিককে পুঁজিপতি বলা হয়, আর ভূস্বামীই আসল পুঁজিবাদী উদ্যোগকর্তা। এই ধোঁয়াশার কারণে আমাদের চাষিরা (একে ভারতের আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিক বা নয়া-নারদনিক হিসেবেও পড়া যায়— লেখক), যারা পুঁজিপতির কাজটা করছে, তারা 'চলমান পুঁজি' অর্থাৎ বন্ধকি-মহাজনদের নিয়ে— যারা লিজ ব্যবস্থায় ভূস্বামীদের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা নিচ্ছে— খুব ক্ষুব্ধ।'' (পৃ. ২২৫, *পূর্বোক্ত*) তিনি বলছেন যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মালিক রূপান্তরিত হচ্ছে সর্বহারায় নয়, প্রজা-কৃষকে (টেনান্ট-ফার্মার)। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ''তবে, কৃষিতে প্রগতি ও সচ্ছলতা প্রকাশিত হবে অবশ্যই বন্ধকি ঋণগ্রস্ততার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে, প্রথমত এই কারণে যে এই ধরনের প্রগতি পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন/চাহিদা তৈরি করে, আর দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, কৃষি-ঋণের বৃদ্ধি ভূমিখাজনাকে বাড়তে দেয়।'' (পৃ. ২২৬, *পূর্বোক্ত*) এই ধরনের পুঁজিবাদী রূপান্তরকে অনেক সময় কৃষির ধ্বংস মনে করা হয়, কেউ কেউ 'কৃষকদের বাঁচানোর' ডাক দেয়। লেনিন এই ভুল ধারণাকে স্পষ্ট নস্যাৎ করেছেন। কাউটস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন: ''কৃষকদের রক্ষা করার অর্থ ব্যক্তি কৃষককে রক্ষা করা নয় (রক্ষা করলে অবশ্য কেউ আপত্তি করবে না), কৃষকদের সম্পত্তি রক্ষা করা। ঘটনাক্রমে, কৃষকদের সম্পত্তিই হলো তাদের দারিদ্র্য ও অবনমনের প্রধান কারণ। এখন প্রায়শ ভাড়া করা কৃষি মজুররা ছোট কৃষকের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে। কৃষকদের রক্ষা করা মানে (তাদের) দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করা নয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে কৃষক যে শৃঙ্খলে বাঁধা, সেই বন্ধনকে রক্ষা করা।'' (লেনিন, কাউটস্কির Die Agrarfrage-র সমালোচনা, পৃ. ২৬৭, *পূর্বোক্ত*)। আবারও, ''এই প্রক্রিয়াকে আটকানোর চেষ্টা করা হবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ক্ষতিকর: এই প্রক্রিয়ার ফলাফল আজকের সমাজে যতটা বোঝাই হোক না কেন, সেটাকে আটকানোর ফল হবে আরও খারাপ, তা শ্রমজীবী জনতাকে আরও হতাশাগ্রস্ত ও অসহায় অবস্থায় নিয়ে যাবে।'' (পৃ. ২৬৭, *পূর্বোক্ত*)

মাও-এর আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের তত্ত্ব এবং সেটিকে আজকের আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের দুঃখজনক আত্মসাৎ

এটা পরিষ্কার যে যথেষ্ট পরিমাণ বর্গাচাষই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের চিহ্ন নয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বলতে মাও কী বুঝতেন সেটা তিনি পরিষ্কারভাবে সূত্রায়িত করেছেন। মাওয়ের যুক্তি ছিল এই যে, বিপ্লব-পূর্ব চীনে জমির অনেকটাই ছিল জমিদার, অভিজাত ও সম্রাটের মালিকানাধীন, কৃষকদের ভূমিদাস হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো, স্বাভাবিক স্ব-নির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস করা হচ্ছিল কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাতে কৃষকদের শোষণ অব্যাহত ছিল, তা মুৎসুদ্দি ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল। (মাও সেতুঙ, *সিলেক্টেড ওয়ার্কস*, খণ্ড ২, ১৯৭৬, পৃ. ৩১২-৩) মাওয়ের কাছে আধা-সামন্ততন্ত্র কোনো আলাদা উৎপাদনব্যবস্থা ছিল না, ছিল পুঁজিবাদে উৎক্রান্তির অবস্থায় বা স্তরে মূলত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা— সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সাম্রাজ্যবাদ যে উৎক্রান্তিতে বাধা দিচ্ছে, আর তাই, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া যে উৎক্রান্তি হতে পারবে না। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো খাজনার সামন্ততান্ত্রিক ধরন, সামন্ত শ্রেণীর হাতে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতার ফলে বিভক্ত খণ্ডীকৃত রাষ্ট্র, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য। স্পষ্টত, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক মার্কসীয় তত্ত্বের একটা বিশেষ বর্গ, আজকের আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের ইচ্ছা অনুসারে সেটা ভারতীয় বাস্তবতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা কি বলতে পারি যে ভারতে কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূস্বামী-ভূমিদাস সম্পর্ক প্রধান? তথাকথিত আবদ্ধ শ্রমিকরা গ্রামীণ শ্রমিকদের এমনকি ১ শতাংশও নয়। অনুপস্থিত ভূস্বামীদের জায়গা নিচ্ছে ভাড়া করা শ্রম দিয়ে নিজে চাষ করা। আর সেই পরিবর্তন যদি নাও হয়, সেটা সামন্ততন্ত্রের চিহ্ন হবেই এমন কোনো কথা নেই।

সংখ্যাতত্ত্বে প্রতিফলিত বাস্তব

ভারতে বর্গা চাষের এলাকা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১২ শতাংশ, তা কমে ১৯৯১-৯২ সালে হয়েছে ৮.২৮ শতাংশ। অ-নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যাও কমছে। ভাগচাষ হলো বর্গাচাষের প্রধান ধরন। উত্তর ও পূর্ব ভারতে ৩৩৪টি গ্রামের ওপর নমুনা সমীক্ষায় বর্ধন দেখিয়েছেন যে ভাগচাষ মূলত হয় ৫০:৫০ অনুপাতে (পি বর্ধন, 'টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন্স অফ শেয়ারক্রপিং কনট্রাক্ট্স', *জার্নাল অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ১৬, ১৯৭৭)। একটা বিরাট ভুল ধারণা আছে যে ভাগচাষ আধা-সামন্ততন্ত্রের চিহ্ন। ভাগচাষের ক্ষেত্রে ভূস্বামী কৃষির উন্নতিতে আগ্রহ দেখায়। অনুপস্থিত ভূস্বামীর বিপরীতে এখানে নতুন ভূস্বামী অনেকসময় কৃষিতে বীজ, সার, যন্ত্র ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। সে শুধু জমির মালিকই নয়, পুঁজি ঋণদাতাও। বর্গাচাষের ফসলের বেশির ভাগটাই এখন বাজারজাত হয়। সামন্ততান্ত্রিক/আধা-সামন্ততান্ত্রিক বর্গাচাষের মতো এই বর্গাচাষ শুধু ভূস্বামী বা বর্গাচাষির নিজের ভোগের জন্য নয়। অশোক রুদ্র ও পি বর্ধন দেখিয়েছেন যে, তথাকথিত আবদ্ধতা/আধা-আবদ্ধতা (অ্যাটাচমেন্ট/সেমি-অ্যাটাচমেন্ট) অর্থনীতি-বহির্ভূত শোষণ নয়, তা সময়মতো ও নিশ্চিত শ্রমের জোগান নিয়ে ভূস্বামীর দুশ্চিন্তার পরিচায়ক। (বর্ধন, রুদ্র: 'লেবার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ওয়েজেস ইন এগ্রিকালচার', *ইপিডবলিউ*, নভেম্বর, ১৯৮০) ভূস্বামীর আয়ের প্রধান অংশ ঋণদান থেকে আসে না, আসে খাজনা ও মুনাফা থেকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অংশ ১৯৫২ সালে ছিল ৯৫ শতাংশ, তা কমে ১৯৮১-৮২ সালে হয়েছে ৬০ শতাংশ। যদিও গত দুই দশকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বেড়েছে, নতুন ঋণদাতারা কিন্তু পেশাজীবী মহাজন নয়, পেশাজীবী পেটি বুর্জোয়া— বাসোলে ও বসু তাঁদের চমৎকার আলোচনায় তা দেখিয়েছেন ('রিলেশন্স অফ প্রোডাকশন অ্যান্ড মোড্স অফ সারপ্লাস এক্সট্রাকশন ইন ইন্ডিয়া', অমিত বাসোলে ও দীপংকর বসু, অর্থনীতি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্স, আমহার্স্ট, এমএ, ইউএসএ— পেপারটি সংহতি.কম-এ লভ্য)। আবার, এটা হওয়ার কারণ মূলত ঋণদানের বেসরকারিকরণ, ঋণদাতার ভূমিকা থেকে রাষ্ট্রের নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। তবে, এটা কৃষকদের (বর্গাচাষি ও মালিক) ওপর মহাজনি পুঁজির সামন্ততান্ত্রিক ধরনের আধিপত্য নয়। আমরা আগেই দেখিয়েছি, আবদ্ধ বা দাস ধরনের শ্রম না থাকলে গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা মাত্রই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের চিহ্ন নয়। তাছাড়া, এমনকি পুঁজিবাদেও শ্রম সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নয়। টম ব্রাস ও উৎসা পট্টনায়ক যেমন দেখিয়েছেন, সমস্ত পুঁজিবাদী চুক্তির মধ্যেই বিভিন্ন পরিমাণ অ-স্বাধীনতা আছে। শ্রমের স্বাধীনতা একটা সাধারণ নিয়ম বা প্রবণতা। কিন্তু কেউ যদি সেটাকে আক্ষরিক অর্থে নেয় তবে ভুল করবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের অন্যান্য শর্তগুলি (যেমন, শ্রমশক্তি ও জমির পণ্যায়ন, পুঁজিবাদী ভূমিখাজনা, নতুন ঐক্যবদ্ধ দেশীয় বাজারের বিকাশ ইত্যাদি) একই থাকলে গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা ও মহাজনি পুঁজি কৃষিতে পুঁজিবাদী রূপান্তরকে জোরদার করতে পারে। দেখা যাক মার্কস এ নিয়ে কী বলছেন। তিনি বলেছেন যে উৎপাদনের ফাঁকে ফোঁকরে মহাজনি থাকে; এটা পুঁজি, কারণ তা উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করে, কিন্তু উৎপাদনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি উৎপাদনকে দুঃখজনক করে তুলে উৎপাদন পদ্ধতিকে আরো জোরালো করে তোলে— সে উৎপাদন সামন্ততান্ত্রিক হোক বা ধনতান্ত্রিক। মহাজনি পুঁজি হলো টাকা রূপে পুঁজি, যা উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত/নিয়ন্ত্রণ করে নয়— সুদ হিসাবে; এটি উৎপাদকদের থেকে আত্মসাৎ করে

কিন্তু তাদের একটি বড় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়ো করে না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দরিদ্র, ছোট উৎপাদক হিসেবেই রেখে দেয়। *কিন্তু*, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মহাজনি ব্যবস্থা থেকে যায়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য পূর্বশর্তগুলি মিটলে তা এমনকি পুঁজিবাদী বিকাশের অস্ত্রও হতে পারে। (কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, খণ্ড ৩, মস্কো, ফরেন ল্যাংগুয়েজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৯, পৃ. ৫৮০-৫৮৮)

বসু ও বাসোলে আরও দেখিয়েছেন যে *মোটের ওপর বর্গাচাষ কমছে*। তাঁরা তার যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করেছেন। ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে লিজ নেওয়া গৃহস্থালির সংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে; মোট জমির মধ্যে লিজ নেওয়া জমির অংশ ১২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে; মোট জমির মধ্যে লিজ দেওয়া জমির অংশ ৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে; অংশত বা পুরোটাই লিজ নেওয়া জমির অংশ ২৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশে; মোট কর্ষিত জমির মধ্যে লিজ নেওয়া জমির অংশ ১০.৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ, *বর্গাচাষ থেকে ভাড়া করা মজুর দিয়ে নিজ-চাষে অবিতর্কিত পরিবর্তন একটা হয়েছেই*। আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকেরা দাবি করতে পারেন যে, ছোট চাষিদের ক্ষেত্রে বর্গাচাষ বেড়েছে। কিন্তু সেটাও সত্যি নয়। সব আকারের জোতেই বর্গাচাষ কমেছে। প্রকৃতপক্ষে বড় জোতের ক্ষেত্রে বর্গাচাষ বেড়েছে, তা পুঁজিবাদী বর্গাচাষের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রমাণ করে। সব বর্গেই বর্গাচাষি পরিবারের সংখ্যা কমেছে, আর সব ধরনের ক্ষেত্রেই বর্গাচাষে থাকা জমির অংশ কমেছে। ২০০৩ সালে বর্গাচাষের জমির ৭০ শতাংশ ছিল বড় জোত (২.৫ একরের চেয়ে বড়), জোতের সংখ্যা ছিল চষা সমস্ত জোতের মাত্র ৩ শতাংশ। *বর্গাচাষের নিয়মগুলিও দেখিয়ে দেয় যে পুঁজিবাদী সম্পর্ক অবশ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে*। ২০০২-০৩ সালে মোট খাজনার ৫১ শতাংশ ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা (টাকায় ও জিনিসে), যেখানে ১৯৬০-৬১ সালে তা ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০০২-০৩ সালে ভাগ চাষ (যেখানে ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ খাজনা হিসাবে দেওয়া হয়) ছিল বর্গাচাষের ৩৭ শতাংশ, ১৯৬০-৬১ সালে যা ছিল ৪০ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বর্গাচাষ দেখা গেছে পঞ্জাব ও হরিয়ানায়, যে রাজ্য দুটিতে পুঁজিবাদী চাষ সবচেয়ে বিকাশ লাভ করেছে। প্রায় সব রাজ্যে বিপরীত বর্গা (রিভার্স টেনান্সি) একটা চোখে পড়ার মতো ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসু ও বাসোলে এটাও দেখিয়েছেন যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণে সম্প্রতি যে বৃদ্ধি দেখা গেছে তা মূলত দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি বিকশিত পুঁজিবাদী কৃষির কৃষির (পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ) রাজ্যগুলিতে। এটা ঘটেছে এই কারণে যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ আর কিছুই নয়, ঋণ ব্যবস্থার পুঁজিবাদী বেসরকারিকরণ ও আর্থিকীকরণ। তাছাড়া, এখনও কৃষিতে মোট ঋণের প্রায় অর্ধেক আসে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে।

কৃষিতে বাজারের অনুপ্রবেশও তথ্যের মাধ্যমে দেখা যায়। বেশিরভাগ খাদ্য-ফসলের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের ৮৫ শতাংশের বেশি বাজার-জাত করা হয়। মোট কৃষি উৎপাদনের মধ্যে বাজার-জাত উদ্বৃত্তের অংশ কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এইরকম: প্রায় ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ, প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে ৬৪ শতাংশ, ছোট চাষিদের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ, মধ্য চাষিদের ক্ষেত্রে ৬৬ শতাংশ, এবং বড় চাষিদের ক্ষেত্রে ৭১ শতাংশ। কৃষিতে মোট পুঁজি তৈরি ১৯৬১ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ৩ শতাংশ হারে বেড়েছে, যেটা বেশ ভালো ধরনের বৃদ্ধির হার।

কৃষকদের মধ্যে বর্গীকরণ (ডিফারেন্সিয়েশন), লেনিনের মতে যা কৃষির পুঁজিবাদী রূপান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, সেটা বুঝতে হলে আমাদের *ভূমিহীনতা* ও *জমির মালিকানার কাঠামো* সম্পর্কিত তথ্যে চোখ রাখতে হবে। কৃষি জমির ৬২ শতাংশ আসে এমন সব পরিবার থেকে যাদের মালিকানায় থাকা জমির পরিমাণ ০.০২৫ একর থেকে ১ একর। এদের "কার্যত ভূমিহীন" বলা যেতে পারে। এই পরিবারগুলির আয়ের ৬০ শতাংশ আসে মজুরি থেকে, তাদের ফসলের ৪৪ শতাংশ তারা বাজার-জাত করে— এইরকম ভূমিহীন জনতার পক্ষে হারটি যথেষ্ট বেশি। ১ একরের কম জমি আছে এরকম পরিবারের সংখ্যা ২০০৪-৫ সালে ছিল ৭৬.৬ শতাংশ, ১ থেকে ২ একর জমি আছে এরকম পরিবারের সংখ্যা ছিল ১২.২ শতাংশ, আর ২ একরের বেশি জমি এরকম পরিবারের সংখ্যা ১১.২ শতাংশ। কার্যকর ভূমিহীনতা ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৪৪.২ শতাংশ, তা বেড়ে ২০০২-০৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৬০.১ শতাংশে; গ্রামের ৬০ শতাংশ দরিদ্রতম পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ কর্ষিত জমির মাত্র ৬ শতাংশ। গ্রামে কার্যত ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলির অনুপাত ১৯৬১ সালে ছিল ৬৬ শতাংশ, তা বেড়ে ২০০৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৮০ শতাংশে; খুব বড় খামারের (১০ একরের চেয়ে বড়) অংশ ১৯৬১ সালে ছিল ১২ শতাংশ, তা কমে ২০০৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ শতাংশে। ২.৫-৫ একর জমির মালিক পরিবারগুলোর সংখ্যাও কমেছে— ১৯৬১ সালে ছিল ২৩ শতাংশ, ২০০৩ সালে ১৭ শতাংশ। ছোট চাষি পরিবারগুলির (২.৫ একরের কম) হাতে মোট জমির অংশ বেড়েছে— ১৯৬১ সালে তা ছিল ৮ শতাংশ, ২০০৩ সালে তা ২৩ শতাংশ। আর, বড় কৃষক পরিবারগুলির হাতে মোট জমির পরিমাণ ১৯৬১ সালে ছিল ৬০ শতাংশ, তা কমে ২০০৩ সালে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। মধ্য চাষি পরিবারগুলোর হাতে ১৯৬১ সালে মোট জমি ছিল ৩৩ শতাংশ, তা বেড়ে ২০০৩ সালে হয়েছে ৪২ শতাংশ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষকদের বর্গীকরণ হয়েছে, কৃষি মজুরি-শ্রমিকদের একটা বিশাল শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। বাজারের জন্য উৎপাদনের প্রাধান্য, ঋণ ব্যবস্থা ও জমির পণ্যায়ন ইতিমধ্যেই তথ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই তথ্য থেকে ভারতে যে ভূমি সংস্কার হয়েছে তার চরিত্রও দেখা যাচ্ছে। এখানে যা হয়েছে তা অবশ্যই ভূমি সংস্কারের প্রাশিয়ান পথ, যাতে জমি বর্গাচাষিদের ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমির পুনর্বণ্টন করা হয়নি; পূর্বতন সামন্ত প্রভুকেই নিজেকে পুঁজিবাদী খাজনা-আদায়কারী ভূস্বামীতে বা পুঁজিবাদী কৃষক-ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হতে দেওয়া হয়েছে। কৃষির বাজারিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিবাদী ঋণ ব্যবস্থার বিকাশ, কৃষকদের বর্গীকরণ, ঐক্যবদ্ধ একটি দেশীয় বাজারের বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে অনেক তথ্য দেওয়া যায়। তবে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা করা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে।

শেষ করার আগে একটা সতর্কবার্তা। আমাদের মতে, কৃষির পুঁজিবাদী রূপান্তরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে আধা-সামন্ততন্ত্রের কঠোর, তামাদি তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে তা করা যাবে না, উপরের তথ্যপ্রমাণ সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে। তবে, আধা-সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বের ভিতরকার দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলির কারণে আধা-সামন্ততান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের পুরো আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত *বুর্জোয়াদের চরিত্রের প্রশ্নে* আটকে যায়। সেই বিষয়টি আর একটি বড় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু এখানে এটুকু বলা যেতে পারে: *গত ছয় দশকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ব্যবহার কোনমতেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের মতো নয়।* ভারত রাষ্ট্র এক অদ্ভুত ধরনের উপনিবেশ-উত্তর (দেরিদা-দের অর্থে নয়) পুঁজিবাদী রাষ্ট্র— এর বুর্জোয়ারা জাতীয় বুর্জোয়াও নয় (কারণ এদের স্বার্থ ভারতের জনগণের সঙ্গে কোনও জড়িত নয়), আবার মুৎসুদ্দিও নয় (কারণ এরা রাজনৈতিকভাবে পরাধীন নয়— সুয়েজ খালের ঘটনা, সোভিয়েত এশিয়া মৈত্রী সংঘের ঘটনা থেকে শুরু করে কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে এরা মেট্রোপলিটান সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে)। তাহলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চরিত্র কী? আমাদের মতে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের (কোনও বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী দেশের নয়, পুরো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার) *ছোট শরিক* হিসাবে দেখা যেতে পারে। এরা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন। মেট্রোপলিটান বুর্জোয়ারা মাঝে মাঝে এদের ওপর চাপ দেয় (কারণ এরা ছোট শরিক), কিন্তু এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সমর্পণ করে না, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে দড়ির ওপর হেঁটে এরা নিজেদের 'জাতীয়' শ্রেণীস্বার্থ ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা একমেরু হওয়াটা একটা সাময়িক ঘটনা, একটা মরীচিকা। লেনিন যেমন দেখিয়েছেন, একচেটিয়ার সাথে সাথেই থাকে প্রতিযোগিতার বিপরীত-গতি, আর অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দ্বন্দ্ব বিপ্লবী অবস্থা তৈরি করে।

সবশেষে যেটা বলার, সামনের দিকে এগোতে গেলে ভারতের এম-এল আন্দোলনকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের জোয়াল থেকে বেরোনো দরকার। কর্মসূচির বিষয়কে মতাদর্শের বিষয় করে তোলা উচিত নয়— ভারতে মতান্ধ বামপন্থীরা যেরকম করেছেন। পুঁজিবাদী বিকাশের কথা বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের কথা মুখে আনলেই আপনি ট্রটস্কিপন্থী, কারণ এটা নাকি লেনিনের দুই-স্তর তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়! অবস্থাটা অদ্ভুত ও করুণ। এর অবসান ঘটানো দরকার।

ভারতীয় সমাজের চরিত্র নির্ধারণ ও বিপ্লবের পথ

কে এন রামচন্দ্রন

বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলন নির্মাণের জন্য মার্কসবাদ নির্দিষ্ট অবস্থার নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের কথা বলে। যখনই বিদ্যমান অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করা গেছে এবং এই সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিপ্লবী পথ ও অনুশীলনের বিকাশ ঘটেছে, তখনই বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা গেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন এই কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলন বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আন্দোলন পিছিয়ে পড়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক স্তরে যখন পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে তখন তার বিরুদ্ধে যদিও কল্পিত ধারণার ভিত্তিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটেনি। কমিউনিস্ট ইস্তেহার প্রকাশের পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথের ভিত্তিতে যখন কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠিত হয়— তখনই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়, তখনও আবার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব এই সব পরিবর্তনের ভিত্তিতে মার্কসবাদী শিক্ষাকে নির্দিষ্ট অবস্থায় বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকদের পতন ঘটে; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রবল ধাক্কা লাগে এবং আন্দোলন পিছিয়ে পড়ে। যতদিন না লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রূপান্তরের নির্দিষ্ট বিষয়টির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ হাজির করেছেন, যতদিন না তিনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলনের বিকাশ ঘটিয়েছেন, ততদিন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রগতি ঘটেনি। লেনিনবাদ-এর আশাব্যঞ্জক প্রভাব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জন্ম দিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করে যে ১৯৫০-এর দশকে মনে হয়েছিলো যে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। কিন্তু গত পাঁচ দশকে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন যে উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিলো, বর্তমানে তা বিপুল পরিমাণে ধাক্কা খেয়েছে। সমস্ত পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী পথের অনুসারী হয়ে অধঃপাতে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। চীন সমাজতান্ত্রিক পথ পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী পথকে আলিঙ্গন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৃত্তে ঘটে যাওয়া এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সহ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধাক্কা খাওয়ার মতো ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা এবং তার ভিত্তিতে মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও অনুশীলনের পথ ঠিক করার মতো বিষয়গুলিকে তাদের চৈতন্যে গ্রহণ করতে মূল ধারার প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই অবস্থায় এই সমস্ত পরিবর্তনের সামগ্রিক চরিত্র এবং বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে তার ফলাফল বিচার করলে বর্তমান ভারতীয় সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণের যে ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে, তা নিয়ে গভীর আলোচনা জরুরি। তা করলে বর্তমান বাস্তবতায় ভারতীয় বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলন বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সাধিত হতে পারে। এই কাজ করতে গেলে এই অধ্যয়নকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের পথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি এই দুটি প্রশ্নে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমন একটি অবস্থায় *অনীক* পত্রিকা প্রস্তাবিত ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র কী, সেই প্রশ্নটি ঘিরে বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সিপিআইএম-এর মতো মূলস্রোতের পার্টিগুলি বা তাদের মতো করে চিন্তা করায় অভ্যস্থ পার্টিগুলি বিশ্লেষণ করে নিদান দিয়েছে যে ভারত দেশটি রাজনৈতিক দিক থেকে একটি স্বাধীন দেশ। এই দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজটি বর্তমান শাসনব্যবস্থায় সংসদের মাধ্যমে নির্বাচন মারফত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব। যদিও তারা তাদের পার্টি কর্মসূচিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছে, কিন্তু বাস্তব অনুশীলনে তারা বর্তমান প্রেক্ষিতে কৃষি-বিপ্লব সহ কোনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন করছে না। অন্য একটি চূড়ান্ত অবস্থানে রয়েছে একদল গোষ্ঠী ও পার্টি, যাদের মূল্যায়ন হলো ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। ভারত দেশটি একটি পুঁজিবাদী দেশে পর্যবসিত হয়েছে এবং এখানে বিপ্লবের স্তর হলো সমাজতান্ত্রিক। যদিও তারা বিমূর্তভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমের কথা বলে, কিন্তু ভারতের নির্দিষ্ট অবস্থার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমকে স্বীকার করে না।

এই দুটি অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে সিপিআই(এমএল) পার্টির ১৯৭০ সালের প্রথম (অষ্টম) কংগ্রেসে যে কর্মসূচি গৃহীত হয়, সেখানে ভারতের অবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা হয় যে প্রাক-বিপ্লব চীনের মতো ভারতও একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এখানে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের এবং এই দ্বন্দ্বের নিরসন

হলে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাপক জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের নিরসন সহ অন্যান্য সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হবে। ভারতের বিপ্লবের পথ হিসেবে চীনের জনযুদ্ধের পথকেই চিহ্নিত করা হয়। যে রণকৌশলগত লাইন হাজির করা হয় সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামকেই সংগ্রামের একমাত্র রূপ বলে বর্ণনা করা হয়। এখানে 'শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন' মারফত গেরিলা সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান রাখা হয়। ১৯৭২ সালের প্রবল ধাক্কা এবং বিভাজনের পর যে সমস্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, তাদের মধ্যে রণকৌশলগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেকেই সশস্ত্র সংগ্রামই যে সংগ্রামের একমাত্র রূপ এই লাইন, শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন ইত্যাদি বর্জন করে। অনেকেই রণনীতির ক্ষেত্রে গণলাইন-এর প্রয়োজনীয়তা মেনে নেয়। এই সব বিষয় তাদের প্রকাশিত দলিল থেকেই জানা যাচ্ছে। কিন্তু এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে যারা দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে রয়েছে থেকে শুরু করে যারা নৈরাজ্যবাদী অবস্থানে রয়েছে, তারা সবাই-ই এখনও ১৯৭০-এর লাইনকেই উর্ধ্বে তুলে ধরে। আমরা এখানে যুক্তি দিয়ে দেখাবো যে এই ১৯৭০-এর মূল্যায়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশকগুলোর চমকপ্রদ বিকাশের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের বিরোধী। এই ধারণা বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে।

ভারতের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা

সিপিআই(এমএল) গঠনের সেই শুরুর দিনগুলিতেও এই লাইনের অনুশীলনের ফলাফল ছিল বিপর্যয়কারী। আন্দোলনটি ১৯৭২-এর মধ্যেই অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অচিরেই সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের উত্থান ঘটে। এই আন্দোলন দমনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ১৯৭৫ সালে ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে। জরুরি অবস্থা বিরোধী সফল আন্দোলনের ফলে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সত্ত্বেও, মাও-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুঁজিবাদী পথের অনুসারীরা চীনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এই সমস্ত চমকপ্রদ বিকাশ থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছ থেকে উত্তর দাবি করেছিল। এছাড়াও ১৯৭০ -এর দশকের শেষভাগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এক নতুন ধনীকৃষক-কৃষিবুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, যারা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে ছিলো সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ওপর থেকে নিষ্পন্ন করা 'জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন সমূহ', কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন, অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন। এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ হাজির করা প্রয়োজন ছিলো। এই সব পরিবর্তনের জন্য কৃষি বিপ্লবের জন্য নতুন পথ গ্রহণের দরকার ছিলো।

এই প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একাংশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবস্থার নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই বিশ্লেষণের জন্য তারা ইতিপূর্বেই কমিনফর্ম-এর মুখপত্র, 'ফর ল্যাস্টিং পিস, ফর পিপলস ডেমোক্রাসি' এবং ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন মার্কসবাদী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাপত্র-র অধ্যয়ন সহ চীনা পার্টি ১৯৬৩ সালে সোভিয়েত পার্টির সংশোধনবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত বিতর্ক পরিচালনার সময় যে অবস্থান গ্রহণ করে, তাও অধ্যয়ন করে। এখান থেকে বেরিয়ে আসে যে সাম্রাজ্যবাদ অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা যেমন বলেছিলো তা ঘটেনি। বরং সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে আরও বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক নয়া উপনিবেশবাদের এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আরও দেখানো হয় যে পুরোনো উপনিবেশগুলো নয়া-উপনিবেশে পর্যবসিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রশিক্ষিত নতুন দালালদের মাধ্যমে নতুন রূপে পুরনো উপনিবেশগুলিতে ক্ষমতা ধরে রাখছে।

১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত সংস্কার নীতির যে বিকাশ ঘটেছে তার চরিত্র, এর ফলে উদ্ভূত নতুন শ্রেণী সম্পর্কগুলি এবং যে নতুন কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়, তার সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ না করেও বলা যায় যে এগুলি 'কৃষকের হাতে জমি' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কৃষক সংগ্রামের বিরোধী। কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি এই সমস্ত সংগ্রামকে সমর্থন জানায়। পরবর্তী সময়ে এই সব বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির কিষান সংগঠনগুলি এই শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, যদিও 'কৃষকের হাতে জমি'-র শ্লোগান তাদের কর্মসূচিতে যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েই উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দশকের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের রূপের পরিবর্তন নিয়ে, ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র নিয়ে, নতুন দিশায় অধ্যয়ন ও আলোচনা জমে ওঠে। ১৯৭০-৭৮ সময়কালে *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* পত্রিকায় এমন অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবী গোষ্ঠী এবং যে সমস্ত বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী যাঁরা এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে এই নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের রূপ দিয়ে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসমূহ হাজির করা হয়েছিলো, সেদিকে বিশেষ নজর না দিয়ে ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক মূল্যায়ন আঁকড়ে থাকেন। যদিও পাঞ্জাবের সবুজ বিপ্লব প্রভাবিত কিছু কিছু অংশে এই পরিবর্তন অধ্যয়নের কিছু প্রয়াস দেখা গিয়েছিলো, কিন্তু আগেকার অবস্থান সমর্থন করার বিষয়টি দুর্বল ছিলো। কিছু বুদ্ধিজীবীও এই পথে সামিল হন। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর

মার্কিন দেশের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের বিষয়টি পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। তাঁরা তাঁদের আলোচনা কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী উৎপাদনের ধরনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ববাদী পরিবেশে যত খণ্ডিত বা বিকৃত ভাবেই হোক না কেন, ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে তাঁরা অস্বীকার করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে *কেন্দ্র/প্রান্ত বা অধীনতার* তত্ত্ব প্রচারকারী প্রবন্ধসমূহকে আক্রমণ করে উৎসা পট্টনায়েক একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন এবং কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশ ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণও 'মূলস্রোতের বামপন্থী' দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি।

এই প্রেক্ষিতে হাজমা আলভি (১৯৭৫) কৃত অধ্যয়ন ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী সময়ের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা বাস্তবে যা ঘটেছিলো তার অনেক কাছাকাছি। তিনি বলেছিলেন "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা স্থানীয় বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও স্থানীয় আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটায়- যখন তুলো, নীল, পাট-এর মতো অন্যান্য পণ্যসামগ্রী, যা ভারতীয় কৃষকরা উৎপাদন করছে, সেগুলো রেল ও বাষ্পীয় পোত বাহিত হয়ে ইংল্যান্ড পাঠানো হতে থাকে...। এটা আর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা রইলো না। এটা তখনই ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে।" তিনি তারপর আরও অগ্রসর হয়ে দেখান যে ঔপনিবেশিক আমলেই একটি *প্রান্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা*-র বিকাশ শুরু হয়েছিলো। এটি এই অর্থে প্রান্তিক ছিলো যে, পণ্য পরিচলনের বর্তনী শহরের কেন্দ্রর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি মারফত সম্পূর্ণ হচ্ছে... যা কিনা পুঁজির পুনরুৎপাদনের একটি রূপ। পুঁজি উৎপন্ন হচ্ছে উপনিবেশে কিন্তু তার পুঞ্জীভবন ঘটাচ্ছে উপনিবেশবাদীরা। তাঁর মতে প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থা থেকে পরিবর্তন তীব্র হয়ে উঠেছিলো এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী দশকগুলোকে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। যদিও বেশ কিছু পুরনো রূপ তখনও বর্তমান ছিলো, কিন্তু অন্তর্নিহিত মৌলিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে যায়। যাঁরা এই উৎপাদন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের মধ্যে হাজমা আলভি-র অবস্থান বাস্তবের অনেক কাছাকাছি ছিলো। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রাম করার বিপরীতে ধনীকৃষক-কৃষিভিত্তিক বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের দাবি কৃষি উপকরণে ভরতুকি দেওয়া এবং উৎপাদিত পণ্যে উৎসাহদান-মূল্য পাওয়ার বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখে।

এই প্রেক্ষিতে, ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একাংশ উপনিবেশ থেকে নয়া-উপনিবেশ রূপে পরিবর্তনের কালে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের 'বি-উপনিবেশীকরণ' পদ্ধতির মাধ্যমে রূপের পরিবর্তন অধ্যয়ন করতে প্রয়াসী হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কৃষিক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতিফল বিচার করেন। ১৯৮৪ সালে 'ভারত : উন্নয়ন না বঞ্চনা' নামে এই অধ্যয়ন প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনা থেকে বেরিয়ে আসা বোধ যা পূর্ববর্তী আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধারণার বদলে নয়া উপনিবেশের ধারণা সহ নতুন যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা নিয়ে গভীর আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক বিশ্লেষণ সহ অন্যান্য যে সমস্ত ধারণার কথা আগে বলা হয়েছে, এই বিশ্লেষণ যদিও তার থেকে অনেক ভিন্ন দিশা হাজির করে, কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিগুলির প্রতি তখন যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ঔপনিবেশিক আমলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে কৃষিক্ষেত্রটি আন্তর্জাতিক বাজারের অঙ্গীভূত হলেও সামন্তবাদী বা আধা-সামন্তবাদী শক্তিগুলিই যে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের জন্য সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিলো, এই মূল্যায়নটি মূলত সঠিক ছিলো। ঔপনিবেশিক আমলে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানো জমিদারি এবং রায়তদারি ব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে বাগিচা অর্থনীতি নিয়ে যে কোনো গভীর অনুসন্ধান করলেই এই মূল্যায়নের সত্যতা নিরূপণ করা যায়। ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতে নয়া-উপনিবেশের প্রক্রিয়ার অধীনে যা ঘটেছিলো তা হলো একটি বিশেষ চরিত্রের পুঁজিবাদী বিকাশ। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে বা পরে যা ঘটেছিলো, ভারতের এই চরিত্র তার চেয়ে ছিলো ভিন্ন। নয়া-উপনিবেশের অধীনে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে তাদের তাঁবেদারদের মারফত সামন্তবাদী, আধা-সামন্তবাদী, প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা প্রাক্-পুঁজিবাদী বলা যায় না। তাই বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদী/আধা-সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে তার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে না। সাম্রাজ্যবাদ এই সম্পর্কগুলিকে দ্রুত রূপান্তরিত ক'রে কৃষিক্ষেত্রে লগ্নিপুঁজি, বাজার এবং আধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানোর কাজে সহায়তা করে। ক্রমবর্ধমান দ্রুততার সঙ্গে নয়া-উপনিবেশের আওতায় পুঁজিবাদী রূপান্তর তীব্রতর হচ্ছে, কেবল কোনও কোনও অঞ্চলে সামন্তবাদী অবশেষ অবশিষ্ট থাকছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলোতে এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলো ছিলো বিশ্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ। এই সময়টি নির্দিষ্টভাবে অধ্যয়ন করলেই এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে এই সময়কালে শক্তির ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অক্ষশক্তি পরাভূত হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে, তার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা খুইয়ে বসে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেতৃত্বের ভূমিকায় উঠে আসে। সারা বিশ্ব জুড়ে তার নির্মম, আগ্রাসী একচেটিয়া কর্তৃত্বের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক আমলে যে দেশগুলোকে মার্কিন দেশ পদানত দেশে পরিণত করেছিলো, এই পদক্ষেপগুলো ছিলো তারই নিরবচ্ছিন্ন ধারবাহিকতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যাওয়াকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ 'বি-উপনিবেশীকরণ'-কে সামনে আনে। এর অর্থ ছিলো উপনিবেশগুলিতে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, উপনিবেশিক লুণ্ঠনের নয়া-ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে রূপান্তর ঘটিয়ে স্বাধীনতা প্রদান। এই ব্যবস্থা ছিলো সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের এক গুণগত পরিবর্তিত অবস্থা। লেনিন যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের মৌলিক গতিসূত্রগুলিকে দেখিয়েছিলেন, মূলত সেগুলিই ক্রিয়াশীল ছিলো।

এই 'নতুন স্বাধীনতা পাওয়া' দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ যদিও সাহায্য, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে আরও কঠোর লগ্নিপুঁজির ফাঁসে জড়িয়ে ফেলেছিল, তবুও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কেইনসীয় তত্ত্ব মোতাবেক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করা এবং কল্যাণকর নীতিমালার কথা বলতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী পথে অধঃপতিত হওয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া ঔপনিবেশিক নীতি আরও তীব্র করে তোলে। এই কাজের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্বতন সমস্ত উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত হওয়ার বিভিন্ন দশায় উপনীত করে। এত সব কৌশল সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা একটি নতুন সাধারণ বাধার সম্মুখীন হয়— *মন্দা ও স্ফীতি-র সমস্যা*, যা ১৯৭০-এর দশকে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিরোধে তারা নয়া-উদারনীতির নতুন যুদ্ধ শুরু করে। নয়া-উপনিবেশগুলিকে ঋণদানের সময়কাল নতুন করে ঠিক করার মতো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে নয়া-উপনিবেশগুলোর অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির প্রত্যক্ষ আওতায় আনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়— বিশ্বায়ন-উদারিকরণ-বেসরকারিকরণের মাধ্যমে নয়া উপনিবেশের অর্থব্যবস্থাকে বাজার অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলে। গত ছয় দশকে এই সমস্ত ঘটনা ঘটার ফলে দুনিয়া একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ও অন্যদিকে নয়া-উপনিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সুবিপুল সংখ্যক দেশসমূহে বিভক্ত হযে পড়ে।

ভারত সপ্তদশ শতক থেকেই ব্যবসায়ী পুঁজি লগ্নির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠতে থাকতে থাকে এবং ১৭৫০ নাগাদ দেশটি একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পর্যবসিত হয়। উপনিবেশ থেকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত হওয়ার বিশ্বজোড়া প্রক্রিয়ায় ভারতও উপনিবেশ থেকে মুৎসুদ্দি-আমলা-বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার অংশ নেয়। আমরা আগে যে সমস্ত উপাদানের কথা আলোচনা করেছি, তাদের প্রভাবে ১৯৫০-এর সময়কাল থেকে ভারতে একটি সবল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র নির্মাণের ভিত্তি তৈরি হতে থাকে। 'সমাজতান্ত্রিক মোড়কে'-এ কেইনসীয় নীতির আওতায় কল্যাণমূলক পদক্ষেপ, 'উপর থেকে ভূমিসংস্কার নীতি' এবং 'প্রবৃদ্ধি'-র নীতি গৃহীত হয়। ১৯৬০-এর দশকে লগ্নিপুঁজির ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে নয়া-উপনিবেশ প্রক্রিয়া তীব্রতর হওয়া শুরু হয়। এর ফলে ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ভারতের ওপর চাপানো সম্ভব হয়। ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি ও বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে— অর্থনীতির সর্বত্র ফাট্‌কা পুঁজি দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুরনো উপনিবেশবাদের নীতিসমূহ কেমনভাবে নয়া-উপনিবেশবাদী নীতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকেই দেখা গিয়েছে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ প্রবর্তিত সংশোধনবাদের উদ্ভব সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষার বিপরীত যাত্রার জন্ম দেয়। এই ধারা মতে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় যে সমস্ত বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তা অস্বীকার করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়নি। তাই নয়া-উপনিবেশবাদী অবস্থায় যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন পড়েছিলো তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অধঃপতিত হয়ে পড়ে; সেই সব দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ছত্রচ্ছায়ায় ও নির্দেশে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী অতি-ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেননি। এই নতুন সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া খুব শীঘ্রই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নয়া-উপনিবেশবাদী লুণ্ঠনের রাস্তা গ্রহণ করে।

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কের দলিলে মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নয়া-উপনিবেশবাদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। চীনা

পার্টির অভ্যন্তরে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যদিও ক্ষমতার অবস্থান থেকে দক্ষিণপন্থীদের অপসারণ করা হয়েছিলো, কিন্তু ১৯৬৯-এর চীনা পার্টির নবম কংগ্রেসের সময় থেকে অতি-বাম সংকীর্ণতাবাদীরা প্রভুত্বকারী অবস্থানে পৌছায়। এই কংগ্রেসে তারা 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ'-কে পরিবর্তিত করে '*সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত হওয়া এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয়*'-এর শ্লোগান তুলে ক্ষমতা দখলের হঠকারি লাইন সামনে আনে।

এমন এক সংকীর্ণতাবাদী লাইনের প্রভাবে সিপিআই(এমএল)-সহ সেই সময়ে তৈরি হওয়া অন্যান্য সব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনগুলো যান্ত্রিকভাবে আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক লাইন সহ 'চীনের পথ'-কে তুলে ধরে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৬ সালে লিন বিয়াও-রচিত 'জনযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক' প্রবন্ধের সূত্র ধরে, এবং তারা আন্তর্জাতিক স্তর সহ ভারতে যে সমস্ত পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে সেগুলির বিষয়ে নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো ভারতেও মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা সিপিআইএম-এর অভ্যন্তরে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সময় থেকেই আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কের অবস্থান থেকে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের রূপের পরিবর্তনের প্রশ্নটি রাখার প্রচেষ্টা চালান। নকশালবাড়ী ঘটার পর *লিবারেশন*-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিলো। কিন্তু তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অবদান কখনই 'নয়া উপনিবেশবাদের ফেরিওয়ালা' নামক দলিলের বক্তব্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। অন্যান্য প্রবন্ধও এই দলিলের বক্তব্যর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ১৯৭০ সালের সিপিআই(এমএল)-র কর্মসূচিতে ভারত রাষ্ট্রের এবং সমাজের চরিত্রায়ণে আধা-উপনিবেশ এবং নয়া-উপনিবেশ শব্দবন্ধ একে অপরের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো। এই ধারণার কোনও গভীরতর বিশ্লেষণ করা হয়নি। ১৯৭০ দশকের শেষ থেকে যদিও ভারতের অনেক মার্কসবাদী লেনিনবাদী গোষ্ঠীসমূহ চারপাশে ঘটে চলা পরিবর্তনের চাপে পড়ে নয়া-উপনিবেশ এবং নয়া-ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু তাদের প্রায় প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করার পুরনো ধারণায় ফিরে যায়।

নয়া-উপনিবেশের আওতায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন

শিল্পের বিকাশের জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদনের বিষয়টি যে ভারতে সেই ঔপনিবেশিক সময়েই রায়তওয়ারি এবং বাগিচা চাষ নীতির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে শুরু হয়েছিলো তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু 'বি-উপনিবেশিকরণ' যুগে নয়া-উপনিবেশের পুরোনো সামন্তবাদী জমিদারদের ধনী কৃষি-বুর্জোয়াতে পরিণত হওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। এদেরকেই ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকেফেলার ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার দ্বারা নির্দেশিত পথে জমির উর্ধ্বসীমা আইন এবং সবুজ বিপ্লব-এর মতো বিষয়গুলো রূপায়ণের জন্য তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়া ছিলো একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে লগ্নিপুঁজি সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। কৃষিক্ষেত্রে নানান ধরনের সংস্থা এবং এজেন্সির মাধ্যমে ধারাবাহিক গবেষণা, পুঁজি লগ্নি করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো কেইনসীয় নিদানের সঙ্গে প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময়কাল খাপে খাপে মিলে যায়। এই সময় ঘটনাকে নয়া-উপনিবেশের কৌশলের মাধ্যমে ফিনান্স পুঁজির অনুপ্রবেশের চৌখস পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অনুপ্রবেশের মাধ্যমে তখন পর্যন্ত জড়ভরত কৃষি ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতিতে জমির পুঞ্জীভবন, কৃষির সমস্ত কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্যর বাজার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি কৃষি-ব্যবসায় নিযুক্ত বহুজাতিক সংস্থা ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে চলে যায়। এই সমস্ত পরিবর্তনের স্বপক্ষের শক্তিসমূহ পূর্বতন আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক জমি সম্পত্তির রূপান্তর চাইছিলো— এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন আসে।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের যে রূপায়ণ বর্তমানে ঘটছে, যেমন বিহারে, যেখানে প্রথম তরঙ্গের পরিবর্তনের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত শ্লথ, সেখানেও পরিবর্তন আসছে দ্রুত। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে গরিব-প্রান্তিক কৃষকের পক্ষেও কৃষির ওপর নির্ভর করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এমন কি মধ্যচাষিরাও কৃষির ওপর নির্ভর করতে না পেরে লাখ লাখ চাষি আত্মহননের পথে পা বাড়াচ্ছেন। এর ফলে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে চাষির জমি জমিদারের হাতে হস্তান্তরের বিপরীত প্রক্রিয়ার সাক্ষী থাকছি আমরা। বর্তমানে জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত যে সব আইন-কানুন রয়েছে তা অকার্যকর করা হয়েছে। এই কাজ জমির পুঞ্জীভবনে সহায়ক হয়েছে। বাজারের জন্য উৎপাদন করা এবং কৃষককে ক্রমবর্ধমানভাবে লগ্নিপুঁজি এবং বাজারের আওতায় আনার প্রক্রিয়াটি তীব্রতর হয়েছে।

যারা এই পরিবর্তনকে উপলব্ধি করছে তারাই আজ কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিক, গরিব প্রান্তিক কৃষকশ্রেণীকে ক্রমবর্ধমানভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সংঘবদ্ধ করতে পারবে। তারাই পারবে এর মাধ্যমে এক নতুন রূপের কৃষি বিপ্লব ঘটাতে। এই বিপ্লব 'কৃষকের হাতে জমি' থেকে দ্রুত সমবায়করণ এবং কমিউন গঠন, সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নেতৃত্ব দেবে। বর্তমানের এই নির্দিষ্ট অবস্থা বুঝতে যারা অস্বীকার করছে, তারা হয় নয়া-উদারনীতির ফেরিওয়ালা বনে যাবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নয়া উদারনীতিবাদ, নাকি নয়া জনমোহিনীবাদ?

বির্তকের প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্র

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য

ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বির্তকের ঝড় কয়েক দশক যাবৎ অনেকটাই স্তিমিত। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা বরং বিশ্বায়িত ভারত তথা বিশ্বে ধনতন্ত্রকে অপরাক্রান্ত, অনিবার্য এবং অপরিবর্তনশীল ব্যবস্থা রূপেই দেখতে শিখেছে। যেন যে ব্যবস্থা জলহাওয়া পাথরের মত সর্বব্যাপী, সেটা নিয়ে বিতর্কের কী বিষয় থাকতে পারে? বিশ্বায়িত বিশ্বে ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে প্রশিক্ষিত হতে, যেটা কাজে লাগিয়ে বিশ্বায়িত কর্মের বাজারে জায়গা করে নেওয়া যায়। যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আলোয় নিজের চেতনাকে বিকশিত করা গৌণ ব্যাপার। তাই 'কৃষি' যেন অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। আর সেটা চর্চা করার সময় কোথায়? তাই বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর যাটের ও সত্তরের দশকের ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কিত বির্তক ফুটনোটেও উঠে আসেনা।

২০১০ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি* পত্রিকায় বারবারা হ্যারিস হোয়াইটের প্রকাশিত দুটি লেখা সেই পুরনো বির্তককে পরিবর্তশীল ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সামনে নিয়ে এসেছে।[১] কিন্তু সে লেখার বিশ্লেষণে পরে আসব। প্রথমে যাটের দশকে ফেরা যাক। ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক কী, সেটা নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বামপন্থী দল বা মূল দলের অভ্যন্তরে তীব্র বিতর্ক ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ মনে করতেন ভারতীয় কৃষিতে জাতীয় বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর হাত ধরে দ্রুত ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে বা ঘটেছে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে এই প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা। এই মতাবলম্বীদের অংশটি ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের সময় এস এ ডাঙ্গের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রূপ নেয়। অন্যদিকে আরেক দল মনে করতেন ভারতের শাসক শ্রেণীর মধ্যে বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী দুইয়েরই প্রভাব রয়েছে। কারণ ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা হল আধা ধনতান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক। তাই কমিউনিস্ট পার্টির উচিত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে একটি জনগণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং সেইমত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে পরে সেই রাষ্ট্রই ধনতন্ত্রের অসমাপ্ত বিকাশ সম্পাদন করে দ্রুত সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে পারবে। এই মতের যারা কাণ্ডারী তারাই তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করেন। অন্যদিকে আর এক দল মনে করতেন ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা হল আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা উপনিবেশিক। ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে সামন্তপ্রভু ও নয়া উপনিবেশিক শাসকশ্রেণী। এই তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল শাসকজোট কোন বিকাশই হতে দেয়নি। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা কৃষকশ্রেণী। তাই কমিউনিস্টদের অবিলম্বে কৃষকশ্রেণীকে সংঘটিত করে চীনের আদলে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ধরে কৃষিভিত্তিক নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে। এই মতাবলম্বীরাই নকশালবাড়ির কৃষি সংগ্রামকে সামনে রেখে সশস্ত্র বিপ্লবে ব্রতী হন ও সিপিআইএম থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিপিআইএমএল গঠন করেন।

প্রাথমিক ভাবে যে বির্তক কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যাটের দশকে সবুজ বিপ্লব শুরুর প্রেক্ষাপটে তা উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে এবং বামপন্থী পণ্ডিত ও অধ্যাপকরা এই বিতর্কে সামিল হন।[২] পণ্ডিত মহলে বির্তকের সূত্রপাত আশোক রুদ্র, এ মজিদ, ও বি ডি তালিবের একটি গবেষণা পত্র থেকে। সবুজবিপ্লবের ফলে পাঞ্জাবের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে কিনা এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে রুদ্র ও অন্যান্যরা পাঞ্জাবের ২০ একরেরও বড় জোতের চাষীদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অশোক রুদ্রের প্রশ্ন ছিল ২০ একরেরও বড় জোতের মালিকেরা সবুজ বিপ্লবের ফলে উপকৃত হয়ে ধনতান্ত্রিক কৃষির পথ বেছে নিয়েছে কিনা। রুদ্র ধনতান্ত্রিক কৃষিসম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের তথ্য সামনে আনেন। যথা, বড় চাষিরা কি বাইরে থেকে ঠিকা মজুর লাগিয়ে চাষ করাচ্ছে, নাকি নিজেদের পারিবারিক শ্রমেই চাষ করছে? চাষিরা কি ব্যাপকভাবে ফসল বিক্রি করে মুনাফা করার জন্য চাষ করছে, এবং তা যদি সত্যি হয়, তারা কি ফসলের উদ্বৃত্ত বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করছে? চাষিরা কতটা যন্ত্রের ব্যবহার করছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। রুদ্র এই সব বিষয়ের মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের সহযোগ (Correlation) বের করে দেখান তার পরিমাণ অত্যন্ত কম, যা কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রশ্নকে খারিজ করে। এর আগে ড্যানিয়েল থরনার তাঁর এক ভ্রমণবৃত্তান্তে ফলাও করে বলেছিলেন, পাঞ্জাবের গ্রামে সবুজবিপ্লব এক সুসজ্জিত ভদ্রলোক বুর্জোয়া চাষি সৃষ্টি করেছে।

তারা অনেকেই সবুজবিপ্লবের ফলে চাষে মুনাফার গন্ধ পেয়ে শহরের বাবুগিরি ছেড়ে গ্রামে এসে জমি কিনেছেন। রুদ্র দেখান, এই তত্ত্ব একেবারেই খাটেনা; কারণ তার গবেষণায় বড় জোতের চাষিরা ব্যাপকভাবে আদিকাল থেকে গ্রামেরই এবং বেশির ভাগই মূর্খ বা স্বল্পশিক্ষিত।

উৎসা পটনায়েক রুদ্রের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে বিতর্কে নামেন। উৎসা বলেন, রুদ্র-কথিত সহযোগের পরিমাণ কম হওয়া মানেই ধনতন্ত্রের সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যাওয়া, এটা ঠিক নয়। বরঞ্চ বলা যায় এই ধরনের সহযোগের পরিমাণ খুব বেশি হবে এমন ব্যবস্থায় যেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে। যেমন পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিব্যবস্থা। কিন্তু ভারতের মত দেশে বিতর্কের মূল বিষয়টিই যেখানে হলো অনগ্রসর প্রাক-ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে সবুজবিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা, সেখানে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বড় সহযোগের পরিমাণ খুঁজতে যাওয়া অযৌক্তিক। পটনায়েক বলেন, ঠিকা মজুর লাগিয়ে চাষ, বা পণ্যোৎপাদন এসবই প্রাসঙ্গিক তথ্য, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। কারণ ঔপনিবেশিক ভারতে যখন কৃষকদের জবরদস্তি নীল, আফিম, তুলো বা পাট চাষ করানো হয়েছিল তখনও তাদের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থাৎ ঠিকা মজুরি ও পণ্যোৎপাদনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে করে আর যাই হোক কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়নি। কারণ উদ্বৃত্ত শ্রমের নিষ্কাষণ হয়েছিল ভারতে আর উদ্বৃত্ত মূল্য পুনর্বিনিয়োগ হয়েছিল ব্রিটেনে। তাই কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের পূর্বশর্ত হল উৎপাদন এবং উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগ, যে বিষয়টি শ্রীরুদ্র গুরুত্ব সহকারে বিচার করেননি। পটনায়েক তার নিজস্ব গ্রামসমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে ভারতীয় কৃষিতে একটি ছোট অথচ কার্যকর ও ক্রমবর্ধমান ধনতান্ত্রিক কৃষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এবং সীমিত হলেও ভারতে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার বিকাশ সাধন হয়েছে। রুদ্র ও পটনায়েক ছাড়াও এই বিতর্কে আরও বেশ কয়েকজন পণ্ডিত অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে সেইসব আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না, তবে এই প্রসঙ্গে একজনের নাম না করলেই নয়। তিনি হলেন অমিত ভাদুড়ি। ১৯৭৩ সালে মূলস্রোতের একটি বিখ্যাত অর্থনৈতিক জার্নালে প্রকাশিত তার গবেষণাপত্রে[৩] পটনায়েকের উল্টো পথে হেঁটে তিনি দেখান, ভারতীয় কৃষিতে মহাজনি কারবারের মধ্যে দিয়ে জমিদারশ্রেণী এক ধরনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছে। ভাদুড়ি দেখান, ভারতীয় কৃষিতে ব্যাপকভাবে ভাগচাষ প্রথা প্রচলিত। আসলে ভাদুড়ি তাঁর গ্রাম সমীক্ষা করেছিলেন, বীরভূমের কিষানি ব্যবস্থার পটভূমিতে, যার নির্যাস তিনি সার্বিক ক্ষেত্রে দাঁড় করান। ভাদুড়ি দেখান, একজন জমিদার তার ভাগচাষির কাছ থেকে দুটো সূত্রে আয় করতে পারে— (১) ভাগচাষির প্রদেয় খাজনা থেকে, (২) মহাজনি শোষণের মাধ্যমে ফসলের অভাবি বিক্রয় (স্বল্পদামে) কয়েক মাসের মধ্যেই ভাগচাষিকে খাদ্যশস্যের অভাবি ক্রয়ের (বেশি দামে) দিকে ঠেলে দেয়। আর সে বেচারার তখন অত্যন্ত উঁচু সুদে ও দামি বন্ধকের বিনিময়ে জমিদারের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই ঋণ আর পরিশোধিত হয় না। কারণ কৃষক ঋণের ফাঁদে পড়ে, যেখানে জমে ওঠা সুদের অংক ছাপিয়ে যায় ঋণের মূল অংককে। আর এটাই জমিদার চায়। সুদ ও দামি বন্ধক আত্মসাৎ করে মহাজনি কারবারে ফুলে ফেঁপে ওঠে জমিদার। আর তাই গ্রামে সবুজবিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও জমিদাররা দেখে, সবুজবিপ্লবের সুফল পাওয়ার পর উৎপাদন বেশ কিছুটা বাড়বে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ভাগচাষিও খাজনার অনুপাতে বর্ধিত উৎপাদন থেকে বেশি ফসল পাবে, যা তাকে ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি দেবে এবং জমিদারের মহাজনি কারবার উঠে যাবে। জমিদার হয়ত দেখবে, সবুজবিপ্লবের বর্ধিত উৎপাদনের লাভ থেকে তাঁর বর্তমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় খাজনা ও মহাজনি কারবার থেকে লাভের অংক তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই সে সবুজবিপ্লব গ্রহণ না করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই চালিয়ে যাবে। সে স্তব্ধ করে দেবে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের সব সম্ভাবনা।

ভারতে নয়া উদারনীতিবাদী সংস্কারের দু'দশক ও প্রত্যাবর্তনের পথে উৎপাদন ব্যবস্থামুখী বিতর্ক

১৯৯১ সালে ভারতের সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকারের হাত ধরে অনুপ্রবেশ ঘটে নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক সংস্কারের। ক্ষমতায় আসা মাত্রই তারা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, এবং সেই ঋণের শর্তাবলী অনুসারে শুরু হয় 'আর্থিক সংস্কার' যার পোষাকী নাম 'কাঠামোগত সংস্কার প্রকল্প'। এই সংস্কারের মূল বিষয়গুলি হলো:

* সর্বস্তরের গরিব মানুষকে প্রদেয় ভর্তুকি ছাঁটাই, বিশেষ করে খাদ্য, সার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে ভর্তুকি ছাঁটাই। আর, উল্টে বৃহৎ পুঁজিকে ভর্তুকি প্রদান।

* আমদানি-রপ্তানির উপর সব বাধা নিষেধ প্রত্যাহার। খাদ্য উৎপাদন থেকে হাত গুটিয়ে কৃষিক্ষেত্রকে রপ্তানি-নির্ভর করে তোলা।

* প্রাতিষ্ঠানিক গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থাকে অকেজো করে এনজিও-নির্ভর মাইক্রো-ক্রেডিট সংস্থাকে শক্তিশালী করা।

* সর্বসাধারণের জন্য খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তা বিপিএল কার্ড অধিকারীদের জন্য সীমিত করে দেওয়া এবং বিপিএল কার্ডবিহীন বিরাট অংশের মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, খুচরোয় বৃহৎ কর্পোরেট শৃঙ্খল (corporate retail chain) ও সর্বোপরি বৃহৎ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে ব্যাপকভাবে বেসরকারি তথা

বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ।

এত সব আর্থিক সংস্কারের নীট ফলাফল কী? ভারতের স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম কৃষি অগ্রগতির হার নেমে এল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের নিচে। এবং তাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর বা আশির দশকের ২.৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১.৮ শতাংশে নেমে আসার পরও, কৃষিক্ষেত্রের অবনমন ঘটে ৩.৫ শতাংশ থেকে ১.৬ শতাংশে। এখানে বলে রাখা ভালো, ১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় কৃষি নিরবচ্ছিন্ন চমৎকার বৃষ্টিপাত জনিত ভাল মরশুম পাওয়ার পরও এই অবস্থা। কৃষির খরচ এমনই বেড়ে যায় যে সাধারণ চাষিদের পক্ষে কৃষিতে লাভের মুখ দেখাই কঠিন হয়ে পড়ে। সব থেকে বিপদে পড়েন যারা মুক্ত বাণিজ্যের সওয়ারি হয়ে সরকারি প্ররোচনায় খাদ্য উৎপাদন থেকে সরে গিয়ে মহাজন তথা মাইক্রোক্রেডিট সংস্থার থেকে ঋণ নিয়ে রপ্তানি-নির্ভর দ্রব্য উৎপাদনে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৯১ সাল থেকে এখন অবধি তিন লক্ষের কাছাকাছি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।[৪] সরকারের তরফে 'ইন্ডিয়া শাইনিং' কার্পেটের অন্তরালে সংখ্যাতাত্ত্বিক কারচুপির মাধ্যমে চেষ্টা হয়েছে দারিদ্র্যকে কমিয়ে দেখানের যা অভিজিৎ সেন (২০০৫)[৫] এবং উৎসা পট্‌নায়েকের (২০০৫)[৬] গবেষণায় ফাঁস হয়ে গেছে।[৭]

কিন্তু ভারতবর্ষে মুক্ত বাজার অর্থনীতিবিদ তথা নয়া উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের বড় গলায় বলার কী ছিলো? তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, ধনতন্ত্র যেহেতু যেকোনো প্রাক সভ্যতা থেকে উন্নত মানের সমাজ, তাই নয়া উদারনীতিবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষ ধনতন্ত্রের উন্নত রূপ দেখবেন ও উন্নয়নের পথের সওয়ারি হবেন। এখানেই পুরনো বিতর্কের প্রত্যাবর্তনের এক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। নয়া উদারনীতিবাদী সংস্কারের মাধ্যমে সত্যি কি ভারতীয় অর্থনীতিতে, বিশেষত ভারতীয় কৃষিতে, ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে, কেমন সে ধনতন্ত্র? একই সঙ্গে সত্যি সত্যি কি এই পরিবর্তন ভারতীয় কৃষিতে ও গ্রামীণ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে?

এই প্রসঙ্গেই *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল* উইকলিতে ২০১১ সালে প্রকাশিত অল্পা শাহ এবং বারবারা হ্যারিস হোয়াইটের প্রবন্ধ সত্তরের দশকের ফেলে আসা বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। ২০১০ সালে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণাপত্রে বারবারা বলেন : "[সাম্প্রতিককালে] অত্যন্ত উন্নতমানের কর্পোরেট পুঁজির মাধ্যমে যথেচ্ছ বিভাজিকরণ (differentiation) হওয়া সত্ত্বেও... ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদনের সাধারণ ব্যবস্থারূপে বিরাজ করছে। ...এই ব্যবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী বলা যায় না... বরং মনে হয় ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা এখানে স্থায়ী হবে।" ২০১১ সালের গবেষণাপত্রে অল্পা শাহ ও বারবারা হ্যারিস হোয়াইট আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন, "ভারতবর্ষ... কৃষক ভিত্তিক উৎপাদন (peasant production) থেকে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের একটি প্রক্রিয়া অবলোকন করছে, যেখানে উৎপাদকের হাতে রয়েছে ক্ষুদ্র পুঁজি এবং শ্রম। এবং তারা উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রণও সম্পূর্ণ হারায় নি।"

ধ্রুপদী মার্কসীয় পদ্ধতিগত ঘরানাকে চ্যালেঞ্জ করে অল্পা শাহ ও বারবারা হ্যারিস হোয়াইট বলেন: "...বর্তমানে গ্রামগুলি আর প্রজাতন্ত্র (republic) নয়; বরং অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা মরশুমি ঠিকা শ্রমিকদের প্রচরণ (migration), গ্রামের অ-কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ও ক্ষুদ্র কৃষি উৎপাদন ইত্যাদি দেখা দরকার।" এই বিষয়গুলি নতুন ভাবে পুরনো শ্রেণীবিন্যাসকে (যথা 'গরিব কৃষক', 'ধনী কৃষক') বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতাকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাবোধকে তুলে ধরে, এই প্রসঙ্গে বর্তমানে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার গ্রামের বাইরে বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে তাদের উৎপাদনপ্রক্রিয়ার যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন, তার মর্মার্থ উন্মোচন করা দরকার।"

কিন্তু বামপন্থী চিন্তাবিদ বারবারা হ্যারিস হোয়াইটের এ হেন উপলব্ধির পিছনে সংখ্যাতত্ত্বের সত্যতাটা কী? অল্পা শাহ ও বারবারা হ্যারিস হোয়াইট অনেকটা অত্যুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন কর্মসংস্থান ও বেকারি নিয়ে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসএসও)-এর ৬১তম রাউন্ডের (২০০৪-০৫) তথ্য দেখে : "গ্রামীণ অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ-কৃষি ক্ষেত্রের বিকাশ হয়েছে... এনএসএসও-র তথ্য অনুসারে সবচেয়ে বেশি নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে এবং তা বেড়ে চলেছে একটি ক্ষেত্রে এবং তা হল স্বনিযুক্ত ক্ষেত্র (category of self employed)... ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে, যেখানে পরিবারগুলো উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তার থেকেই তারা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিনিময়ের উপর এবং একই সঙ্গে তারা শ্রমের আত্মশোষণ ঘটিয়েছে।"

বারবারা আসলে এখানে পরিসংখ্যানে অপব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া তাঁর মধ্যে স্পষ্টতই এ ভি চায়ানভের চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্কসবাদীদের কাছে চায়ানভ ও তাঁর উত্তরসূরীরা নয়া জনমোহনবাদী (new populist) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, যা তত্ত্বগত, ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত ভাবে ভ্রান্ত। প্রথমে পরিসংখ্যানের প্রশ্নে আসা যাক। এনএসএসও-র ৬১তম রাউন্ডের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪-০৫ ঠিকা শ্রম কমেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান। এটা আপাতদৃষ্টিতে বারবার হ্যারিস হোয়াইটের কাছে খুব আশাব্যঞ্জক মনে হয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায়, কর্মসংস্থানের দুই অবস্থার (status) মধ্যে মুখ্য অবস্থার (principal status) কোন কর্মসংস্থান বাড়েনি, বরং কমেছে। কর্মসংস্থান যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে তা হল

গৌণ অবস্থার (subsidiary status)। এর অর্থ হল কর্মসংস্থানের যা স্ফীতি হয়েছে তা মূলত হয়েছে আংশিক সঞ্চয়ের জন্য, যা গৌণ অবস্থার নির্দেশক। নয়া উদারনীতিবাদী সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রের চরম দৈন্যদশার উল্লেখ করেছি। গ্রামাঞ্চলে লাভজনকভাবে আর চাষবাষ করা যাচ্ছে না। সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে কৃষিক্ষেত্রের বিনিয়োগ। সুতরাং ঠিকা শ্রমিকদের নিয়োগের জন্য আর কোনো চাহিদাই নেই। সুতরাং মুখ্য অবস্থা হচ্ছে কর্মসংস্থানের সংকোচন। কিন্তু ভারতের কৃষি সমাজের যেহেতু ৫৬ শতাংশই শ্রমবৃত্তির উপর নির্ভরশীল, তাই যে কোনো মূল্যে যে কোনো কাজের মাধ্যমে দিন গুজরানের জন্য মরিয়া এই কাজ না পাওয়া বিরাট জনসম্পদ। সুতরাং কেউ রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে চপ ভেজে বিক্রির চেষ্টা করছেন, কেউ বা টুকটাক হকারির চেষ্টা করছেন। এনএসএসও-র সমীক্ষক দল লিখে নিচ্ছেন আংশিক সময়ের জন্য এরা সবাই স্বনিযুক্ত, যাকে জয়তী ঘোষ (২০০১) বলেছেন: এ যেন এক নিদারুণ ঠাট্টা, যেখানে নিরন্ন, অভুক্ত, কর্মহীন সব গ্রামবাসীই নিজেই নিজের 'বসে' (boss) রূপান্তরিত হয়েছেন।[৮] আর এইসব তথাকথিত 'স্বনিযুক্ত' মানুষের আয় যে সাংঘাতিক রকমের কম তা তো বলাই বাহুল্য। গ্রামের ৪০ শতাংশ 'স্বনিযুক্ত' মানুষ মনে করছেন যে তারা ভাল আয় করছেন না, কিন্তু যদি মাসে ১৫০০ টাকার কাছাকাছি তারা পেতেন তবে তাদের মতে সেটাকে ভাল (remunerative) আয় বলা যেত। আরও ৩০ শতাংশ মনে করছেন যদি মাসে ২০০০ টাকার কাছাকাছি আয় করা যেত, সেটা ভাল হত।[৯] এখানে মনে করিয়ে দিই, ২০০৪-০৫ এ দারিদ্য রেখা ছিল দিনে ১০০ টাকা এবং মাসে ৩০০০ টাকা। অর্থাৎ ভারতের শ্রমজীবী গ্রামবাসীরা ভাবতেই পারছেন না যে তারা এই স্বনিযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রমের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবেন। সুতরাং বারবারা হ্যারিস হোয়াইট যাকে সদর্থক অর্থে উত্তরণ বলেছিলেন তাকে আমরা 'ছদ্মবেশী সর্বহারাকরণ' (disguised proletariantism) ছাড়া কোনো কিছুই বলতে পারছি না। সব থেকে খারাপ অবস্থা গ্রামের মহিলাদের। তাদের মধ্যে কর্মজীবীর সংখ্যা বেড়েছে, কাজের ঘন্টা ও পরিসরও বেড়ে গেছে, অথচ কমে গেছে আয় ও মজুরি। বিষয়টি সহজ করে বললে এরকম দাঁড়ায়, বাড়িতে পুরুষমানুষ বেকার, সুতরাং বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানোর দায় যেন মহিলাটিরই। তাই তারা লোকের বাড়িতে, রেস্তোরায় বেশি বেশি করে কম মজুরির পরিচারিকাবৃত্তির কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এটাকে অর্থনীতির ভাষায় 'দুর্দশার মহিলাকরণ' (feminization of distress) বলা যেতে পারে।

সুতরাং ভারতীয় কৃষিতে যা চলছে তাকে কোনোভাবেই ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ না বলে বাজার ব্যবস্থার নেতৃত্বে ধনতন্ত্রের 'গৌরবজনক পশ্চাদপরণ' বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বিতর্কে আমরা একদম শেষে আসব।

এখন আমরা বারবারা হ্যারিস হোয়াইটের তত্ত্বগত বিষয়ে আসি। আমরা আগেই বলেছি বারবারার লেখায় চায়ানভের নয়া-জনমোহিনীবাদের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে। মার্কসবাদের সঙ্গে জনমোহিনীবাদের লড়াই বহুদিনের। জনমোহিনীবাদের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় আর প্রথম জনমোহনকারী হলেন নারদনিক গোষ্ঠী। এরা জনমোহনকারী, কারণ এরা কৃষক সমাজের মধ্যে জটিল শ্রেণীবিন্যাসের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গোটা কৃষক সমাজকে একটি অবিভক্ত, অবিভাজিত (undifferentiated) ও সমপ্রকৃতির (homogenous) সত্তা বলে ভাবতে পছন্দ করতেন। রাশিয়ায় জারের নেতৃত্বে যখন ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছিল তখন তাঁরা এর বিরোধিতা করে বলেন, এতে কৃষকদের দৈন্য বাড়ছে, ও সেই কারণে অভ্যন্তরীণ বাজার না পেয়ে ধনতন্ত্র নিজের বাণে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। লেনিন তার বিখ্যাত বই 'রাশিয়ার ধনতন্ত্রের বিকাশ' গ্রন্থে দেখান ধনতন্ত্র বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিভাজন নিয়ে এসেছে, যা ধনতন্ত্রের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করেছে। ধনতন্ত্রে কৃষকরা কম খান, কিন্তু বাজার থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হন অনেক বেশি। বিকশিত হয় ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বাজার। ১৯২০-র দশকে এ ভি চায়ানভের হাত ধরে আবার নয়া-জনমোহিনীবাদ ফিরে আসে। চায়ানভ কৃষিতে শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব নস্যাৎ করে বলেন, কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি পরিবারই সমপ্রকৃতির। ধনী দরিদ্রের ভেদ সেখানে নেই। প্রতিটি পরিবারই স্বনিযুক্ত, শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত (বর্তমান ভারতীয় কৃষি সম্পর্কেও বারবারা একই কথা বলছেন), কেউ অন্যের জমিতে শ্রমশক্তি বিক্রি করেন না, নিজেরাও বাইরের শ্রমিক ভাড়া করেন না। প্রতিটি কৃষকের জীবনে দুর্দশা যেমন আছে, সুখও আছে। কিন্তু এর সঙ্গে কোন অর্থনৈতিক শোষণের সম্পর্ক নেই। বরং এই সুখ ও দুঃখ কৃষকের জীবনচক্রে শারীরবিদ্যার নিয়মেই (biological rule) ঘটে। প্রথম যখন কোন পরিবার তৈরি হয় তাতে শুধু স্বামী ও স্ত্রী থাকে। কোন নির্ভরশীল সন্তান থাকে না। তার ফলে পরিবারে স্বচ্ছলতা থাকে। এরপর যত সন্তানের জন্ম হতে থাকে স্বচ্ছলতার পরিবর্তে দুর্দশার পর্যায় আসে। এবং আবার ১৫ বছর পর থেকে বছর বছর একেকটি সন্তান স্বাবলম্বী হয়ে উপার্জন শুরু করে ও নতুন পরিবার গঠন করে বাবা-মার পরিবার থেকে সরে যেতে থাকে। মূল পরিবারটিতে ফিরে আসতে থাকে স্বচ্ছলতা। চায়ানভের ধ্যানধারণা মতোই অমর্ত্য সেন (১৯৬৭) দেখান, ছোট জোতের মালিকরা বড়জোতের চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদনশীল কারণ তারা সমপ্রকৃতিযুক্ত এবং পারিবারিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও জর্জেস্ক্ রগেন (১৯৬০) ও মাইকেল লিপটনের (১৯৭৭) কাজেও এই নয়া-জনমোহিনীবাদ প্রতিফলিত হয়।

মজার ব্যাপার হলো, উদারনীতিবাদের সঙ্গে জনমোহিনী-বাদের এক গভীর যোগসূত্র রয়েছে। যেন দ্বিতীয়টি প্রথমটির একটি অ্যাজেন্ডা। এবং এই যোগসূত্র স্থাপনকারী ও অ্যাজেন্ডা তৈরির প্রতিষ্ঠানটির নাম হল বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্ক সামাজিক মূলধন (social capital) তত্ত্বের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণের ফর্মুলা দেয়, যা কার্যত নয়া উদারনীতিবাদী এবং নয়া জনমোহিনীবাদী। এটি নয়া উদারনীতিবাদী, কারণ মানুষের এই অংশগ্রহণের রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকবেনা। থাকবে না রাজনৈতিক দলও। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে শ্রেণী অসচেতন, দলহীন, রাষ্ট্রবিমুখ পৌর সমাজের বাসিন্দারা এনজিও-র মাধ্যমে একে অন্যকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করবেন এবং তাতেই নাকি তৈরি হবে প্রচুর সামাজিক মূলধন। তারপর বহুজাতিক ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজিকে কেন্দ্র করে গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলবে উন্নয়নের রথ। কলকাতা একদিন এভাবেই লন্ডন হবে, ভারত হবে সুইজারল্যান্ড। এই নয়া উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রবিমুখ তত্ত্ব আবার ভীষণভাবে নয়া-জনমোহিনীবাদী, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে যদি বিশ্বব্যাঙ্ককে শুরু করতে হয় তাহলে প্রথমেই মুখ থুবড়ে পড়ে সামাজিক মূলধনের তত্ত্ব। কারণ একটি সমাজের দু'দল মানুষদের মধ্যে যদি শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক থাকে তাহলে তো একই সঙ্গে একে অন্যকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করার প্রশ্ন আসে না। তাই বিশ্বব্যাঙ্ক শুরুই করে চায়ানভ ধারণার ভিত্তিতে : গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের সব মানুষই সমপ্রকৃতির। এবং এই সমপ্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের ভিত্তি হলো, তারা জনসংখ্যাগতভাবে একই অথবা কাছাকাছি জনগোষ্ঠীর সদস্য।[১০]

লেনিন বলেছিলেন দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থা নাকি কখনও একই সরলরেখার দুটি বিন্দুতে পরিণত হয়। কোথাও যেন বারবারা হ্যারিসের বামপন্থা চায়ানভের নয়া-জনমোহিনীবাদ ও বিশ্বব্যাঙ্কের চরম দক্ষিণপন্থী নয়া উদারনীতিবাদ সব মিলে মিশে এক হয়ে গেল। আসলে অতি-বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার মিল এক জায়গাতেই। দুজনই রাষ্ট্রকে সমস্যা রূপেই দেখতে চায়, সমাধানরূপে নয়। তাই দুজনেই দুইভাবে তাকে খারিজ করতে চায়। এটা মোটেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যে সামাজিক মূলধন শুধু বিশ্বব্যাঙ্কই গ্রহণ করেনি, অনেক বামপন্থী পণ্ডিতের সমাদরেও সে গোকুলে বেড়ে চলছে এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে।

তাহলে নয়া উদারনীতিবাদ ও বাজার অর্থনীতি ধনতন্ত্রকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে?

আমাদের গ্রাম সমীক্ষা

আমরা গ্রাম সমীক্ষা করেছি বাঁকুড়া জেলার একই ২১০টি পরিবারের উপর। প্রথমবার ১৯৯৩-৯৪-এ। দ্বিতীয়বার ২০০৪-০৫-এ।[১১] বারবারাদের গুজবে কান না দিয়ে আমরা পরিবারগুলোকে উৎসা পটনায়েকের শ্রমশোষণ সূচক দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছি, যথা ভূমিহীন, গরিব কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারি কৃষক, ধনী কৃষক ও জমিদার। একই সঙ্গে আমরা জোতের আয়তন নিয়েও কৃষকদের বিভিন্ন জোত শ্রেণীতে সাজালাম। সংক্ষেপে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল কী বলছে? প্রথম কথা গ্রামে শ্রেণী উঠে গেছে ও ঝকঝকে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকারীরা রাজত্ব করছে— এটা একেবারে আষাঢ়ে গল্প। আমরা দেখতে পাচ্ছি, দুটো সময়েই ভূমিহীন ও গরিব কৃষকরা মোট পরিবারের ৪০% হওয়া সত্ত্বেও তারা জমি, অন্যান্য সম্পত্তি, সেচ ও উৎপাদনের মাত্র ১১ থেকে ১২ শতাংশ অধিকার করে আছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ধনী কৃষক ও জমিদাররা দখল করে আছে ৫০% থেকে ৬০%। আমাদের গ্রাম সমীক্ষায় উঠে এসেছে কৃষির লাভজনকভাবে টিকে থাকার গভীর সংকটটিও। ১৯৯৩-৯৪ সালে সমস্ত পরিবার মিলিয়ে দারিদ্র্যসীমার উপর পরিবার পিছু উদ্বৃত্ত ছিল ২২৬২ টাকা। ২০০৪-০৫ এ সেই উদ্বৃত্ত প্রকৃত মূল্যে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০৫৭ টাকা। কিন্তু এই বৃদ্ধি ভীষণভাবে কুক্ষিগত ধনী কৃষক ও জমিদারদের ক্ষেত্রে। ১৯৯৩-৯৪ সালে কেবলমাত্র ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান ছিল। ২০০৪-০৫-এ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক। যাদের ঘাটতি রয়েছে তাদের মহাজনদের কাছে হাত পাতা ছাড়া কোন উপায় থাকছে না। বেড়ে চলেছে তাদের ভঙ্গুর অবস্থা। কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ধনী কৃষকদেরও কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং নয়া উদারনীতিবাদ সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের কাছেই একধরনের প্রতিবন্ধকতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। গ্রাম সমীক্ষার বাইরেও এনএসএসও রিপোর্টের মাধ্যমেও আমরা একই সত্য দেখতে পাচ্ছি। ১৯৯২ ও ২০০৩ এর মধ্যে জোতের গড় পরিমাণ যথেষ্ট কমে যাওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব জমিতে (owned land) জোত শ্রেণীগত বৈষম্যের কিছুমাত্র তারতম্য হয়নি। কর্ষিত জমিতে (operated land) এই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেচসেচিত জমি তথা পশু সহ অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ কমেছে প্রায় ৮ শতাংশ। অন্যদিকে মহাজনের ঋণের শতকরা হার ১০.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫.৭%।

সুতরাং নয়া উদারনীতিবাদ ও বাজার অর্থনীতি ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথকে ইতিমধ্যেই বন্দী করে ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। উৎসা পটনায়েক এনএসএসও-র 'সিচুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে' থেকে দেখিয়েছেন নিট বিনিয়োগের মান অত্যন্ত কম। ষাট ও সত্তরের দশকে পাঞ্জাবে উদ্বৃত্তের সঞ্চয় ও পুনর্বিনিয়োগ দেখে উৎসা ধনতন্ত্রের বিকাশের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন। আজ নিট বিনিয়োগের এই দৈন্যদশা দেখে উৎসার মত হলো, ধনতন্ত্রের বন্দীদশা (arrested capitalism) তৈরি

হয়েছে।[১২] এনএসএসও-র সমীক্ষা ও আমাদের গ্রাম সমীক্ষার ফলাফল খুব কাছাকাছি। অন্যদিকে নয়া উদারনীতিবাদী বাজার অর্থনীতিতে মহাজনের এই দাপট দেখে অমিত ভাদুড়ীর আধা-সামন্ততন্ত্রের তত্ত্ব সামনে এসে যায়। বিশ্বায়িত ভারতে অবশ্যই আধা-সামন্ততন্ত্র অমূলক, কিন্তু মহাজনি কারবার যে আধা-সামন্ততন্ত্রের মতই কৃষি ধনতন্ত্রের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সবশেষে আমরা বলতে পারি যেহেতু বিশ্বায়ন পর্যায়ে কৃষি শুধু সবচেয়ে অবহেলারই নয়, দেশি ও বিদেশি পুঁজির সব থেকে বড় লুঠের বিষয়, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের দলে নাম লেখানোতে শুধু গরিব কৃষকরাই নয়, ধনী কৃষকরাও শামিল, তাই সময় এসেছে যখন ফসলের দাম, ভর্তুকি, সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং কৃষিতে দেশি ও বিদেশি পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বড় ফ্রন্ট গড়ে তোলার। এবং এ কাজে বামপন্থীদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। প্রথমটি হলো: হ্যারিস হোয়াইট, বারবারা (২০১০), 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড কমন ম্যান' *(http://www.southasia.ox.ac.uk/research/work-in-progress/work-in-progress)*। দ্বিতীয়টি হল শাহ, অল্পা ও বারবারা হ্যারিস হোয়াইট (২০১১), 'রেসরেকটিং স্কলারশিপ অন অ্যাগ্রারিয়ান ট্র্যানসফরমেশন', *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, সেপ্টেম্বর ২৪।

২। ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি* পত্রিকায় পণ্ডিত মহলের বিতর্কপত্রগুলি প্রকাশিত হয়। সেইসব লেখা একত্রে উৎসা পট্‌নায়েকের সম্পাদনায় *অ্যাগ্রারিয়ান রিলেশনস অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশনস : দি 'মোড অফ প্রোডাকশন' ডিবেট ইন ইন্ডিয়া* নামে ১৯৯০ সালে অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। আমাদের এই আলোচনায় ব্যবহৃত সূত্রগুলি এখান থেকেই নেওয়া।

৩। ভাদুড়ী, অমিত (১৯৭৩), 'এ স্টাডি ইন এগ্রিকালচারাল ব্যাকওয়ার্ডনেস আন্ডার সেমি ফিউডালিজম', *ইকনমিক জার্নাল*, মার্চ।

৪। গত ৩১শে আগস্ট ২০১২ রাজ্যসভায় ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট সহ সব তথ্য উল্লেখ করে কৃষি প্রতিমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত জানিয়েছেন, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে দেশে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা ২,৯০,৭৪০।

৫। সেন, অভিজিৎ (২000), 'এস্টিমেটস অপ কনজিউমার এক্সপেনডিচার অ্যান্ড ইট্‌স ডিস্ট্রিবিউশান : স্ট্যাটিসটিকাল প্রায়োরিটিস আফটার এনএসএসও ৫৫ রাউন্ড', *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ভলিয়ুম ৩৫, নং ৫১, ডিসেম্বর ১৬।

৬। পটনায়েক, উৎসা (২০০৫), 'থিয়োরাইজিং ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড পভার্টি ইন দি এরা অফ ইকনমিক রিফর্ম', *সোশ্যাল সায়েনটিস্ট*, ভলিয়ুম ৩৩, নং ৭-৮। জুলাই-আগস্ট।

৭। অভিজিৎ সেন দেখিয়েছেন যে, ১৯৯৯ সালের ৫৫তম রাউন্ডের আগে এনএসএসও-র যতগুলি ভোগব্যয় (consumer expenditure) সংক্রান্ত সমীক্ষা হয়েছে সেগুলিতে প্রশ্নকর্তারা উত্তরদাতাদের কাছে বিগত ৩০ দিনের ভোগব্যয় সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছেন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলনবিশ এই পদ্ধতিকেই সবচেয়ে বেশি সঠিক বলে মনে করতেন। এই তথ্যের ভিত্তিতেই কত মানুষে দারিদ্র্যসীমার উপরে বা নিচে তার হিসেব কষা হত। ১৯৯৯ সাল থেকে আচমকা এনএসএসও তার পদ্ধতি বদলে উত্তরদাতাকে বিগত ৭ দিনের হিসেব পেশ করতে বলেন। এবং পদ্ধতির এই গোঁজামিল দিয়ে আচমকা ১৯৯৯ সালে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতাংশ নামিয়ে আনেন। অভিজিৎ সেনের মতে এনএসএসও-র বিগত বছর ও বিগত রাউন্ডের তথ্যসমূহ যেহেতু ৩০ দিনের ভোগব্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে কোনোভাবেই ৭ দিনের ভোগব্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ১৯৯৯ সালের ৫৫তম রাউন্ডের সমীক্ষার তুলনা করা যাবে না। অন্যদিকে উৎসা পটনায়েক (২০০৫) দেখিয়েছেন, সরকারের দারিদ্র্যসীমার হিসাবই পুরো গোজামিলে ভরা। তিনি দেখিয়েছেন, সরকার একবারই ভোক্তাদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য নিয়ে দারিদ্র্যসীমার হিসাব করেছিল; সেটা হল ১৯৭৩-৭৪। পরবর্তী রাউন্ডগুলিতে তারা ১৯৭৩-৭৪ কে ভিত্তিবর্ষ ধরে এই দারিদ্র্যসীমাকে মূল্যবৃদ্ধির সূচক দিয়ে ডিফ্লেক্‌ট (নতুন মানে পরিবর্তিত) করে নিয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতি ভুল। পরবর্তী বছরে সরাসরি সমীক্ষায় দারিদ্র্যসীমার যে হিসেব পাওয়া যেত, ভুল পদ্ধতির জন্য সেটা অনেক নিচে অবস্থান করছে। যেমন সরকারি হিসেবে ১৯৯৯-২০০০-এ দারিদ্র্যসীমা হল প্রতি মাসে ৩২৮ টাকা। বেঁচে থাকতে হলে মাথাপিছু ২০০০ কিলো ক্যালরি ধার্য করে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। টাকার অঙ্কে যতটা খাদ্য এই ক্যালরি যোগান দিতে পারবে তাকেই দারিদ্র্যরেখা বলে পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করে। সেই হিসাবে ৩২৮ টাকা দিয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৪০০ কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য ক্রয় করা যায় না। যায় ১৮৯০ কিলো ক্যালরি খাদ্য। সুতরাং পটনায়েকের অভিমত, সরাসরি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৫৭০ টাকা প্রতিমাসে পাওয়া গেলে তবেই ২৪০০ কিলোক্যালরি যুক্ত খাদ্য পাওয়া যেতে পারে এবং সেটাই দারিদ্য সীমারাখা হওয়া উচিত। এই হিসাব অনুসারে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষই দারিদ্য সীমার নিচে রয়েছে, যেটাকে সরকার ৩২৮ টাকা ধরে মাত্র ২৭.১% বলে দাবি করে। মনে রাখতে হবে এই দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর হিসাব ধরা হয় নি। যেন গরিবরা বিনা পোষাকে, বিনা বাসস্থানে, বিনা বাসভাড়ায়, ট্রেনভাড়ায়, এবং অবশ্যই বিনা আমোদ-প্রমোদে জীবন কাটাতে সক্ষম।

৮। ঘোষ, জয়তী (২০০৬), 'বিইং ইওর ওন বস্', *ম্যাকক্রোস্ক্যান*, ২৮ নভে, www.macroscan.org/cur/dec06/cur181206Own-Boss.htm.

৯। চন্দ্রশেখর, সি পি ও ঘোষ, জয়তী (২০০৬), 'ওয়ার্কিং মোর ফর লেস', ম্যাক্রোস্ক্যান, ২৮ নভে, www.macroscan.org/pet/nov06/fet 281106 working-More.htm

১০। মার্কসবাদ বনাম নয়া জনমোহিনীবাদ, চায়ানভ, বিশ্বব্যাঙ্কের সামাজিক মূলধন তথা অংশগ্রহণ মডেল ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান লেখকের 'ক্লাশ অ্যান্ড পলিটিকস্ অফ পার্টিসিপেটরি রুর‍্যাল ট্রানফরমেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : অ্যান অল্টারনেটিভ টু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অর্থোডক্সি,' *জার্নাল অফ অ্যাগ্রারিয়ান চেঞ্জ*, ভলিয়ুম ৭, নং ৩, জুলাই ২০০৭, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং-এ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

১১। মূল গবেষণা 'মার্কেট ইকনমিক রিফর্ম অ্যান্ড অ্যাগ্রারিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল'। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে জুন ২০০৫ এ বর্তমান লেখকের জমা করা মুখ্য গবেষণা প্রকল্পের একটি অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি। এর থেকে মূল কিছু তথ্য সংকলন করে একটি গবেষণা পত্র বর্তমান লেখক সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিং, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়া দিল্লী আয়োজিত কনফারেন্স অন অ্যাকুমুলেশন, ইমিসারাইজেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-এ (মার্চ ৭-৯, ২০১১) পাঠ করেন। 'নিও-লিবারালিজম, উইকেনিং স্টেট অ্যান্ড পেমেন্ট ডিফারেনশিয়েশন ইন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার : সার্ভে ফাইন্ডিংস ফ্রম প্যানেল ডেটা ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৪ - ২০০৬-০৫' নামক গবেষণাপত্রটি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে: cascesp.wordpress.com

১২। পটনায়েক, উৎসা (২০০৭), 'নিউ ডেটা অন অ্যারেস্টেড ডেভলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার', ভল্যুম ৩৫, নং ৭-৮, জুলাই-আগস্ট, পৃ. ৪-২৬

বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ ও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা

সুকান্ত রায়

বিগত কয়েকটি দশক ধরেই আমাদের দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট মহলে ভারতকে যে একটি "আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশ" বলে আসা হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে এক বলিষ্ঠ তাত্ত্বিক কাঠামো। এই কাঠামো নির্মাণের প্রথম স্রষ্টা কম: লেনিন, পরবর্তীকালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ধারাবাহিকতায় কম: মাং সে তুঙ্ তাকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু চীনকেও আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক বলে চিহ্নিত করেছিল তাই এই অভিধাটিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা থেকেই কম: মাও একাধিক গ্রন্থে এর চমৎকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন এবং কম: লেনিন যে তাত্ত্বিক রূপরেখা হাজির করেছিলেন তাকে পরিপূর্ণতা দেন। চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নাতীত সাফল্য এই তত্ত্বায়নকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের সব পশ্চাৎপদ দেশকে সেই সেই দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক বলেই চরিত্রায়ণ করে। আমাদের দেশেও ১৯৬৭ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটার মুহূর্ত থেকেই আমরাও ঐ সূত্রায়ণটিকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে ৪৫ বছর কেটে গেছে। আমাদের আন্দোলন অনেক সঙ্কট, অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বহুধা-বিভক্তও হয়েছে। কিন্তু যে অভিন্ন সূত্রে এ আন্দোলন আজও গ্রথিত হয়ে রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত রাষ্ট্রচরিত্র সম্পর্কে এই অভিন্ন সূত্রায়ণ। এই সূত্রায়ণ থেকেই অনুসৃত হয় যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কই প্রাধান্যকারী অবস্থায় থেকে গেছে। তাই সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভারতের জনগণের দ্বন্দ্বই আজও প্রধান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য হলো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যেহেতু ভয়ানক পশ্চাৎপদ একটি ব্যবস্থা এবং যেহেতু সেই ব্যবস্থাই আজ ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বিরাজ করছে তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হবে তা অবশ্যম্ভাবী। এখানে উল্লেখ করে নেওয়া সঙ্গত যে এই সূত্রায়ণ দাবি করে, "আধা-সামন্ততন্ত্র" অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মধ্যে সামন্ত্রতন্ত্রই প্রধান স্থানে আছে।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক হিসেবে রাষ্ট্র-চরিত্রকে বর্ণনা করার পেছনে যে সুদৃঢ় তাত্ত্বিক কাঠামোটি উপস্থিত রয়েছে, পাঠকদের কাছে তা চর্বিতচর্বণ হবে এটা জেনেও কিছুটা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। কারণ এই রচনাটির মূল প্রতিপাদ্যটি হাজির করার জন্য তা প্রয়োজন।

আমরা যে তত্ত্বকাঠামোর রূপরেখা বর্ণনা করবো তার আদি ও মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কস-সূত্রায়িত 'পুঁজির'-র অন্তর্নিহিত সঙ্কট। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি অনিবার্যভাবেই পুঁজির আঙ্গিক গঠন (organic composition) বাড়াতে থাকে, কারণ পুঁজির মালিকানা যেহেতু ব্যক্তিগত এবং যেহেতু উদ্বৃত্ত মূল্য দখলের জন্য চলতে থাকে অবাধ প্রতিযোগিতা, তাই উৎপাদিত সামগ্রীর ইউনিট পিছু উৎপাদন খরচ যাতে অন্য পুঁজিপতিদের থেকে কম রেখে বাজার দখল করা যায়, তাই স্থির পুঁজি (constant capital) ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে হয় শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য। এতে স্বাভাবিকভাবে ইউনিট পিছু স্থির পুঁজির অনুপাত বাড়ে এবং অ-স্থির পুঁজির (variable capital) অনুপাত কমে। ফলে ইউনিট পিছু উৎপাদনে শ্রমশক্তির যে অংশ থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত ক'রে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা হয়, সেই অংশের পরিমাণ কমতে থাকে। আমরা জানি মুনাফার হার হলো সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের অনুপাত। তাই যত বেশি স্থির পুঁজির ব্যবহার বাড়বে, ততই মুনাফার হার কমতে থাকবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে কোন পুঁজিপতিই স্থির পুঁজি বাড়িয়ে যাওয়া থেকে বিরত হতে পারে না। ফলে ঘটতে থাকে পুঁজির ঘনীভবন (concentration) এবং কেন্দ্রীভবন (centralization), যা পুঁজির সঞ্চয়নকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে, কিন্তু অপর দিকে সামগ্রিক সামাজিক পুঁজির আঙ্গিক গঠনকেও বাড়িয়ে চলে। একচেটিয়া পুঁজি যেহেতু আরও তীব্রতার সঙ্গে সামগ্রিক সামাজিক পুঁজির আঙ্গিক গঠন বাড়ায়, তাই একচেটিয়া পুঁজির যুগেও মুনাফার হারের নিম্নমুখী প্রবণতা কমার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মুনাফার হার কমে যাবার সঙ্কট থেকে বেরোবার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে তখন একটি প্রধান উপায় হিসেবে দেখা দেয় অনুন্নত দুনিয়ায় পুঁজি রপ্তানি করা। স্বদেশে পুনর্বিনিয়োগের যখন আর কোনও ক্ষেত্র থাকে না, (বা বলা যায়, বিদ্যমান ক্ষেত্রে আবার বিনিয়োগ করলে তা মুনাফার হারকে আরও কমিয়ে দেবে) তখন সেই উদ্বৃত্ত পুঁজি-কে কেবল বিদেশে রপ্তানি করেই এই নিম্নমুখী হারকে ঠেকানো সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন একচেটিয়া স্তরে পৌঁছায়, অর্থাৎ পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছায়, তখন বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করাটা অপরিসীম গুরুত্ব অর্জন করে। পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত দেশে এই পুঁজি রপ্তানি মারফত মুনাফার হারের নিম্নমুখী প্রবণতাই যে কেবল কমে তা নয়, মুনাফার হার অনেক বেড়েও যায়, কারণ অনুন্নত দেশে পুঁজির আঙ্গিক গঠন অনেক নীচু স্তরে

থাকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির পুনর্বিনিয়োগের সমস্যার সমাধান করতে অনুন্নত দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি নিয়ে গিয়ে ফেলা এবং উদ্বৃত্ত মুনাফা অর্জন করা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পুঁজির সঙ্কট নিরসনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত হল। অর্থাৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে টিকে থাকার এক অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়ালো পশ্চাৎপদ দেশের অস্তিত্ব, যেখানে উদ্বৃত্ত পুঁজি রপ্তানি করেই কেবল পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে উন্নত থাকা সম্ভব।

অনুন্নত দেশকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রেখে দিতে হলে সাম্রাজ্যবাদকে অবশ্যই জোট বাঁধতে হবে সেখানকার শাসক শ্রেণীর সাথে। অর্থাৎ সেই অনুন্নত দেশের (ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক) পুঁজিপতি ও সামন্তশ্রেণীর সাথে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা হলো, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে সেই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত তার নিজের হাতেই থাকে, তাই তার পক্ষে সম্ভব হয় সেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে এমনভাবে সীমিত রাখা, যাতে সেই দেশের পশ্চাৎপদতা বজায় থাকে, সেই দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশ তার কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত না হয়। এইরকম একটি দেশে পুঁজির বিকাশকে সীমিত রাখতে পারে একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাব যা সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেখানে গড়ে ওঠে। দেশি পুঁজিপতিদের উপরের অংশটি যেটি বাজারের বড় অংশ দখল ক'রে অন্যান্য দেশি প্রতিযোগীদের হঠিয়ে দিতে চায়, তারাও দেখে এটা করা সম্ভব কেবল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস ক'রে বা তার বশংবদ থেকে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও যেহেতু দেশি পুঁজির বিকাশকে সীমিত রাখা প্রয়োজন, তাই দেশি বৃহৎ পুঁজির এই একচেটিয়া চরিত্র তার অস্তিত্বের পক্ষেও একটা অনুকূল শর্ত। এইভাবেই দেশি ও বিদেশি একচেটিয়া জোট এরকম একটি দেশে পুঁজির অবাধ বিকাশকে রুদ্ধ করে দেশটিকে পশ্চাৎপদ রেখে দেয়। আর তাদের এই কাজে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা পেয়ে যায় দেশের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে, পুরনো উৎপাদন সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখাই যার অস্তিত্বের মূল শর্ত। কারণ যে জমির উপর একচেটিয়া মালিকানার জোরে সে ভূমিখাজনা আদায় করে টিকে থাকে, তাতে সে জমির মালিকানা বজায় রেখে কিছু প্রান্তিক ধরনের সংস্কার করতে রাজি থাকতে পারে, কিন্তু পুঁজির অবাধ বিকাশের জন্য প্রয়োজন যে আমূল ভূমিসংস্কার, তাতে সে জীবনপণ করে বাধা দেবে, কারণ সেটা ঘটলে তার আর অস্তিত্বই থাকবে না।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-দেশি একচেটিয়া পুঁজির অভিন্ন স্বার্থ হচ্ছে এইরকম একটি দেশে পুঁজির বিকাশকে সীমিত রাখা, অর্থাৎ দেশটিকে পশ্চাৎপদ রেখে দেওয়া। এই তিনটি শক্তিকে উৎখাত করা যেতে পারে একমাত্র নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু সেই বিপ্লব যত দিন না হচ্ছে, কিছু প্রান্তিক ধরনের সংস্কার ঘটলেও কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে না, আর তাই উৎপাদন সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। বিপ্লব সমাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত দেশটির চরিত্র আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক থেকেই যাবে।

এই হল অতি-সংক্ষেপে সেই তাত্ত্বিক কাঠামো যার উপর ভিত্তি করে বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত সকল পশ্চাৎপদ দেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে। এই পশ্চাৎপদতা সাম্রাজ্যবাদই টিকিয়ে রেখেছে, আর তাকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে তার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে। এই তত্ত্বায়ন নির্মিত হবার প্রায় এক শতাব্দী বাদে আজ মনে হয় একটা সময় এসেছে যখন আমরা বিচার করে দেখতে পারি— (১) সাম্রাজ্যবাদ কি আদৌ অনুন্নত দেশে পুঁজি রপ্তানির সাহায্যে তার সঙ্কট কাটাতে পেরেছিল? (২) সাম্রাজ্যবাদ কি আজও একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছে তার পুঁজির সঙ্কট নিরসনের জন্য? (৩) সাম্রাজ্যবাদ কি আজও তার অস্তিত্বের শর্ত হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে পশ্চাৎপদ রাখতে চায়, না আজকের দিনে এই দেশগুলির একটি বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটানো তার অস্তিত্বের শর্ত হিসাবে উঠে এসেছে? বর্তমান সময়ের ভারতীয় কৃষির প্রকৃতি বিচার করতে হলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বার করা অত্যন্ত জরুরি।

আমরা যদি প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্বে একচেটিয়া পুঁজির ১০০ বছরের (১৮৮১-১৯৮১) ইতিহাসের দিকে চোখ রাখি তবে দেখতে পাব ঐ শতাব্দীর ইতিহাসের ১৯১৩-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বটি বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদন এবং বিশ্ববাণিজ্যের নিরিখে সব চেয়ে গভীর সঙ্কটের সময়। ঐ ৩৫ বছরের সময়কালে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ছিল ১.৪%, আর বিশ্ববাণিজ্যের গড় বৃদ্ধি ছিল ০.৪%। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ সমগ্র পর্যায়টি জুড়ে অর্জিত মুনাফা সঞ্চয়ন বা বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঢুকতে পারছে না। তার ঠিক আগের পর্বেও (১৮৮১-১৯১৩) দেখা গেছে যে শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ৩.৮% হলেও বিশ্ববাণিজ্যের বার্ষিক গড় ২.৬%, অর্থাৎ বাণিজ্য বৃদ্ধি শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ১৮৮১-১৯৪৮ পর্যন্ত বিস্তৃত একচেটিয়া পুঁজির দীর্ঘ অধ্যায়ে তাকে মুনাফার হারের এক নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, শিল্পবৃদ্ধির নিম্নমুখিতা যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আর যে বিষয়টি ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো উপনিবেশ গঠন। উপনিবেশে পুঁজি রপ্তানি এবং দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়াকে ভাগ-বাটোয়ারা করেও বিশ্ববাণিজ্যের কোনো উর্ধ্বমুখী হার সৃষ্টি করা যায়নি। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজি তার উষাকাল থেকেই এক সঙ্কট বয়ে নিয়ে চলেছে। পুঁজির বিবর্তন

প্রক্রিয়াতেই এই সঙ্কটকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়।

পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্ন থেকেই গড়ে তুলেছিল পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা। আরও বেশি মুনাফার জন্য তার প্রয়োজন ছিল আরও বেশি বিনিময় এবং ক্রমবর্ধমান বিনিময় ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্য ক্রমবর্ধমান বাজার ব্যবস্থা। প্রথম দিকে এই বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে এক 'সাম্য' ছিল। এর ফলে পণ্যের দাম পণ্যের মূল্যের কাছাকাছি থাকত। পুঁজির বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাজার ব্যবস্থা তার এই চরিত্র হারাল। পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতায় কোনো কোনো পুঁজিবাদী জয়ী হলেও বাকিরা পরাজিত হল। জয়ীরা পরিণত হল একচেটিয়া পুঁজিপতিতে। বাজার ব্যবস্থাতেও 'সাম্য'-এর পরিবর্তে সৃষ্টি হল একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থা, যেখানে পণ্যের দাম পণ্যের মূল্যের থেকে অনেক উপরে রাখা যায় এবং এই অতিরিক্ত মুনাফা একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থার সাহায্যেই ছোট ও মাঝারি (যারা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছিল) পুঁজিপতিদের থেকে নিষ্কাশন করে নেওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে সীমায়িত এই একচেটিয়া পুঁজি দেশের অভ্যন্তরে নিজের সুরক্ষার জন্য এবং অনুন্নত দেশে পুঁজির প্রবেশ ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রের সব রকম সহযোগিতা পায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে "সাম্রাজ্যবাদী"।

পুঁজিকে তার পরিক্রমার একটি পর্যায়ে এসে তার মুনাফার নিম্নমুখী হার-এর সমস্যায় পড়তে হয়। এটি ঘটে যখন পুঁজির ঘনীভবন প্রক্রিয়ার আর নতুন পুঁজির গঠন এবং পুরনো পুঁজির বিভাজনের (বংশধরদের মধ্যে) মোকাবিলা করতে পারে না। পুঁজির সঞ্চয়ন তখন বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন মুনাফার উচ্চতর হারকে বজায় রাখতে ভিন্ন ভিন্ন পুঁজির মধ্যে মিলে যাবার প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটিই হলো পুঁজির "কেন্দ্রীভবন" (centralization)। পুঁজির বিবর্তনের একচেটিয়া পর্বে পুঁজির কেন্দ্রীভবন এক নির্ধারক গুরুত্ব নিয়ে হাজির হল। উৎপাদনক্ষেত্রে যতক্ষণ না একচেটিয়া পুঁজির পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের দাম কম রাখার জন্য পুঁজিপতিকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে যেতেই হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছিল উৎপাদনের পরিসরকে বাড়িয়ে তোলা। ঘনীভবনের মাধ্যমে তা আর সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ এই পদ্ধতিতে প্রযুক্তির বিকাশ এতই মন্থর হয় যে তা দিয়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতা যে মাত্রায় বাড়া প্রয়োজন সেটি সম্ভব হয় না। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে পুঁজির কেন্দ্রীভবন। উৎপাদনকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে গিয়ে এই কেন্দ্রীভবন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মুনাফার হারের ঊর্ধ্বগতি বজায় রেখে জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একচেটিয়া পুঁজিকে সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজির টিকে থাকার জন্য কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া ছিল এক প্রধান ব্যবস্থা। ১৮৭৩ সালকে যদি ভিত্তি ধরি, তার পরের কয়েকটি দশক জুড়েই এই কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজি স্ব-স্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সিংহভাগ অধিকার করেছিল; তার পর ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু করে। ইংল্যান্ড তার বাহুবলে দখল করা উপনিবেশগুলিতে এ কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এভাবে খুব বেশি সমাধান হলো না, কারণ পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে চাহিদার মাত্রা অত্যন্ত কম। এভাবে যখন সমস্যার সমাধান করা গেল না তখন শুরু হল পুঁজি রপ্তানি। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রটিতে উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যবহার না করতে পারলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাই হলো। স্থির পুঁজির সাথে সাথে শ্রমের উৎপাদনশীলতা না বাড়ার ফলে আবার মুনাফার হার নিম্নমুখী হতে শুরু করল। অন্যদিকে পশ্চাৎপদ দেশেও পুঁজি খুব বেশি নিয়োগ করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯১০ সালে ব্রিটেন যে মোট ৭০ লক্ষ কোটি মার্ক বিদেশে রপ্তানি করেছিল তার মধ্যে সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় মিলিতভাবে ছিল ২৯ লক্ষ কোটি মার্ক, আর শুধুমাত্র আমেরিকায় ছিল ৩৭ লক্ষ কোটি মার্ক। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে পুঁজি রপ্তানি একচেটিয়া পুঁজির সঙ্কটকে নিরসন করতে পারেনি। বারবার যুদ্ধবিগ্রহ করেও পারেনি। তবে এই পর্বেই বিশ্বের একচেটিয়া পুঁজির ইতিহাসে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিকে ব্যবহার করে আমেরিকা এক নম্বর জায়গা দখল করে নেয়, অন্য শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ব পুঁজিবাদ একটি সঙ্কট সঙ্গে নিয়েই তার যাত্রা শুরু করে। জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পুঁজির কেন্দ্রীভবন তখন একভাবে শেষ হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় মুনাফা যদি পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে মুনাফার হার হবে নিম্নমুখী। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য খণ্ড পুঁজির মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তা আর নতুন করে ঘটার কোনো অবকাশ নেই। পুঁজি তখন মুনাফার সন্ধানে চলে যায় ভিন্ন রাষ্ট্রে। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ পুঁজির চলাচল বহুগুণ বেড়ে গেছে, অথচ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার তেমন বাড়ছে না, বহু বছরেই তা ঋণাত্মক। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান— সব কটি দেশেরই পুঁজি রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি। বিশ্বের মোট পণ্য রপ্তানির যতটুকু অংশ শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে করা হয় তার তুলনায় মোট আমদানির অংশ বেশি। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। ১৯৮১-র পর থেকে আমেরিকাতেও এই সমস্যা একই রকমভাবে দেখা দিতে শুরু করে।

এই রকম একটি সঙ্কটকালে বিশ্ব পুঁজিবাদের ইতিহাসে নতুন একটি ঘটনা ঘটতে থাকল। ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্ক কি শুধু দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষের— যেমনটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মার্কসবাদী নেতৃবর্গ ভেবে এসেছিলেন? কালের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে তাঁদের পক্ষে এইভাবে ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজির তুঙ্গ অবস্থায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব পুঁজির শক্তিকেই নিজেদের জাতীয় অহঙ্কারের উৎস বলে বিবেচনা করতেন। তাই সংঘাতই ছিল জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারণ তখনও পর্যন্ত ভাবা হত বা ভাবা যেত যে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। আর তাই ভাবা হতো তার ধ্বংসের কালও আসন্ন! কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষভাগে দেখা গেল জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক সঞ্চয়নকে পুঁজি তার জীবনের শেষ কথা বলে মানতে চায় না। সে আবিষ্কার করল, তার সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় আরও পথ খোলা আছে এবং তাকে রূপ দিতে হলে ''রাষ্ট্র''কে তার প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে হবে। উল্টোটি নয়, তার স্বার্থের কাছে রাষ্ট্রের অহংকে বিসর্জন দিতে হবে। আর হলোও তাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র-ভিত্তিক একচেটিয়াগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া শুরু হল। জন্ম হল ''বহুজাতিক একচেটিয়া'' এবং এটিই হয়ে উঠল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি রপ্তানির তাৎপর্য বদলে গেল। পুঁজি রপ্তানির হিসেবের মধ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অভ্যন্তরীণ চলাচলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আসলে একচেটিয়া পুঁজির জাতিভিত্তিক অস্তিত্ব তার সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকে জারি রাখতে পারছিল না। উৎপাদিকাশক্তির ক্রমবর্ধমান বিপুল বিকাশ পণ্য উৎপাদনের এক বিস্ফোরক মাত্রা দাবি করে। জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক পুঁজিবাদ তা ধারণ করতে অক্ষম। তাই এর অবসান ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ছিল। পুঁজির প্রকৃত আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীভবন এবং একচেটিয়াকরণ সাময়িকভাবে হলেও (পুঁজির সমস্যার সমাধান সব সময়ই সাময়িক), তার সঞ্চয়নের সমস্যা থেকে মুক্তি দিল। উৎপাদনের মাত্রা (scale of production) বহু উচ্চে তোলার প্রয়োজন ছিল, বিশ্ব বাণিজ্যের চলাচল মসৃণ করা প্রয়োজন ছিল, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে উন্নয়ন ঘটানো এবং বিশ্বব্যাপী তার বাজার গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব জুড়ে পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তার লক্ষ্য হল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ। কারণ পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই ভোগ্যপণ্যের বাজার সীমিত হয়ে পড়েছিল। পুঁজির সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে, তার জন্য ভোগ্যপণ্যের নতুন নতুন বাজার খুঁজতে হবে, তার জন্য অনুন্নত বিশ্বে বাজার সম্প্রসারিত করতে হবে, সেখানকার সুবিপুল কৃষিক্ষেত্রের অনাস্বাদিতপূর্ব চারণভূমি দখল নিতে হবে এবং সেখানে বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য এবং বিনিয়োগ বাড়াবার প্রক্রিয়ায় পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভাঙতে হবে। তার পরিণতিতে উপর থেকে হস্তক্ষেপে ধীর প্রক্রিয়ায় নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং যুগ-সঞ্চিত গ্রামীণ পশ্চাৎপদতা অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে ভাঙতে থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে সামন্ত-বাদকে টিকিয়ে রাখা যদি সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত হয়ে থাকে, তবে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাকে ভাঙা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। এই হলো বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় দায় তার সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখা। তার জন্য একসময় সে উন্নত দেশগুলিতে সামন্তবাদ ভেঙেছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারই জন্য একসময় সে অনুন্নত দুনিয়ায় পুঁজিবাদকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। আবার তারই জন্য এক সময় অনুন্নত দেশগুলিতে এক বিকৃত ধরনের পুঁজিবাদ বিকশিত করতেও সে পিছপা নয়। প্রায় শত বর্ষ আগে পুঁজির চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন যেমন বলেছিলেন, ''একদিকে যখন পুঁজির রপ্তানির ফলে রপ্তানিকারী দেশগুলিতে বিকাশধারা কিছুটা ব্যাহত হওয়ার ঝোঁক দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে পুঁজির এই রপ্তানির ফলেই আবার সারা জগৎ জুড়ে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশধারা আরও বিস্তৃতি, আরও গভীরতা, লাভ করে।''

এখন আমরা দেখব বিশ্বায়িত পুঁজির ব্যাপক মাত্রায় অনুপ্রবেশের ফলে আজকের ভারতীয় কৃষিতে কী কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটা এবং গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্কের উপর তার কী প্রভাব পড়েছে।

একেবারে প্রথমেই বলে নেওয়া যায়, যাঁরা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সূত্রায়িত ''আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক'' দেশে বিপ্লবের মডেলটি শতবর্ষ পরেও একইভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাঁরা যে শুধু বিশ্বায়ন-উত্তর ভারতীয় কৃষির পরিবর্তনটি অনুধাবন করছেন না তাই-ই নয়, ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতে মার্কিন তত্ত্বাবধানে যে একের পর ভূমি সংস্কার কর্মসূচি ভারত সরকার নিয়েছিল তার উপর কোনো গুরুত্বই দিতে চান না। অথচ ঐ কৃষি-সংস্কার কর্মসূচিগুলি কেবল যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রণোদিত বিশ্বায়ন কর্মসূচিতে ভারতের বাজার যে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে, তিল তিল করে তার একটি ভিত্তি ঐ কালপর্বেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। মনে রাখতে হবে, ঐ কর্মসূচিরও পুরোধা ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সে ঠিকভাবেই বুঝেছিল, একটি দেশকে চরমতম দারিদ্র্যে রেখে, সেই দেশের সংখ্যাগুরু কৃষককে বুভুক্ষু রেখে আসলে একটি

বিপ্লবকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। চীনদেশে কমিউনিস্টদের হাতে তার মর্মান্তিক পরাজয় এবং এইভাবে এক বৃহৎ শোষণক্ষেত্র হারানোর স্মৃতি তখন তাকে তাড়িত করছে। তাদের উপলব্ধি হচ্ছে, একটা মাত্রায় ক্ষুধা ও পশ্চাৎপদতা দূর করতে না পারলে সেই দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ চীনের পথ ধরবে। সামন্ততন্ত্রই যে পশ্চাৎপদতার স্তম্ভ সেটা তারা ভাল করেই জানতেন। তাদের তাত্ত্বিক ল্যাডজেনস্কি যেমন লিখেছিলেন, "তারা (ভূস্বামীরা) হচ্ছে না বুঝে, না চেয়ে, কমিউনিস্টদের মিত্র। কারণ তারাই হচ্ছে বিপ্লবী পরিস্থিতির স্রষ্টা।"

১৯৫২ সালে ব্রিটিশ-মার্কিন উদ্যোগে "কলম্বো প্ল্যান" দিয়ে এই সংস্কার কর্মসূচি শুরু হয়। বিদেশি বিনিয়োগে গ্রামোন্নয়নের কথা তখন থেকেই বলা শুরু হয়। তারপর ১৯৫০-এর দশক জুড়ে ৭০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ আইন, প্রজাস্বত্ব অধিকার সংস্কার, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন, জমির সংহতিকরণ ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ১৯৭৪ সালের জরুরি অবস্থা পর্যন্ত ভূমিসংস্কার আইন নতুন নতুন করে জারি করে। এই আইনগুলি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক কখনই ছিল না, কারণ গ্রামীণ ভূস্বামীদের প্রবল প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা কোনোটাই সরকারের ছিল না। কিন্তু এই আইনগুলি পাশ হবার ফলে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন, বিশেষত বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি এগুলিকে প্রয়োগ করার শ্লোগান সামনে রেখে বড় বড় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে। তার ফলে কিছু সংস্কার ঘটেও। এর ফলে খুব ধীর গতিতে গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র ক্ষয় পেতে থাকে। একই সঙ্গে শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশক ধরে অন্য যে কোনো অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হতে থাকে। ভারতীয় অর্থনীতির এই আপেক্ষিক বিকাশ, তার সঙ্গে এই দেশের বিশালত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের সময়কালে ভারত তাই বিশ্ববাজারে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে যে শোষণ লুণ্ঠনের মৃগয়াভূমিতে পরিণত করা হবে, সাম্রাজ্যবাদ তার ড্রেস রিহার্সাল করে নিল ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে "সবুজ বিপ্লব" কর্মসূচি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। এই প্রযুক্তির জনক ডঃ নরম্যান বোরলগ মেক্সিকোতে এই নতুন প্রযুক্তির শস্যচাষ পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, কিন্তু এই প্রযুক্তি লুফে নেয় আমেরিকার ফোর্ড ও রকফেলার ফাউন্ডেশন। গবেষণার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ডাও কেমিক্যালস, সিবা গাইগি, মনস্যান্টো ইত্যাদি কোম্পানিগুলি। ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশও এই নতুন প্রকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। এই পুঁজি-নিবিড় চাষ যাতে ভারতে ভালভাবে ঢোকানো যায় তার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যৎপরনাস্তি তৎপর হয়ে উঠল। বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে এই বাবদ ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং সেই ঋণ যাতে স্ফীত হয়ে ভারতীয় মুদ্রায় অনেক টাকা হয়, তার জন্য ভারতকে টাকার ৩৭.৫% অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য করল। সার শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে, আমদানি অবাধ করতে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতেও বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে পরামর্শ দেয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "সবুজ বিপ্লব" বাবদ ১১৪০ কোটি টাকা ধার্য্য হয়। এই বিশাল টাকার প্রায় সবটাই খরচা হয়েছিল বিদেশ থেকে সার-বীজ-কীটনাশক আমদানি করতে। ১৯৬৬-তে এক চরম খাদ্যাভাবের পরিস্থিতিতে কার্যত ভয় দেখিয়ে ভারতকে দিয়ে আমেরিকা "সবুজ বিপ্লব"-এর চুক্তিতে স্বাক্ষর করায়।

"সবুজ বিপ্লব" প্রকল্পের প্রাথমিক সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। প্রথম কয়েক বছরের উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা কৃষকদের এই পদ্ধতিতে চাষ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু বাছাই করা অঞ্চলে, যেখানে আগে থেকেই কৃষিকাজের পরিকাঠামো ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক উন্নত ছিল, সেখানে সেখানেই এই চাষ শুরু করা হয়। অতি উচ্চ মাত্রায় বিনিয়োগ এই চাষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিনিয়োগের দুষ্টচক্র— অর্থাৎ একই পরিমাণ ফসল পেতে গেলে প্রতি বছর আগের বছরের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ সার, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষির অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে যেতে হয়। আর এই পদ্ধতিতে চাষ একবার শুরু করলে অন্য পদ্ধতিতে (দেশি) চাষে সহজে ফিরে আসা যায় না। এই চাষে বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয় প্রায়শই ঘটতে থাকে, ফলে একর একর শস্য ধ্বংস হয়। আবার নতুন করে বিনিয়োগের রাস্তা খুলে যায়। এক মার্কিন প্রকল্প হিসেবে এই চাষকে ভারত সরকারের গ্রহণ করতে হয়েছিল। তার মুখ্য বিষয়গুলি এইরকম : উচ্চ ফলনশীল (HYV) বীজের প্রয়োগ, ভূমির উপরের ও নীচের জল ব্যবহার করে উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহার, জমির সংহতিকরণ, সরকারি উদ্যোগে ভূমিসংস্কার, কৃষিঋণ সরবরাহের জন্য সরকারি উদ্যোগ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বিক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা, কৃষি খামারের যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি। এতে স্পষ্টতই খুলে গেল বিশাল পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগের পথ। এই চাষের প্রকৃতিই এমন যে প্রতিবছর এই বিনিয়োগের পরিমাণ কেবল পড়তেই থাকবে। ভারতের শাশ্বত কৃষি-ব্যবস্থা অতি দ্রুত বদলাতে শুরু করল। বড় মাত্রায় পুঁজির বিনিয়োগ, বাজারের সম্প্রসারণ, উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগ, ব্যাপক ভূমিহীন কৃষকের সৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ভাঙছে,

পুঁজিবাদী সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগের স্থানীয় এজেন্ট, কৃষি-উপকরণের বিরাট ব্যবসাদার।

১৯৬০-এর দশকে ''সবুজ বিপ্লব'' নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৯৯০-এর দশকে অর্থাৎ বিশ্বায়নের পর্বে ভারতের বৃহৎ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎসাহিত করল ''সবুজ বিপ্লব''-এর পদ্ধতিতে চাষ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে। ১৯৮০-র দশকে ভারতের কৃষিব্যবস্থা এক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। কৃষির বিকাশের হার ২ শতাংশের নিচে নেমে আসে। ''সবুজ বিপ্লব''-এর প্রাথমিক উচ্ছাস স্তিমিত হয়ে আসে। তাই ১৯৯০-এর দশকে যদি আরও শক্তিশালী রূপে, আরও বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে এই কৃষি-প্রকরণকে ভারতের বুকে নিয়ে আসতে হয় তবে তাকে নতুন আঙ্গিকে আনতে হবে। ১৯৯৪ সালে 'গ্যাট' চুক্তিতে সই করা হল। তাতে যদিও কার্যত ভারতের সমগ্র কৃষি-ব্যবস্থা, তথা গোটা অর্থনীতি, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, কিন্তু সরকারি প্রচারমাধ্যমে বিশ্বায়নকে নিয়ে এমন একটি সুখানুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হল যেন চাষির জীবনে এবার প্রকৃত স্বস্তি আসবে। টোপ হিসেবে উপস্থাপিত করা হল ''জিন'' প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত ''জি-এম'' বীজের ব্যবহার। নাম দেওবা হল ''নতুন সবুজ বিপ্লব''। এই গালভরা নামের আড়ালে প্রবর্তন করা হল ''টার্মিনেটর বীজ'', যা চাষ ক'রে বন্ধ্যা বীজ উৎপন্ন হয়। যার অর্থ, চাষিকে প্রতি বছরই অত্যন্ত চড়া দামে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছ থেকে চাষের জন্য বীজ কিনতে হবে। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেল, আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। তাদের নানা ধরনের বীজের ব্যবসাকে আইনসিদ্ধ করা হল ''বীজ বিল, ২০০৪'' সংসদে এনে। ''গ্যাট'' চুক্তি হয়ে যাওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদের ও দেশি একচেটিয়া কোম্পানিগুলির সামনে ব্যবসা সম্প্রসারণের যত কিছু বাধা ছিল সব অপসারিত হল। ব্যবসাকে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে দেবার জন্য এই ''নতুন সবুজ বিপ্লব'' পুরনো ''সবুজ বিপ্লব''-এর মতো নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আর সংহত করা হল না। সেভাবে করতে গেলে অনেক বেশি পরিকল্পিতভাবে, অনেক বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে, কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে, একটার পর একটা নতুন এলাকা সৃষ্টি করতে হবে। মুনাফার উন্মাদনায় তাড়িত দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অত সময় কোথায়? আর অত বেশি বিনিয়োগই বা সে করতে যাবে কেন? তার থেকে অনেক সহজ পথ হচ্ছে পরিকল্পনাহীন ভাবে ও বিক্ষিপ্তভাবে গোটা দেশ জুড়ে সার, বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টর আর পাম্পসেটের ব্যবহার ছড়িয়ে দেওয়া, আর এইভাবে অনেক সহজে অনেক দ্রুততায় পণ্যের বাজার বাড়িয়ে নেওয়া। বিগত দুটি দশক ধরে সমগ্র ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াই চলছে। আজকের সময়ে এসে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদ প্রণোদিত এই নতুন পদ্ধতির চাষ আমাদের দেশে প্রাধান্যকারী জায়গায় পৌঁছে গেছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে কৃষিতে পুঁজির ভূমিকা নির্ণায়ক জায়গায় চলে এসেছে।

এবার দেখা যাক, এই পর্বে জোতের বিন্যাসে কী কী পরিবর্তন এসেছে। একথা ঠিক যে ''সবুজ বিপ্লব'' প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ বা ব্যাপক বিকাশের কোনো সম্ভাবনা নিয়ে ভারতীয় সমাজে উপস্থিত হয়নি। দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজি নির্দেশিত উপর থেকে চাপানো সংস্কার প্রক্রিয়ায় হবারও কথা নয়। ফলে বাছাই করা কয়েকটি ক্ষেত্রে ''চুক্তি চাষ'', কিছু বাণিজ্যিক ফসলের চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে লাভজনক কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে কৃষিতে সার্বিক অর্থে পুঁজি বিনিয়োগের প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়ের কারণে ফসল ধ্বংস হওয়ার ঘটনা এত বেশি ঘটছে যে কৃষিতে বৃহৎ মাত্রায় বিনিয়োগ ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফলে বৃহৎ জোতের মালিকদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে কৃষি উপকরণের বাণিজ্যে চলে যাওয়া। এতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্যিক পুঁজির মুনাফা নিশ্চিত থাকছে, আর কৃষিকাজের ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা আর বিপর্যয় চাপিয়ে দেওয়া যাচ্ছে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, কখনও বা মাঝারি কৃষকদের উপর। এই পরিস্থিতিতে জমির পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে আজকের পর্যায়ে জমির খণ্ডীভবনই হয়ে উঠছে ভারতীয় কৃষিজোতের মূল বৈশিষ্ট্য। ব্যাপক খণ্ডীভবন যেমন পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনের অনুপস্থিতি সূচিত করছে, একই সঙ্গে তা আবার সামন্ততান্ত্রিক জমিদারতন্ত্রের বিলোপের ইঙ্গিতবাহী। ২০০২-০৩ সালের পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে ১০ হেক্টর বা তার বেশি বৃহৎ জমির মালিকদের (সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয়ে মিলিতভাবে) দখলে আছে মোট কৃষিজমির মাত্র ১৩.১ শতাংশ। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যদি হয় ভৌমিক একচ্ছত্র অধিকারের জোরে অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভূমিখাজনার মারফত শোষণ, তবে বৃহৎ জোতের এই অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতি সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ভিত্তিটি ক্ষয়ে যাবারই সূচনা করে। খণ্ডীভবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জোতের বিপুল বৃদ্ধি। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রান্তিক চাষির সংখ্যা ছিল মোট চাষির ৩৮ শতাংশ, যা ২০০২-০৩-এ বেড়ে হয়েছে ৭০ শতাংশ। ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট কৃষিজমির মধ্যে প্রান্তিক ও ছোট চাষির মালিকানা ছিল ১৬.৩

শতাংশ, যা ২০০২-০৩-এ বেড়ে হয়েছে ৪৩.৫ শতাংশ। ভারতের ২৭টি রাজ্যের মধ্যে ১২টিতে প্রান্তিক ও ছোট চাষির জমির পরিমাণ মোট জমির ৯০ শতাংশ; এই বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে ''সবুজ বিপ্লব'' বা ''নতুন সবুজ বিপ্লব'' যে উচ্চ মাত্রায় বিনিয়োগ দাবি করে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রায়শই উপযুক্ত বিনিয়োগের অভাবে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল মার খেয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিটি আরও মর্মান্তিক হচ্ছে যখন সে চাষের জন্য বড় মাত্রায় ধার নিয়ে আর শোধ করতে পারছে না। ফলে সমাজে ধারাবাহিকভাবে জমি হারানো কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে এটা আজ স্পষ্টই বলা যায় যে এই বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, আধা-মাঝারি বা মাঝারি কৃষকদের সামনে মূল শোষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সার-বীজ-কীটনাশক সহ কৃষিপ্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণকারী ও মালিক দেশি-বিদেশি বহুজাতিক গোষ্ঠীগুলি, তাদের সহযোগী শক্তি আঞ্চলিক ব্যবসাদার, ঋণদাতা বিভিন্ন সংস্থা, নতুন কৃষি-নীতির সমর্থক ও মদতদাতা বড় জমির মালিক ও আঞ্চলিক পুঁজিপতি শ্রেণী। গত শতাব্দীর '৯০-এর দশক থেকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ভারতের কৃষি-ব্যবস্থাকে প্রধানত তার নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নানাভাবে টিকে রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষির সামনে ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি আর মূল বা কেন্দ্রীয় সমস্যা নয়। অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ গৌণ সমস্যা হিসেবে তা টিকে রয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সহযোগী দ্বন্দ্ব হিসেবে কৃষকের সঙ্গে নানা স্থানে নানা ধরনের সংঘাত সৃষ্টি করে চলেছে।

ক্ষুদ্র জোতের যে প্রাধান্যের কথা বলা হল সে সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতকে যাঁরা ''আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক'' বলেন তাঁদের এই মূল্যায়নের পক্ষে একটি বড় যুক্তি হলো এই যে, ক্ষুদ্র জোতের প্রাধান্য থাকাটাই প্রমাণ করে যে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধান স্থানে রয়েছে। তাঁরা ইংল্যান্ডের কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশকে একমাত্র মডেল হিসেবে উপস্থাপিত করেন এবং দেখাতে চান কেন্দ্রীভবন যেহেতু পুঁজিবাদী শিল্পের মতোই পুঁজিবাদী কৃষির এক অনিবার্য প্রবণতা, তাই চাষের জমিরও সেই নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীভবন ঘটবে। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা পুঁজিবাদী বিকাশের সময়ে ইংল্যান্ডের ক্ষুদ্র কৃষকদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে এ যুক্তি সঠিক নয়। ফ্রান্স এবং জাপানের মতো অনেক দেশেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের জোত মালিকরা পুঁজি-নিবিড় চাষ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রেখেছে।

আর তত্ত্বগত ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে পুঁজির বৃদ্ধির হার শুধু জমির বৃদ্ধি দিয়ে মাপা হয় না। একই জমিতে চাষের অন্যান্য উপকরণ বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের মাত্রাকে (Scale of Production) বাড়িয়ে তোলা যায়। এইভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদী চাষের ভুরিভুরি উদাহরণ আছে। ভারতে ঠিক এই বিষয়টি ঘটছে। প্রথমত, বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পিষ্ট ছোট জোতের মালিক চাষের উপকরণ কেনার জন্য যে বিশাল পরিমাণে ঋণ নেয় তার থেকে মুক্তি পেতে তাকে উৎপাদন ব্যাপক হারে বাড়াতে হয়। সে আরও ঋণ করে জমিতে আরও বেশি বিনিয়োগ করার জন্য। আর অন্যদিকে পারিবারিক শ্রমকে আরও নিবিড় মাত্রায় ব্যবহার করে, চাষের তদারকি অনেক বেশি যত্নের সঙ্গে করে। ফলে দেখা যাচ্ছে ছোট জোতের উৎপাদনশীলতা বড় জোতের উৎপাদনশীলতার থেকে বেশি। ছোট জোতেও পুঁজিবাদী চাষ করা ছোট জোতের মালিকদের পক্ষে বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এত চেষ্টাতেও তারা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারছে না; বা কখনও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত হলেও তা কৃষি উপকরণেই বিনিয়োগ করছে, নতুন করে জমি কেনার কথা ভাবছে না। আর বড় জোতের মালিক যে কৃষি-কাজকে আর লাভজনক বলে মনে না করে উদ্বৃত্ত অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করছে তা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। ক্ষুদ্র জোতে পুঁজিবাদী চাষ তাই আজকের ভারতে কৃষি উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ভারতের কৃষিতে শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের চরিত্রটি ঠিক কীরকম তা বিচার করা কৃষিতে উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ণয় করার এক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। ২০০১ সালের জনগণনা, ২০০৪-০৫-এর NSSO-র ৬১তম রাউন্ড এবং ঐ একই সময় সরকার দ্বারা নিয়োজিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগের একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। NSSO-এর ৬১তম রাউন্ডের গণনায় ২০০৪-০৫ বর্ষে ভারতে মোট নিযুক্তি ৪৫.৫৭ কোটি। এর মধ্যে অসংগঠিত (ইনফরম্যাল) ক্ষেত্রের নিযুক্তি ৩৯.৩২ কোটি, তার মধ্যে কৃষিতে নিযুক্তি ২৫.১৭ কোটি। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-০৫-এর মধ্যে ইনফরম্যাল শ্রমিকদের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্তি ৪ শতাংশ কমেছে। NSSO-র হিসাব মতো, কর্মে নিযুক্ত মোট মানুষের মধ্যে ৫৬.৫৬% নিযুক্ত রয়েছে কৃষিতে। গত কয়েক দশক ধরে কৃষিতে নিযুক্তি হ্রাসের চিত্রটি এইরকম : ১৯৭২-৭৩ এ ছিল ৭৩.৯%, ১৯৯৩-৯৪-তে ৬৩.৯%, ২০০৪-০৫-এ ৫৬.৫%। ঐ হিসেবেই দেখতে পারি ১৯৭৩-৭৪-এ জিডিপির ৪১.১% ছিল কৃষি-জাত উৎপাদন যা ২০০৪-০৫-এ হয়েছে ২০-৫%। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের MCWS (Modified Current Weekly Status) পদ্ধতি

অনুসারে ২০০৪-০৫ বর্ষে কাজ করতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ছিল ৪২.৯৮ কোটি, কার্যে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ৪০.১১ কোটি। তার মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ২১.৩ কোটি। ২০০১-এর জনগণনায় ১৯৭১ থেকে ২০০১-এর মধ্যে কৃষি-কর্মীদের খেত মজুরের অংশ ৩৭.৮% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫.৬%। ঐ পর্যায়ে (১৯৭১-২০০১) খেত মজুরদের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ। বৃদ্ধির হার বছরে ২.৭৪%। এই বৃদ্ধির হারকে হিসেবে রাখলে ২০১২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এরপর আসি সেই কৃষককুলের হিসেবে যাঁরা স্বল্প জমির মালিক হলেও জীবনধারণের জন্য মূলত নির্ভর করেন অন্যের জমিতে শ্রম দান করে। এর মধ্যে আছে ১ থেকে ২ হেক্টর জমির মালিক ছোট কৃষক, যাঁদের সংখ্যা ১.৬৫ কোটি, যাঁরা মোট কৃষকদের ১০ শতাংশ। আর আছেন প্রান্তিক কৃষক, যাঁদের জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের কম, যাঁরা মোট কৃষকের ৭০ শতাংশ। শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, ২০০২-০৩ সালে মোট চাষ হওয়া জমিখণ্ডের ৮০% চাষ করেছেন প্রান্তিক ও ছোট কৃষকরা। ১৯৬০-৬১ তে এই সংখ্যাটি ছিল ৬১%। বছরে যে হারে কৃষকদের প্রান্তিকীভবন চলছে তাতে গত একটি-দশকে তা যে অনেক বেড়ে গেছে, আমাদের হাতে একেবারে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান না থাকলেও প্রবণতা দেখে অনুমান করা কঠিন নয়। ভূমিহীন খেতমজুররা হচ্ছেন গ্রামীণ সর্বহারা এবং ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকরা হচ্ছেন আধা সর্বহারা। সমগ্র চিত্রটি দাঁড়াচ্ছে এই যে— (১) কৃষিক্ষেত্রে সর্বপ্রকার নিযুক্তিই স্থির গতিতে কমছে। কৃষিক্ষেত্রে কাজ হারানো মানুষ শহরে সংগঠিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিল্পক্ষেত্রে কাজ পাচ্ছে না। তাঁরা শহর ও গ্রামের এক বিপুল অসংগঠিত ও অ-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে যোগদান করছেন এবং সৃষ্টি করছেন সর্বহারা-আধাসর্বহারাদের বিশাল এক বাহিনী। (২) প্রান্তিক চাষির সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে এবং সৃষ্টি করছে আধা-সর্বহারাদের এক বিপুল বাহিনী যারা বছরের অধিকাংশ সময়ই কাজের জন্য নিজ গ্রামে, অন্য কোন (সুদূর) গ্রামাঞ্চলে বা কাছের বা দূরের শহরাঞ্চলে শ্রমিক হিসেবে কাজ পাবার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। (৩) ভূমিহীন খেত মজুরদের সংখ্যাও অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যাদের বেশির ভাগ অংশ নিজ গ্রামের বাইরে (দূরে বা কাছে) কাজ করছেন বা কাজ খুঁজছেন। এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কৃষিতে যে মাত্রায় উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ বেড়ে চলেছে সে মাত্রায় প্রান্তিক বা ভূমিহীন হয়ে যাওয়া কৃষক গ্রামে কম কাজ পাচ্ছেন। একমাত্র যেসব জায়গায় অল্প সময়ে চাষের কোনো একটি পর্ব শেষ করা জরুরি হয়ে পড়ে সেখানেই একসঙ্গে প্রচুর কৃষি-শ্রমিকের দরকার পড়ে। এই ধরনের কাজের সন্ধানে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার (migration) ঘটনা সারা ভারতেই ঘটছে। আমরা আগেই দেখেছি, কৃষিতে যুক্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে (বিগত ১০ বছরে এই হ্রাসের হার হিসেব করলে এই সংখ্যাটি ৫০%-এর নীচে নেমে গেছে), জিডিপি-তে কৃষি-উৎপাদনের অংশ মারাত্মকভাবে কমে গেছে (২০০৪-০৫-এই ২০.৫%), প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা (আধা-সর্বহারা) অবিশ্বাস্য রকমের বেড়ে গেছে, ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা (সর্বহারা) অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সবই কৃষিতে পুঁজিবাদী উপাদান বৃদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে তা হল জমি থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হলেই তাদের চরিত্র সর্বহারা বা সর্বহারা হবার অভিমুখী হয় না। জমি হারালেও বা জমি হারাতে থাকলেও কৃষকের কৃষক চরিত্রই প্রাধান্যে থাকতে পারে। কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি মূলত সবাধ, না অবাধ, তাই দিয়ে বুঝতে হবে কৃষকের চরিত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি পণ্য হয়ে ওঠে। তাই অন্যান্য পণ্যের মত শ্রমশক্তিও নির্দিষ্ট মূল্যে শ্রমের বাজারে কেনা-বেচা হয়। কৃষির ক্ষেত্রেও তাই। এই কেনা-বেচার কাজটি যে মাত্রায় অবাধ হবে, সেই মাত্রায় শ্রমশক্তি তার পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করবে। বিপরীত পক্ষে যদি দেখা যায়, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে জমির মালিক তাদের সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্যবহার ক'রে, অর্থাৎ অর্থনীতি-বহির্ভূত উপায়ে উদ্বৃত্ত আহরণ করছে তবে তা হবে শোষণের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি। আমাদের দেখতে হবে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত এই বিপুল সংখ্যক সর্বহারা-আধা-সর্বহারার নিয়োজিত শ্রম প্রধানত কোন্ চরিত্রবিশিষ্ট। যদি দেখা যায় তাঁদের প্রদত্ত শ্রম নির্দিষ্ট কোন জমির সঙ্গে বা নির্দিষ্ট কোন মালিকের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আছে, তবে সে শ্রম অবশ্যই সবাধ। এবার দেখতে হবে "বাঁধা" থাকার কী কী রকমফের থাকতে পারে। এ ধরনের সবাধ-শ্রমের ক্লাসিকাল উদাহরণ অবশ্যই "মুচলেখাবদ্ধ" কৃষক। আমরা সবাই জানি তার অস্তিত্ব এখন আর প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু অন্য একভাবেও শ্রম সবাধ হতে পারে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে এ ধরনের সবাধ শ্রমের অস্তিত্ব থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ সাম্রাজ্যবাদ-একচেটিয়া পুঁজি-সামন্তবাদ নিয়ন্ত্রিত সমাজে শহরে শিল্পের বিকাশ থাকে সীমিত। ফলে সেখানে শ্রমের বাজারও থাকে সীমিত। আবার কৃষিতে বিনিয়োগও থাকে সীমিত। ফলে কারিগরি থাকে নিম্নমানের, থাকে ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব। শহরে বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকে না বলে কৃষক গ্রামেই থেকে যায়। কৃষি সর্বহারার রূপান্তরিত হবার বদলে সে নিঃস্ব কৃষক হয়ে যায়। এই অবস্থায় কৃষক বাধ্য হয় ভূস্বামীদের শর্তে কৃষিতে নিয়োজিত হতে। এই নিয়োগ আবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ। স্বাধীন শ্রমিকের চেয়ে আবদ্ধ শ্রমিকের উপর শোষণের হার

ভূস্বামীগণ নিজের সুবিধামত বাড়িয়ে নেয়। এই পরিস্থিতি থেকে উপজাত আর একটি বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উপকরণের নিম্নমান এবং ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব ভূমিহীন হয়ে যাওয়া কৃষকের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব জিইয়ে রাখে। জমি পেলে নিজ উদ্যোগে কৃষিকর্ম চালানো তার পক্ষে সহজেই সম্ভব বলে সে একখণ্ড কৃষিজমি পেতে চায়। ফলে তার মধ্যে থাকে জমির ক্ষুধা। এই ধরনের পরিমণ্ডলে এই ধরনের কৃষক শারীরিকভাবে সর্বহারায় পরিণত হলেও মানসিকভাবে কৃষক চরিত্রেরই থেকে যান। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বর্তমান ভারতের কৃষি শ্রমিককে বিচার করলে দেখা যাবে যে এখন কৃষিতে বিনিয়োগের মাত্রা এত বেশি যে জমি পেলে নিজ উদ্যোগে চাষ করার স্বপ্ন কৃষকের জীবন থেকে অনেক আগেই মুছে গেছে। যে কৃষক প্রতিনিয়ত চোখের সামনে রেখেছে বিনিয়োগের অক্ষমতার কারণে মাঝারি কৃষক প্রান্তিক কৃষকে, প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে, তার কাছে এক খণ্ড জমি যদি আসেও, সেটা বোঝায় পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, একথা ঠিক যে আজকের ভারতে সংগঠিত শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা অতি দ্রুত ক্ষীয়মান হচ্ছে। ভারতের শিল্প বিকাশের যে "বিকৃত" চরিত্র, তাতে এটাই হওয়া স্বাভাবিক। গ্রাম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে যাওয়া কৃষক মুখ্যত শহরে, আধা-শহরে অসংগঠিত ও অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে চলেছে সর্বহারা-আধা-সর্বহারার বিপুল বাহিনী— ভ্যান, রিক্সা, অটো-চালক, চায়ের দোকান, রেস্টুরেন্টের কর্মচারী, হকার, সিকিওরিটি গার্ড, এটিএম কর্মচারী, কুলি, বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা, ছোট ছোট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের শ্রমিক, আরও অসংখ্য নানা কাজে। ভারতের আজকের পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রটি সংখ্যা ও শক্তির বিচারে একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝার জন্য বিশেষ গবেষণা ও চর্চা দাবি করে। অনেক কৃষকই আছেন যাঁরা কৃষিকাজ বা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে যেতে চান না, অনেকের উপায়ও থাকে না। এটি সবাধ শ্রমের কোন উদাহরণ হতে পারে না। চাকরি সহ যে কোন পেশার ক্ষেত্রেই এরকম হতে পারে। মাহিন্দার প্রথা বা অন্য কোন চুক্তিবদ্ধতা থাকলেই তাকে সবাধ শ্রম বলা যায় না। নিয়োগের বহু ক্ষেত্রেই চুক্তি ব্যবস্থা আছে। চুক্তিতে কাজের ক্ষেত্রে শ্রম সবাধ, না অবাধ, তা মালিকের সঙ্গে সম্পর্কের অন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। শুধুই চুক্তিবদ্ধতা বা চুক্তির মেয়াদের উপর তা নির্ভরশীল নয়। বিশ্বায়নের পর্বে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সর্বহারাকরণ প্রধান প্রবণতা, শ্রমের অবাধ হয়ে ওঠাও প্রধান প্রবণতা।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদ্বৃত্তের পরিমাণকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলার তাগিদে উৎপাদিকা শক্তির বিরামহীন বিকাশ এবং তার জন্য উৎপাদিত উদ্বৃত্তর পুনর্বিনিয়োগ। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদনে নিয়োজিত হয় না, অনুৎপাদক খাতে ব্যয় হয়। ফলে উৎপাদিকা শক্তিরও বিকাশ হয় খুব শ্লথগতি। যেমন সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতে যুগ যুগ ধরে লাঙ্গল-বলদের ব্যবহার। প্রথমে "সবুজ বিপ্লব" পরে বিশ্বায়ন পর্বের "নতুন সবুজ বিপ্লব"-এর ফলে কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে। আমরা একেবারে শুরুতে আলোচনা করেছি, এই বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়াই আজকের সময়ে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের পূর্ব শর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল সরকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মাধ্যমে এই কৃষি-উপকরণের বাজারটি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাড়িয়ে চলেছে। এ বিষয়ে একেবারে সাম্প্রতিকতম তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া যায় তাতেই কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের ধারাবাহিক বৃদ্ধি নজর কাড়ার মতো। কিছু তথ্য এখানে উপস্থিত করছি। ২০০৪ সাল পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে যত ট্রাক্টর আছে তা দিয়ে চাষ করলে ট্রাক্টর পিছু জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯ হেক্টর, যা একটা ট্রাক্টরের সাহায্যে ১ মাসে চষে ফেলা যায়। ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০৩-০৪-এ আমাদের দেশে ট্রাক্টর বিক্রি হয়েছে ১১,৮৮,৭৩৫টি। ঐ একই সময়ে পাওয়ার টিলার বিক্রি হয়েছে ৭৫,৫৬৬টি। ১৯৮২-৮৩-তে কৃষিতে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার ছিল ১৭,৪১৭ মিলিয়ন kw ঘণ্টা, সেখানে ১৯৯৮-৯৯-তে হয়েছিল ৯৭,১৭৫ মিলিয়ন kw ঘণ্টা যা দেশের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৩০ শতাংশ। নাইট্রোজেন-ফসফেট-পটাশিয়াম সারের ব্যবহারে বৃদ্ধির মাত্রা আরও বিস্ময়কর। ১৯৫১-৫২-তে ৬৫ হাজার টন, ১৯৮২-৮৩-তে, ৬৩,৮৮৩ হাজার টন এবং ২০০২-০৩-এ ১৬,০৯৪ হাজার টন। ১৯৫২-৫৩-র তুলনায় এই বৃদ্ধি ২৪৫.৬ গুণ। কীটনাশকের ব্যবহার ১৯৬০-এ ছিল ২০০০ টন, ১৯৯৩-৯৪-তে তা হয়েছে ৯০,০০০ টন। HYV বীজ ব্যবহার হয় এমন জমির পরিমাণ ১৯৯৩-৯৪-তে ধানের ক্ষেত্রে ছিল ৭০% এবং ১৯৯২-৯৩-তেই গমের ক্ষেত্রে ছিল ৯০.৮%। ১৯৫০-৫১ সালে মোট কর্ষিত জমি ছিল ১১৮.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর, যার মধ্যে সেচ-সেবিত ছিল ২২.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর। ২০০০-২০০১-এ মোট কর্ষিত জমি ছিল ১৪১.১০ মিলিয়ন হেক্টর, তার মধ্যে সেচ-সেবিত ছিল ৭৫.১৪ মিলিয়ন হেক্টর। এ প্রসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বৃদ্ধির পরিমাণটিও উল্লেখ করা যায়। ১৯৯২-৯৮-তে এই ঋণের (সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে) পরিমাণ ছিল ৩২,৯৫৬ কোটি টাকা যা ২০০৩-০৪-এ বেড়ে হয়েছে ৮০,০০০ কোটি টাকা।

এই বিপুল ঋণ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর ঋণগ্রস্ততা, যার হিসাব খুব সংক্ষেপে হলোঃ ২০০৩-এ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ৮.৯৪ কোটি পরিবারের মধ্যে ৪.৩৪ কোটি (৪৮.৬%) পরিবারই ছিল ঋণগ্রস্ত। যাই হোক, এই ঢালাও ঋণদান ব্যবস্থা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান পুঁজি বিনিয়োগের সহায়ক। কৃষিতে উদ্বৃত্তের এক বড় অংশই যে কৃষিতে পুনর্বিনিয়োগ হয়েছে আমরা যে পরিসংখ্যান দিলাম তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৃহৎ জোতের মালিকদের একাংশ তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি কৃষিতে পুনর্বিনিয়োগ না করে কৃষি উন্নয়নের ব্যবসায়ে বা অন্য কোন শিল্পে বিনিয়োগ করছে। এটাও পুঁজিবাদী নিয়মের মধ্যেই পড়ে, কারণ এক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্য করার তা হচ্ছে উদ্বৃত্তের উৎপাদনমুখী ব্যবহার হচ্ছে কিনা। এমন কি বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবেও যে পুঁজি ব্যবহৃত হচ্ছে তা পুঁজির সঞ্চালন (Circulation) প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়ে পুঁজির পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াকে যদি সাহায্য করে তবে তাকে উৎপাদনমুখী ব্যবহার বলেই গণ্য করতে হবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য বাজারে গিয়ে বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত হাসিল করে এবং এই প্রক্রিয়াতেই মুনাফা অর্জিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূসম্পত্তির মালিকরা বাজারের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে, আর কৃষকেরাও বাজারের বাইরেই তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর একটা অংশ বিনিময় করে তাদের সাংসারিক প্রয়োজন মেটায়, খাদ্য শস্যের একটা অংশ নিজেরা ভোগ করে, কিছুটা বীজ হিসেবে, কিছুটা মজুরদের মজুরি হিসেবে, মালিককে দেয় খাজনা (payment in kind) হিসেবে ব্যবহার করে। এক কথায় সামন্ততান্ত্রিক (বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক) উৎপাদন ব্যবস্থায় বাজারের প্রচলন এতই কম থাকে যে বাজারে বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত হাসিল করার ঘটনা সমাজে গৌণ স্থানে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে সমাজে বাজারের ভূমিকা কতটা তা দিয়ে বহুলাংশে নির্ণয় করা যায় সমাজ-বিকাশের স্তর। কোনও সন্দেহ নেই যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় ভারতে বাজারে পাঠানো উদ্বৃত্ত (marketed susplus) অনেক কম। ২০০৪-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের একটি রিপোর্ট অনুসারে ২০০২-০৩ সালে ধান ৪৩%, গম ৫১.৫%, ডাল ৭২.৪%, তৈলবীজ ৭২.৬%, আখ এবং তুলো ৯৩% উদ্বৃত্ত হিসেবে বাজারজাত হয়েছিল। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে, বিশেষত বিশ্বায়নের পর্বে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে কৃষি-পণ্যের বাজারজাত হবার প্রবণতার একটি উল্লম্ফন ঘটেছে। বিশ্বায়িত পুঁজির এক লোভনীয় মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবে যে পরিমাণে ভারতকে নিশানা করা হল, সে পরিমাণেই ভারতীয় কৃষির বাজার হু হু করে সম্প্রসারিত হলো। দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা বিক্রিত কৃষি উপকরণের বাজার একদিকে উদ্দাম গতিতে বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদিত কৃষি-সামগ্রীর বাজারও বাড়তে লাগল। সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে যে পরিমাণে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস করে বাণিজ্যিক পণ্যের চাষ বাড়ানো হয়েছে, সেই পরিমাণেই কৃষিপণ্যের বাজার-জাত হবার মাত্রা বেড়েছে। ঋণগ্রস্ত কৃষক অভাবী বিক্রি (distress sale) বাড়িয়ে সেই টাকায় ঋণ শোধ করছে, ফলে অনেক সময় নিজের ব্যবহারের খাদ্যশস্য বিক্রি করতে হচ্ছে। আবার পরবর্তী সময়ে বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে অনেক চড়া দামে। সবটা মিলিয়ে পরিস্থিতি এই যে ১৯৯০-৯১ সালের পর থেকেই কৃষিপণ্যের সিংহভাগ বাজারে চলে যাওয়াটাই প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ও দেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষার জন্য সদাব্যস্ত ভারত সরকারও বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য খুবই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষি-পণ্য বাজারে বিক্রির জন্য (marketing) ১৯৯৯ সালেই ''অ-ঋণ সমবায় সমিতি''-র সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬১ হাজার, তার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৬০ লক্ষ এবং সেখানে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ১৬ হাজার। বাজারের উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠা ''কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ সমবায় সমিতি'র সংখ্যা ১৯৬২-৬৩তে ছিল ৩২৬টি, আজ তার সংখ্যা ২৫০০০। এসব তথ্যই প্রমাণ করছে ভারতে কৃষি-পণ্যের বাজার ব্যবস্থা কৃষি-পণ্যের বাজারের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের দেশের পুঁজির বিকাশের চরিত্র খর্বিত প্রকৃতির বলেই বাজার ব্যবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে প্রাক্-পুঁজিবাদী অনেক বৈশিষ্ট্য। উন্নত পুঁজিবাদী দেশের কৃষকদের মতো আমাদের দেশের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের পুরোটাই বাজারে বিক্রি করে না। খোরাকির জন্য খাদ্যশস্যের একাংশ বিক্রি না করে কাছে রেখে দেওয়া বা খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যে জমিতে অন্য ফসল উৎপাদন করলে লাভ বেশি হয়, তার চাষ না করে খাদ্যশস্য চাষ করার চিরাচরিত অভ্যাস এখনও অনেক কৃষকের মধ্যে রয়ে গেছে। এগুলি উন্নত পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক, একথা যাঁরা বলেন তারা আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন তাঁদের বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে। সে দুটি হল ভাগচাষ প্রথা ও মহাজনি প্রথা। একথা ঠিক যে ভাগচাষ প্রথা আমাদের দেশে বেশ ভাল রকমই দেখতে পাওয়া যায়, তবে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত ভাগচাষ ব্যবস্থা মানেই সামন্ততান্ত্রিক না-ও হতে পারে। ভাগচাষ ব্যবস্থা মানেই সামন্ততান্ত্রিক, এ ধারণার উৎস আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে যে ভাগচাষ ব্যবস্থা প্রাধান্যকারী

জায়গায় ছিল তা ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির, কারণ জমির মালিক উৎপাদন নিয়ে মাথা ঘামাত না, খাজনা হিসেবে উদ্বৃত্ত যা পেত তাকে উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষিতে আবার বিনিয়োগ করার বদলে ভোগবিলাসেই খরচা করে ফেলত। অনেক ক্ষেত্রে তারা হতো শহরবাসী (absentee landlord)। এই ধরনের ভাগচাষ সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু জমির মালিক যদি উৎপাদন বাড়িয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য তৎপর থাকে এবং তার জন্য সে যদি উৎপাদন খরচার এক অংশ নিজে ব্যয় করে, ভাগচাষিকে ঋণ দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে সহযোগিতা করে, কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি বসবাস ক'রে কৃষিকাজে তদারকি করে, তবে বুঝতে হবে জমির মালিকের মনোভাবে মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের মালিককে তখন আর সামন্ততান্ত্রিক বলা ঠিক হবে না। "সবুজ বিপ্লব"-এর প্রবর্তন কাল থেকে ভাগচাষের জমির মালিকেরা এ প্রবণতা দেখাতে শুরু করেছে, কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ যখন ১৯৯০-এর দশক থেকে লাফ দিয়ে বেড়েছে, তখন এ ধরনের ভাগচাষ বেড়ে গেছে। এর সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। এখানে ভাগচাষ প্রথা এবং কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সহাবস্থান করছে। কৃষির জন্য ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যাবার জন্য অনেক ছোট জোতের মালিক সম্পন্ন কৃষকের কাছে জমি ভাগে দেয়। এই ভাগ চাষ অবশ্যই পুঁজিবাদী।

মহাজনি কারবার বর্তমানে ভারতের ঋণ ব্যবস্থার এক-চতুর্থাংশে পরিণত হয়েছে। যেটুকু টিকে রয়েছে তা অবশ্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে যে প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে রয়েছে তারই সূচক। কারণ মহাজনি কারবার বলতে বোঝায় পুঁজি উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে অনুৎপাদক সুদের কারবারে খাটানো। যেসব অঞ্চলে এ ব্যবস্থা এখনও বজায় আছে সেখানে অর্থনীতি-বহির্ভূত উপায়ে ঋণগ্রহীতাকে দমিত করে অনেক উঁচু হারে সুদ নেওয়ার প্রচলন দেখা যাবে। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন ব্যক্তিগত ঋণই মহাজনি ঋণ নয়। ঋণ যখন উৎপাদন বাড়াবার জন্য দেওয়া হয় যেমন উৎপাদনে নিয়োজিত করার জন্য ভাগচাষিকে দেওয়া ঋণ বা চাষের মরশুমে মজুর সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে খেতমজুরদের দেওয়া ঋণ, তখন এই ঋণের চরিত্র আর প্রাক্-পুঁজিবাদী থাকে না। আবার এ ঋণ পুরো মাত্রায় পুঁজিবাদীও নয়, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মতো তা নৈর্ব্যক্তিক নয়। আমাদের দেশের ধনী জোতমালিকেরা টাকা পয়সা সাধারণত চাষে বিনিয়োগ না করে বেশি লাভের তাগিদে সুদে খাটায় বলে একটা কথা খুব চালু আছে। এ কথাটাও আংশিক সত্য, কারণ প্রথমত বর্তমান সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বল্প সুদের ঋণ গ্রামের কৃষকদের কাছে ক্রমশই বেশি বেশি করে লভ্য হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ধনী কৃষকদের যদি মূল প্রবণতা থাকত সুদের কারবার করার, তবে কৃষিতে গত কয়েকটি দশক ধরে যে হারে বিনিয়োগ বেড়ে চলেছে তা তারা করতে পারত না। কৃষিতে যে লাগাতার উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে চলেছে তার অনেকটাই ঘটেছে ধনী কৃষকের হাত দিয়ে।

যখন আমরা সাধারণভাবে ব্যবহৃত মার্কসবাদী মানদণ্ডে ভারতীয় কৃষির পরিস্থিতি বিচার করে দেখি— এখানে কৃষিব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্র প্রধানত বিলুপ্ত হয়েছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রধানত কায়েম হয়েছে, তখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এখনও থেকে যাওয়া প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে সেদেশের সমাজ-অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও তার বিকাশের স্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও পুঁজির প্রয়োজন ও পরিকল্পনা দ্বারা, সে ধরনের একটি দেশে পুঁজির বিকাশ যে নানাভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এখনও বহুরাজ্যে বেনামী জমি রয়ে গেছে। জমির উর্ধ্বসীমা আইন ঠিকমতো কার্যকর হয়নি, রয়ে গেছে আবদ্ধ শ্রমিক, সুদখোর মহাজন, উৎপাদিত পণ্যের আঞ্চলিক ভোগ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন পুনর্বিনিয়োগ না হওয়া, জাত-পাত ভিত্তিক শোষণ। আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই ধরনের উদাহরণগুলি দিয়েই যেন আজকের ভারতকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক বলার ঝোঁক তৈরি না হয়। খেয়াল রাখতে হবে এর বিপরীত উদাহরণগুলি যেগুলি সংখ্যাগতভাবে ও গুণগতভাবে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে সমাজে উপস্থিত হয়ে গেছে সেগুলিকে মেনে নেওয়ার সাহস যেন আমরা দেখাতে পারি।

একটি রক্তক্ষরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (ফরাসি) বা নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (চীন) ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কোনমতেই ভাঙা যায় না— আমাদের রক্তে-মজ্জায় স্থায়ী আসন পেতে রাখা এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার সময় বোধ হয় এসে গেছে। বিপ্লবীও নয়, গণতান্ত্রিকও নয়, এমন সংস্কার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র ক্ষয় পেতে পেতে পুঁজিবাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবার ইতিহাস ইওরোপের নানা দেশেই আছে। তখন যদি উদীয়মান সর্বহারার ভয়ে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে সামন্তবাদের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে এক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করতে পারে, তবে সাম্রাজ্যবাদ এখন তা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করতে পারে, কারণ তার কাছে এখন সর্বহারা বিপ্লবের কোন হুমকি নেই। তার কাছে এখন এই মুহূর্তের টিকে থাকার প্রশ্নটি জরুরি। বাজার সম্প্রসারণের জন্য তাকে অনুন্নত দুনিয়ার সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতা ভাঙতেই হবে। আর পুঁজিবাদ তো সব সময়ই তাৎক্ষণিকতার যুক্তিতে চলে!

ভূমি সংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যুগে ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব দ্রুত কমছে। তবুও কৃষি অর্থনীতির শ্রেণীচরিত্র নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব যে কমছে না তার কারণ, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ (২০০৯-১০) তথ্য অনুসারে এদেশে শ্রমজীবী মানুষের ৫৩.২ শতাংশ এখনও প্রধানত কৃষি থেকেই তাদের জীবিকা অর্জন করে। কৃষি এখনও এদেশের জীবিকার প্রধান উৎস। যাঁরা অন্য এক ভারতবর্ষ গড়ার জন্য শ্রমজীবী ভারতবাসীদের সংগঠিত করতে চান, কৃষি-নির্ভর শ্রমজীবীদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করা তাঁদের কাছে তাই এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের চরিত্র কী, শ্রেণীদ্বন্দ্ব নির্ধারণে প্রাক-পুঁজিবাদী বা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের গুরুত্ব কত, উৎপাদন সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে কোন্ শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিকাশের পক্ষে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, একাধিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকলে (সেটাই স্বাভাবিক) কোন্ শ্রেণীদ্বন্দ্বটি প্রধান— এই ধরনের বহু প্রশ্ন আছে, যেগুলির উত্তর পাওয়া দরকার। যাঁরা এসব নিয়ে অ্যাকাডেমিক বা কেতাবি বিতর্ক করেন তাঁদের কাছে এ আলোচনার গুরুত্ব যতটা, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কর্মসূচি রূপায়ণের কাজটায় যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের কাছে এই আলোচনার গুরুত্ব তার তুলনায় অনেক বেশি। শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংক্রান্ত ধারণা থেকে তাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের সমাজবিপ্লব সংক্রান্ত কর্মসূচি। ধারণা ভুল হলে তাঁদের কর্মসূচি ভুল হবে। কর্মসূচি ভুল হলে তাঁরা সমাজপরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমজীবীদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হবেন। শুধু তাই নয়। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মুখে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক কর্মীবাহিনীকে রক্ষা করতে পারবেন না, বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লবের শক্তিই জোরদার হবে তাঁদের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের দরুন। অ্যাকাডেমিক আলোচনার ভুলের দায় সমাজকে যতটা বহন করতে হয়, বিপ্লব প্রচেষ্টার ভুলের দায় বহন করতে হয় সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায়।

শ্রেণীদ্বন্দ্বের চরিত্র আলোচনায় প্রয়োগগত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখার কথাটা ওঠে এই প্রসঙ্গেই। কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্বের চরিত্র নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কসবাদী বাচন অনুসরণ করে 'উৎপাদন সম্পর্ক'র কথা ওঠে। আর সেই সূত্র ধরে আসে 'সামন্ততান্ত্রিক', 'আধাসামন্ততান্ত্রিক', 'পুঁজিবাদী'— এই ধরনের বর্গ বিভাজনের কথা। এই ধরনের বর্গ বিভাজন অবশ্যই করতে হবে। তবে কর্মসূচি নির্ধারণের তাগিদ থেকে যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের বিবেচনায় সর্বাগ্রে আসে বর্গ বিভাজন সম্পর্কিত আলোচ্য অনুমানটি যে ধরনের শ্রেণী বিভাজনের অস্তিত্ব সূচিত করে, সেই প্রেক্ষিতে আশু ও দূরায়ত কর্মসূচি কী হবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলো। যদি অনুমান এরকম হয় যে উৎপাদন সম্পর্কটি মূলত পুঁজিবাদী, তাহলে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তও করা হয় যে কৃষিবিপ্লবের স্ট্র্যাটেজিক কর্মসূচি যে ভূমিসংস্কার— যার মারফত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে— সেটির গুরুত্ব বিদ্যমান সমাজে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, পুঁজিবাদের অসমান বিকাশের দরুন কোথাও কোথাও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে এ কাজটার গুরুত্ব থাকতেও পারে, তবে দেশজোড়া যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি তাতে এর গুরুত্ব আর নেই। এর বদলে প্রয়োজন হবে অন্য এক কর্মসূচি যেখানে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রেও মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটানো হবে স্ট্যাটেজিক কর্মসূচি, ঠিক যেমনটি ভাবা হয় কারখানা-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে। কেতাবি বিতর্ক হয়ত এখানেই শেষ হবে, কিন্তু কর্মসূচি রূপায়ণ যাদের লক্ষ্য, তাঁদের আবার ভাবতে হবে, এই 'মজুরি দাসত্বের অবসান'-এর বাস্তব রূপটি কী হবে কৃষিতে? রাষ্ট্র কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ? সমবায় মালিকানা তৈরি করা? নাকি অন্য কিছু? মজুরি দাসকে কি সরাসরি জমির মালিক করা যাবে না এই ধরনের বিপ্লবে? এসবের বাস্তব রূপ কী, সেটাও তাঁদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। এই সব জটিলতা মনে রেখে এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতির শ্রেণীচরিত্র কী, সেই বিষয়টি নিয়ে। আলোচনার প্রেক্ষাপট আজকের ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি, যে অর্থনীতিকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতিকে, নয়া উদারবাদী সংস্কার যেখানে রাষ্ট্রনীতির দিশা।

কৃষিজীবীদের ভারতবর্ষ: সংগঠিত ও অসংগঠিত কৃষি

বিংশ শতকের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতবর্ষের স্থূল বা গ্রস জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ২৩.৮ শতাংশ। এক দশক পরে, অর্থাৎ ২০০৯-১০ সালে স্থূল জাতীয় আয়ে কৃষির শেয়ার ২৩.৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.৬ শতাংশে। এদেশে জাতীয় উৎপাদনে কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্রুত কমছে। কিন্তু কারখানা উৎপাদনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমছে, এমন নয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে এদেশে জাতীয় উৎপাদনে কারখানা ক্ষেত্রের শেয়ার ছিল ১৫.৫ শতাংশ। এক দশক পরে এটি দাঁড়িয়েছে ১৫.৯ শতাংশে।

কারখানা উৎপাদন নয়, এদেশে কৃষির গুরুত্ব কমিয়েছে

সেবা পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র। বর্তমানে এদেশে জাতীয় উৎপাদনের ৫৭.৩ শতাংশ আসে সেবা পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে।

উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে কৃষির গুরুত্ব কমলেও, নিয়োগক্ষেত্র হিসেবে কৃষির গুরুত্ব কিন্তু এখনও সর্বাধিক। ২০০৯-১০ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রদত্ত তথ্য (৬৬ রাউন্ড) অনুসারে, এদেসের শ্রমজীবীদের ৫৩.২ শতাংশের জীবিকার উৎস এখনও কৃষি। সেবা পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে জাতীয় আয়ের ৫৩.৩ শতাংশ পাওয়া যায় বটে, এই উৎপাদন ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করেন কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীদের মাত্র ২৫.২৮ শতাংশ। জীবিকার উৎস হিসেবে কারখানা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়েছে, একথাও ঠিক নয়। শ্রমজীবীদের মাত্র ১১.০৩ শতাংশ কাজ পান কারখানা ক্ষেত্রে। এক দশক আগে তুলনীয় সংখ্যাটি ছিল ১১.১ শতাংশ।

কৃষিক্ষেত্র থেকে যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন, ২০০৯-১০ এর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রদত্ত তথ্য অনুসারে তাঁদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ২৪.৪৮ কোটি। 'জীবিকা অর্জন' কথাটাকে এভাবে বুঝতে হবে যে, কৃষি এদের জীবিকার প্রধান উৎস। এঁরা অন্য কোনো কাজ করতেও পারেন, কিন্তু এঁদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। মার্কসবাদী বাচন অনুসারে, এই ২৪.৪৮ কোটি ভারতবাসীর উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এ দেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত ভারতবাসীর আনুমানিক সংখ্যা হলো ৪৬.০২ কোটি (বাকিরা অর্থকরী কাজ করার দলে নেই। এঁদের অনেকে কর্মক্ষমই নন— শিশু বা বৃদ্ধ। অনেকে আবার কর্মক্ষম কিন্তু অর্থকরী কাজ করেন না— যথা বাড়ির মহিলাদের একটা বড় অংশ, স্কুলকলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি।) বলা যায় যে এঁদের অর্ধেকের বেশির (৫৩.৩ শতাংশ) ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারিত হয় কৃষিতে। উৎপাদন সম্পর্ক সম্পর্কিত আলোচনায় কৃষির গুরুত্ব আসে এই প্রেক্ষিতেই।

২৪.৪৮ কোটি কৃষিজীবীর মধ্যে ২৭.৪ লক্ষ কাজ করেন সংগঠিত ক্ষেত্রে (যে সংস্থায় ১০ জনের বেশি সংখ্যক শ্রমজীবী এক সঙ্গে কাজ করেন)। বাকি সবাই (২৩.৭৬ কোটি) কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। শিল্প, সেবাপণ্য উৎপাদন এবং কৃষি, এই তিন নিয়োগ ক্ষেত্রে নিযুক্ত ভারতবাসীর মধ্যে ৪২.৭২ কোটি কাজ পান (এবং কাজ করেন) অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সুতরাং বলা যায়, এদেশে যত সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী আছেন তার ৫৫.৬২ শতাংশ কাজ করেন কৃষিতে। এখানে যা তথ্য দেওয়া হলো, তার ভিত্তিতে এ কথাও বলা যায় যে এদেশের কৃষিতে বড় মাপের চাষ, যেখানে দশ জনের বেশি শ্রমজীবী একসঙ্গে কাজ করেন, এমন চাষ খুব কমই ঘটে থাকে। কৃষি থেকে যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের মাত্র ১.১ শতাংশ কাজ পান সংগঠিত কৃষিতে (সরকারি ফার্ম, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ম, বাগিচা শিল্প ইত্যাদিতে)। বাকি প্রায় ৯৯ শতাংশ যুক্ত আছেন ছোট খামারে, যেখানে অনধিক দশ জন একসাথে কাজ করেন। উৎপাদন সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনায় এই তথ্যটির সরাসরি কোনো তাৎপর্য নেই— অসংগঠিত কৃষিতেও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে পারে। আবার বড় বাগিচাতেও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক থাকা সম্ভব। এই তথ্যটির যা তাৎপর্য তা হলো, এদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলেও সেটা সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ মারফত ঘটছে না। বড় বড় জোত, যেখানে বাগিচা গড়ে এক সঙ্গে বহু শ্রমিককে মজুরির বিনিময়ে কাজ করানো হয়, ভারতবর্ষে সে সবের অস্তিত্ব প্রায় নেই। কৃষি এখানে মূলত অসংগঠিত কৃষি, একসঙ্গে দশজনের বেশি শ্রমজীবী কাজ করেন এধরনের জোত এদেশে প্রায় নেই। কৃষি কর্মসূচি নির্ধারণ প্রসঙ্গে এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে বিষয়টির তাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব।

জোতের বিন্যাস ও ভূমিসংস্কারের বাস্তবতা

এদেশের কৃষি মূলত অসংগঠিত কৃষি। কিন্তু সে কারণে একথা বলা যাবে না যে এদেশের কৃষিতে বড় জোতের গুরুত্ব নেই। আঞ্চলিক তফাত সত্ত্বেও ভারতের সব রাজ্যেই মালিকানাধীন জোতের বিন্যাসে বিপুল অসাম্য আছে। মালিকানাধীন জমির যা হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে এই অসাম্যের কারণ হলো, মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের হাতে আছে চাষযোগ্য জমির একটা বড় অংশ, এবং এদের পরিবার পিছু মালিকানাধীন জোতের পরিমাণ অন্যদের তুলনায় অনেকটা বেশি। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এজেন্ডায় যে ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি রাখা হয়, সেই কর্মসূচির বাস্তবতা থাকার একটা প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো মালিকানাধীন জোতের বিন্যাসে তীব্র অসাম্যের অস্তিত্ব থাকা, মুষ্টিমেয় কিছু জোতের মালিকের কৃষিজমি পুনর্বণ্টনের মারফত যা দূর করা যায়। বলা বাহুল্য, মালিকানাধীন জোতের বিন্যাসে অসাম্যের অস্তিত্ব থাকাটা বিপ্লবের স্তর গণতান্ত্রিক কিনা, সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে না— জমিতে পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবনও ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু উল্টোদিকে, মালিকানাধীন জোতের বিন্যাসে অসাম্যের মাত্রা যদি কম থাকে, ভূমিসংস্কারের ভিত্তিও থাকে দুর্বল। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিটি আলোচনার জন্য সে কারণেই বিচার করতে হবে মালিকানাধীন জোতের বিন্যাস কী, সে সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

মালিকানাধীন জোতের বিন্যাস সংক্রান্ত সর্বশেষ যা তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, ভারত সরকারের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৯ রাউন্ডের (২০০৩-০৪) ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ তথ্য। প্রথমে দেখা যাক সর্বভারতীয় গড় পরিস্থিতিটি কী রকম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৯তম রাউন্ডের তথ্য অনুসারে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে ১০.০৪ শতাংশ পরিবারের হাতে কোনো জমি-মালিকানাই নেই— এঁদের এমন কি বসতজমিও (homestead) নেই

(অর্থাৎ যে জমিতে তাঁরা বসবাস করেন সে জমির মালিকানাও নেই)। জমি নেই বা থাকলেও বসতজমি ছাড়া অন্য কোনো জমি নেই, গ্রামাঞ্চলে এরকম পরিবারের অনুপাত ৪১.৬৩ শতাংশ। বসত জমিতেও চাষবাস হতে পারে এবং কোনো কোনো রাজ্যে সেটার গুরুত্ব আছে ভালোরকম। কাজেই বসত জমির তথ্য থেকে প্রকৃত ভূমিহীনতা সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যাবে না। দেখতে হবে পরিবারটির মালিকানাধীন জমিতে চাষ হয় কিনা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে, গ্রাম ভারতের ৩১.১২ শতাংশ পরিবারে কোনো চাষবাস নেই (এমনকি তরকারি ফলানোর ব্যবস্থাও নেই এদের বসতজমিতে)। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে তাহলে কত শতাংশ পরিবার চাষের জমির মালিক? শতাংশের বিচারে এটা দাঁড়াবে ৬৮.৮৮ শতাংশ। আগেই বলেছি, জমির মালিকানা নেই, থাকলেও তা আছে কেবলমাত্র এমন বসতজমিতে যাতে কোনো চাষ হয় না, এমন পরিবার হলো মোট গ্রামীণ পরিবারের ৩১.১২ শতাংশ। মালিকানাভিত্তিক জমির বিন্যাস অনুসারে এরা হলো ভারতের ভূমিহীন পরিবার। এদের সবাই কৃষি থেকে জীবিকা অর্জন করেন না; যারা করেন তাদের বলা যেতে পারে ভূমিহীন কৃষিজীবী। ভূমিহীন কৃষিজীবীরা সবাই খেতমজুর নন, এদের একাংশ আবার ভূমিহীন বর্গাদার। বর্গাদারদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগচাষি, কেউ কেউ আবার অন্যের জমি চাষ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কিংবা ফসলের চুক্তিতে— জমিমালিক এক্ষেত্রে চাষের ঝুঁকি বহন করেন না।

জমির মালিকানা যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে মালিকানাধীন জমির পরিমাণগত ব্যবধান আছে। সর্বভারতীয় গড় চিত্রটা এইরকম। গ্রামীণ পরিবারগুলোর ৩১.১২ শতাংশ ভূমিহীন। ২৯.৮২ শতাংশের আছে পরিবার পিছু ০.৪ হেক্টরের (১ হেক্টর = ৭.৫ বিঘা = ২.৫ একর) কম জমি; মোট কৃষি জমির মাত্র ৫.১১ শতাংশ আছে এদের মালিকানায়। ১৮.৯৭ শতাংশ পরিবারের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ০.৪ হেক্টর থেকে ১ হেক্টর; এই ধরনের গ্রামীণ পরিবারের মালিকানায় আছে মোট কৃষিজমির ১৬.৮৯ শতাংশ। ১০.৬৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ১ থেকে ২ হেক্টর; ২০.৪৭ শতাংশ কৃষিজমি আছে এদের মালিকানায়। পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ২ থেকে ৩ হেক্টর, গ্রামভারতে এ ধরনের পরিবারের শতাংশ হলো ৪.২২ শতাংশ; মোট কৃষিজমির ১৩.৯৪ শতাংশ আছে এদের হাতে। জোতের আয়তন ৩ থেকে ৫ হেক্টর, গ্রাম ভারতে ৩.০৬ শতাংশ পরিবার হলো এই ধরনের; এদের হাতে আছে কৃষিজমির ১৬.৫৯ শতাংশ। এদেশের গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১.৬ শতাংশ পরিবার আছে যাদের পারিবারিক জোতের আয়তন ৫ থেকে ১০ হেক্টর; এদের হাতে কিন্তু আছে মোট কৃষিজমির ১৫.২১ শতাংশ। ১০ হেক্টরের ওপর কৃষিজমির মালিকানা আছে, গ্রাম ভারতে এরকম পরিবার হলো মোট গ্রামীণ পরিবারের ০.৫২ শতাংশ; এদের হাতে আছে ভারতের কৃষিজমির ১১.৭৭ শতাংশ।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, পারিবারিক জমির পরিমাণ যাদের পাঁচ হেক্টর বা তার বেশি, ভারতে এরকম পরিবারের মালিকানায় আছে এদেশের কৃষিজমির প্রায় ২৭ শতাংশ, যদিও সংখ্যার বিচারে এরকম পরিবার গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ২.১২ শতাংশ। অন্য দিকে আছে ৪৮.৭৯ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার, যাদের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের কম। এদের হাতে আছে এদেশের কৃষি জমির মাত্র ২২ শতাংশ।

নিঃসন্দেহে এদেশে কৃষিজমির মালিকানার বিন্যাসে বিপুল অসাম্য আছে। এদেশে প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের হয় কোনো জমি নেই, যদি বা থাকে তার পরিমাণ ১ হেক্টরের কম। অন্য দিকে আছে ২.১২ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার, যাদের হাতে পরিবার পিছু পাঁচ হেক্টর বা তারও বেশি আয়তনের জমি। জমি বণ্টনে অসাম্যের তীব্রতা কত, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সেটা মাপা হয় জিনি সংখ্যার (Gini Coefficient) সাহায্যে। এই সংখ্যাটির মান '১' হলে বুঝতে হবে, বণ্টনে আছে চরম অসাম্য; সংখ্যাটির মান '০' হলে বুঝতে হবে বণ্টনে আছে চরম সাম্য। সর্বভারতীয় গড় নিলে মালিকানাধীন জমির বণ্টনে অসাম্য সূচকের মান দাঁড়ায় ০.৭৬। বোঝা যায়, এদেশে জমির বণ্টনে আছে বিপুল অসাম্য।

জমি বণ্টনের অসাম্যে এদেশের রাজ্যগত ছবিটা কেমন? কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা, বাম শাসনের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই তিনটি রাজ্যে, নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুসারে এমন কোনো পরিবার নেই, যে পরিবারের মালিকানাধীন জোতের পরিমাণ ১০ হেক্টরের বেশি। ত্রিপুরাতে এমনকি পাঁচ হেক্টরের ওপর জমি আছে এমন কোনো পরিবারও নমুনা সমীক্ষার তথ্যে পাওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালাতে, ৫ থেকে ১০ হেক্টর পরিমাণ জমি আছে এমন পরিবারের অনুপাতও খুবই কম— যথাক্রমে ০.৯ শতাংশ ও ০.১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ২.২ শতাংশ জমি আছে এদের মালিকানায়, কেরালার এদের হাতে আছে মোট চাষের জমির ৪.৮১ শতাংশ। পশ্চিমে উত্তরাখন্ড এবং দেশের পূর্ব দিকে সিকিম, আসাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডে মালিকানাধীন জোতের আয়তন ১০ হেক্টরের বেশি, এমন কোনো পরিবার নেই। মালিকানাধীন জোতের পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টর, এমন পরিবার অবশ্য আছে নাগাল্যান্ড বাদে এই রাজ্যগুলির সবগুলিতে। উত্তরাখন্ডে এই ধরনের পরিবারের (যাদের হাতে জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টর) হাতে আছে মোট কৃষিজমির ৫.১৭ শতাংশ। সিকিম ও আসামে এই ধরনের

পরিবারের হাতে আছে যথাক্রমে ৫.৮২ ও ৩.৪৯ শতাংশ কৃষিজমি। মণিপুরে অবশ্য এই ধরনের পরিবারের হাতে আছে কৃষিজমির অতি ক্ষুদ্র অংশ (০.২১ শতাংশ)। এই রাজ্যগুলির সবকয়টিতেই কিন্তু ভূমিহীন গ্রামীণ পরিবার আছে। উত্তরাখণ্ডে ২১.১৫ শতাংশ, সিকিমে ৩৭.৯৬ শতাংশ (যা সর্বভারতীয় গড়ের অনেকটা ওপরে) গ্রামীণ পরিবার ভূমিহীন। মণিপুরে কিন্তু ভূমিহীন পরিবারের অনুপাত অনেকটাই কম— ১০.৫৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা, এই তিন রাজ্যেও কিন্তু ভূমিহীন পরিবারের অনুপাত সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে বেশি (যথাক্রমে ৩৪.৬৯ শতাংশ, ৩৬.৭৪ শতাংশ এবং ৩৩.২২ শতাংশ)।

রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্র মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ কর্নাটক— বড় জোতের অস্তিত্ব প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে ভারতের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। বড় জোতের অস্তিত্ব প্রবলভাবে বিদ্যমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও। ১০ হেক্টরের বেশি জমি আছে পারিবারিক মালিকানায়, জম্মু-কাশ্মীরে এই ধরনের গ্রামীণ পরিবারের অনুপাত মাত্র ০.২ শতাংশ। এদের হাতে কিন্তু আছে জম্মু-কাশ্মীরের মোট কৃষিজমির ২১.৯৬ শতাংশ। বড় জোতমালিকের দাপট অবশ্য সবচেয়ে বেশি রাজস্থানে। পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ১০ হেক্টরের বেশি জমির, এমন পরিবারগুলির হাতে আছে রাজস্থানের কৃষিজমির ৩২.৫ শতাংশ। পাঞ্জাব হরিয়ানা ও অন্ধ্রে এই ধরনের পরিবারদের হাতে আছে কৃষিজমির যথাক্রমে ১৫.৬৫, ১২.২১ এবং ১৪.২৯ শতাংশ। গুজরাট, অন্ধ্র মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও কর্নাটক রাজ্যে কৃষিজমির ১১ থেকে ১২ শতাংশ আছে এই ধরনের জোতমালিকদের হাতে। এই রাজ্যগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, মালিকানাধীন জোতের একটা বড় অংশ আবার আছে এমন জোতমালিকদের হাতে, যাদের পারিবারিক জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টর। পাঞ্জাবে যেমন কৃষিজমির ২০.৪৮ শতাংশ আছে এই ধরনের জোত মালিকদের হাতে। হরিয়ানায় তুলনীয় অঙ্কটি হলো ২৩.৭২ শতাংশ। কর্নাটকে ১৬.১৩ শতাংশ, গুজরাটে ২৯.৪৭ শতাংশ এবং মধ্যপ্রদেশে ২১.৫৯ শতাংশ জমি আছে এমন মালিকদের হাতে, যাদের পারিবারিক জোতের পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টর। মহারাষ্ট্রে তুলনীয় অঙ্কটি হলো ২২.৭৭ শতাংশ।

রাজস্থান বাদে এই রাজ্যগুলোর সবক'টিতে ভূমিহীন পরিবারের অস্তিত্বও আছে তীব্রভাবে। পাঞ্জাবে ২৯.৫১ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার ভূমিহীন। হরিয়ানায় তুলনীয় অঙ্কটি হলো ২৫.৯৬ শতাংশ। গুজরাটে গ্রামীণ পরিবারের ৩৫.৩৭ শতাংশ ভূমিহীন, মহারাষ্ট্রে এদের গুরুত্ব আরও বেশি, ৩৮.২৭ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতের তথ্য হলো: কর্নাটকে ৩০.৭৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের হাতে কোনো কৃষিজমি নেই। অন্ধ্রে ৪৮.৭৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার ভূমিহীন। ভূমিহীনতার চাপ কিন্তু সবচেয়ে বেশি তামিলনাড়ুতে। এই রাজ্যের ৫৫.৪৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার ভূমিহীন। অথচ এই রাজ্যটিতে ১৩.৪৪ শতাংশ কৃষিজমি আছে মাত্র ০.০২ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের হাতে, যাদের পারিবারিক জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হেক্টর। ১৫.০১ শতাংশ জমি আছে এমন মালিকদের হাতে যাদের পারিবারিক জমির পরিমাণ ৩ থেকে ৫ হেক্টর। জমি বণ্টনের অসাম্যসূচকে (জিনি কোইফিসিয়েন্ট) সবচেয়ে ওপরে এই তামিলনাড়ু, কেন না এখানে ভূমিহীনতার চাপ সবচেয়ে বেশি। তামিলনাড়ুতে অসাম্য সূচকের মান ০.৮৪০১। তুলনামূলকভাবে ভূমিহীন পরিবারের চাপ অনেক কম থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই অসাম্য সূচকের মান তামিলনাড়ুর প্রায় কাছাকাছি (যথাক্রমে ০.৮২২৫ এবং ০.৮০৫৯)। কারণ হলো, এই রাজ্যদুটিতে তামিলনাড়ুর তুলনায় বড় জোতের আধিক্য বেশি। জমি যাদের নেই তাদের সঙ্গে জমি আছে এমন পরিবারের মধ্যেকার অসাম্যর সঙ্গে জমি আছে এমন পরিবারের মধ্যেকার অসাম্য যুক্ত করে তৈরি করা এই অসাম্য সূচকে সে কারণেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অসাম্য সূচক তামিলনাড়ুর কাছাকাছিতে এসেছে। একই কারণে অন্ধ্রের অসাম্য সূচকও (০.৮০৭২) তামিলনাড়ুর কাছাকাছি। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীনতার চাপ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চেয়ে বেশি (৩৪.৬৯ শতাংশ) হওয়া সত্ত্বেও, এই রাজ্যটিতে জমি বণ্টনের অসাম্য সূচকের মান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চেয়ে কম (০.৭৩৬১)।

মালিকানাধীন জোতের বিন্যাসে রাজ্যগত তফাত থাকার বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে এদেশের কমিউনিস্ট কৃষি-কর্মসূচি। ভূমি সংস্কার মারফত মালিকানাধীন জমির পুনর্বিন্যাস যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির অস্তিত্ব বজায় রেখেই করা হয়— গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যে কাজটা করা হয়ে থাকে— তাহলে এই পুনর্বণ্টনের রাজ্যগত তফাত থাকবে বিপুলভাবে। মণিপুরে মালিকানাধীন জমির উর্ধ্বসীমা ১ হেক্টরে বেঁধে দিলে বণ্টনের জন্য পাওয়া যাবে কৃষিজমির (বড় জোর) ৩৮ শতাংশ। অন্যদিকে মালিকানাধীন জমির উর্ধ্বসীমা ১ হেক্টরে বেঁধে দিলে পুনর্বণ্টনের জন্য পাঞ্জাবে পাওয়া যাবে কৃষিজমির প্রায় ৯০ শতাংশ। কৃষি কর্মসূচি প্রণয়নের সময় মালিকানাধীন জমির বণ্টনে এই রাজ্যগত অসাম্যর বিষয়টি তাই গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, 'পুনর্বণ্টন করার মতো যথেষ্ট জমি নেই' এই যুক্তিতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচিকে বাতিল করা যাবে না এদেশে। মালিকানাধীন জমির উর্ধ্বসীমা নিরূপণে রাজ্যগত ভিন্নতার বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। কিন্তু মালিকানাধীন জমির বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্য থেকে এ কথা কোনোক্রমেই বলা যাবে না যে, বিলি করার

মতো যথেষ্ট জমি নেই কাজেই ভূমি সংস্কার করা যাবে না এদেশে। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভূমি সংস্কার কর্মসূচিতে জমি পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে মালিকানাধীন জমির ঊর্ধ্বসীমার রাজ্যগত তফাত থাকবে। কোথাও তা দাঁড়াবে ০.৪ হেক্টর, কোথাও হয়ত ১ হেক্টরে বাঁধা যাবে। কিন্তু জমির পুনর্বণ্টন আর করা যাবে না, কোনো রাজ্যের প্রেক্ষিতেই এ সিদ্ধান্ত করতে হবে না। ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক অবশ্য থাকতেই পারে। কেউ এই তাত্ত্বিক বিতর্ক করতেই পারেন যে এদেশে কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য উৎপাদন সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাতে ভূমিহীন কৃষককে জমি-মালিক করার স্তরটি থাকবে না। কিন্তু বিলি করার মতো জমি নেই, কাজেই কৃষককে জমি-মালিক করা যাবে না— এ বক্তব্য কখনই তথ্যনিষ্ঠ নয়, বিস্তৃত তথ্যের সাহায্যে এটাই আমরা দেখাতে চেয়েছি। মালিকানাধীন জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইনে রাজ্যগত ভিন্নতা থাকতেই পারে; কিন্তু জমির পুনর্বণ্টন মারফত ভূমিহীন কৃষককে জমি মালিকানা দেবার কর্মসূচি এদেশে অচল— মালিকানাধীন জমির রাজ্যগত বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্য তা প্রমাণ করে না।

ছোট জোতে চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তবতা

এই পর্যায়ে প্রশ্ন তোলা যায় যে পুনর্বণ্টন মারফত চাষের জমির আয়তন যদি ক্ষুদ্র হতে পারে তাহলে কৃষি উৎপাদন মার খাবে কিনা। কথাটার তাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। বিপ্লবী ভূমিসংস্কার মারফত জমির পুনর্বণ্টন ঘটালে জোতের আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, এতে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু পরিবর্তিত উৎপাদন সম্পর্কে একর প্রতি বা বিঘা প্রতি উৎপাদন কমে যেতে পারে, কারণ ছোট জোতের চাষ অদক্ষ চাষ। উৎপাদনের শক্তির বিকাশের গতি বৃদ্ধির বদলে এর ফলে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এদেশের কৃষিতে। বিপ্লবী কৃষি-কর্মসূচির লক্ষ্য যদি এই রকম হয় যে উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন মারফত তা কৃষির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাবে, ভূমি সংস্কার মারফত ক্ষুদ্র জোত সৃষ্টি ক'রে সে লক্ষ্য পূরণ করা যাবে না। ভূমিহীনকে জমির মালিক করার জন্য জোতের আয়তন ক্ষুদ্র করার মধ্য দিয়ে আসলে যা হবে সেটা হলো উল্টো যাত্রা। কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ব্যাহত হবে এর ফলে।

এই ধরনের বক্তব্যের পিছনে যে ধারণাটা কাজ করে তা হলো ছোট জোতে চাষ বড় জোতে চাষের তুলনায় অদক্ষ। কথাটার অর্থ হলো, বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতে একর বা বিঘা প্রতি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।

খরচ বেশি পড়ার অর্থনৈতিক কারণ যা ভাবা হয় তা হলো, একলপ্তে অনেকটা জমি চাষ করলে উৎপাদনের উপকরণগুলির ব্যবহারে অনেকটা সাশ্রয় করা যায়, ছোট জোতে চাষ করলে যে সুবিধাটা পাওয়া যায় না। ভূমি সংস্কারে যেহেতু জমির খণ্ডীকরণ বাড়বে, সংস্কার-উত্তর কৃষিটি দাঁড়াবে ক্ষুদ্র জোতের কৃষি। এই কৃষিতে চাষের খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি পড়বে। ফলত উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত কৃষি অর্থনীতির অদক্ষতা বাড়িয়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ মন্থর করে তুলবে।

ছোট জোতের চাষ কি বড় জোতের তুলনায় অদক্ষ চাষ? এদেশে শুধু নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই ভূমি সংস্কার কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি বারবার উঠে এসেছে। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে, উপনিবেশ-উত্তর যুগের উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যখন ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ার কথা ওঠে, তখন এই বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। ক্ষেত্র সমীক্ষা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত কথাটা এরকম দাঁড়ায় যে, এসব দেশে ছোট জোতের চাষ অদক্ষ চাষ নয়, বরং একটা স্তর পর্যন্ত জোতের সাইজ কমলে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে। জোতের সাইজ কতদূর কমালে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রবণতা বজায় থাকবে, সেটা অবশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে, জোতের সাইজের একটা সর্বনিম্ন মাপ থাকে, যে পর্যন্ত জোতের খণ্ডীকরণ উৎপাদন দক্ষতা বাড়ায়। তার নিচে নামলে, অর্থাৎ তার তুলনায় আরও বেশি খণ্ডীকরণ ঘটালে উৎপাদন দক্ষতা কমে। ভূমি সংস্কার করে বড় জোত ভেঙে দেওয়া যায়, তাতে উৎপাদনের দক্ষতা হানির বদলে দক্ষতা বৃদ্ধিই ঘটবে। তবে মনে রাখা দরকার, এই ধরনের খণ্ডীকরণকে একটা স্তরের নিচে নামতে দেওয়া যায় না, তাতে কৃষি উৎপাদনের বিকাশ ব্যাহত হবে। এ কথার তাৎপর্য হলো, যথেচ্ছ ভূমি সংস্কার করা যায় না, এতে জমির খণ্ডীভবন ঘটে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে। যে সময় জোতের সাইজ ও উৎপাদন দক্ষতা সংক্রান্ত বিতর্কটিতে ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে একটা নিষ্পত্তি আনা হয়, তখন কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি আসে নি। সে সময় ভারতের ক্ষেত্রে জোতের এই উৎপাদন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট নিম্ন সীমাটি বাঁধা হয় ১ হেক্টরে। এদেশে বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার জোতের গড় আয়তন নিঃসন্দেহে ১ হেক্টরের নিচে নামিয়ে আনবে, কেননা ৩১.১২ শতাংশ যে ভূমিহীন পরিবার আছে, তার একটা বড় অংশকে ভূমিসংস্কার মারফত জমির মালিকানা প্রদান করতে হবে (সবাইকে নয়, কেননা গ্রামীণ ভূমিহীনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর কৃষিজীবী নন)। কিছু কিছু রাজ্যে এই ভূমি সংস্কার জোতের গড় আয়তেনকে ১ একর (০.৪ হেক্টর) বা তারও নিচে নামিয়ে আনতে পারে। এই জোতগুলি কি শেষপর্যন্ত অদক্ষ জোতে পরিণত হয়ে কৃষির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে না? আজ যাঁরা ভূমি সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করবেন, এই প্রশ্নটার উত্তর তাঁদের খুঁজতে হবে।

কৃষির উৎপাদন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক যে সব তথ্য আছে তাতে এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় যে জোতের সাইজের সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতার সম্পর্ক সংক্রান্ত সাবেক ধারণাটি পুনর্বিচার করার প্রয়োজন আছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ভূমি সংস্কারের পর গণচীনের কৃষি অর্থনীতি পরিণত হয় ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতিতে। এই কৃষিতে প্রথমে সমবায় এবং তার কমিউন গড়ে যৌথ চাষের ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন পরে এই ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে চীনে আবার ব্যক্তি বা পারিবারিক দায়িত্বাধীন চাষের প্রথা ফিরিয়ে আনা হয়। এর ফলে সেখানে আবার গড়ে ওঠে একটি ক্ষুদ্র জোতের কৃষি অর্থনীতি (পরিবার চাষের অধিকার পায়, জমির মালিকানাস্বত্ব অবশ্য পরিবারে ন্যস্ত করা হয় না)। এই ক্ষুদ্র জোতের অর্থনীতিতে জোতের গড় আয়তন দাঁড়ায় ০.৬ হেক্টর। ০.৬ হেক্টর জমিতে যে চাষ, চীনের কৃষক নিজ উদ্যোগে যা করে থাকে, তাতে কেমন ফসল উৎপন্ন হয়? তথ্য অনুসারে, এই জমিতে চাষ করে চীনে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন করা হয় ৬৫৫৬ কেজি, গম ফলানো হয় হেক্টরে ৪৭৬২ কেজি। ভারতে জোতের গড় আয়তন ১.২১ হেক্টর। ভারতে হেক্টর প্রতি গম ফলে ২৮০২ কেজি, ধান ফলে ৩৩৭০ কেজি। ক্ষুদ্রতর জোত অধ্যুষিত গণচীনে গড় উৎপাদন ভারতের তুলনায় বেশি (তথ্যসূত্র: FAO; দ্রষ্টব্য: FAOSTAT,২০১০)। অনুমান করা যায়, বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার মারফত ভারতে জোতের গড় আয়তন যদি গণচীনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, তাহলে এদেশে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে, এটা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। এদেশে কৃষিতে উৎপাদন যে কম হয়, তার কারণ এই নয় যে এদেশের কৃষিতে জোতের আকার ক্ষুদ্র। জোতের আয়তন আরও ক্ষুদ্র হলেও উৎপাদন দক্ষতা কমবে না, বরং তা বাড়বে। বস্তুত, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৯ রাউন্ডের ৪৯৭ নং রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে এটা অনুমান করা যায় যে কৃষিতে অন্য কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়াই, স্রেফ আইন করে জমির ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে জোতের গড় আয়তন যদি ০.৪ হেক্টরে নামিয়ে আনা হয় তাহলে, অন্য কোনো অতিরিক্ত সহায়তা ব্যতিরেকেই, এদেশের কৃষিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে যাবে। ঐ রিপোর্টে হিসেব করে দেখানো হয়েছে, জোতের গড় আয়তন যাদের ০.৪ হেক্টর তাদের জমিতে হেক্টর প্রতি যা ফসল ফলে (২০০৪-০৫ সালের হিসাবে) তার অর্থমূল্য ২৫,১৭৩ টাকা। জোতের গড় আয়তন যাদের ১.২ হেক্টর, তাদের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের অর্থমূল্য ১৮,৯২১ টাকা। জোতের গড় আয়তন আরও বেশি হলে গড় উৎপাদন আরও কম হয়। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Ramesh Chand and others: Farm Size andProductivity, EPW, June 25, 2011)

এর কারণ কী সে নিয়ে গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে, এর মূল কারণ হলো, একখণ্ড জমি যাঁর জীবনের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন, সে কৃষক চাষের নিবিড়তা বাড়ান, শ্রম প্রয়োগে অনেক বেশি যত্নবান হন এবং চাষে নজরদারি (monitoring) করেন অনেক বেশি মাত্রায়। যদি এঁরা ঠিকমতো এবং পরিমাণমতো চাষের উপকরণ জুটিয়ে আনতে পারেন, উপকরণের ব্যবহারে এঁরা হবেন অনেক বেশি মিতব্যয়ী, উপকরণগুলির ব্যবহারে নিজ শ্রমের যে ভূমিকা থাকে, সে ভূমিকা পালনে এঁদের গাফিলতি থাকবে না— কারণ এঁদের বাঁচতে হয় ঐ ভূমিখণ্ডেই যতটা সম্ভব কম খরচে যতটা সম্ভব বেশি ফসল ফলিয়ে। ক্ষুদ্র চাষ এ কারণেই বড় জোতের চাষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনকুশল। বস্তুত, জীবিকার অন্যান্য পথগুলো যেখানে যথেষ্ট মসৃণ নয়, দারিদ্র্য পীড়িত অনুন্নত সেইসব দেশে ক্ষুদ্র চাষ অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনকুশলই হবার কথা।

ভূমিসংস্কার, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষি কর্মসূচি

ভারতের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক (নয়া গণতান্ত্রিক), এ বিতর্ক যাঁরা করেন, তাঁরা (সঠিক কারণেই) নিজেদের বক্তব্যটি পেশ করেন মার্কসবাদী আলোচনা কাঠামো অনুসরণ করে। মার্কসবাদী আলোচনা কাঠামো অনুসরণ করলে কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করতে হয় সর্বাগ্রে। আর সেই লক্ষণগুলির নিরিখে আলোচ্য দেশটিতে পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রা কতটা, স্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এই স্তর নির্ণয়ের প্রাসঙ্গিকতা কী, সেটা অ্যাকাডেমিক আলোচনায় অস্পষ্ট থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ নিয়ে অবশ্যই নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখতে হয়, কারণ সে বক্তব্য থেকেই আসে নির্দিষ্ট কর্মসূচি ও নির্দিষ্ট শ্লোগান— যার ভিত্তিতে কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার কথা ভাবা হয়। কৃষিতে পুঁজিবাদ প্রাধান্যের অবস্থানে এসে গেছে, এ বক্তব্য যাঁরা ঠিক মনে করেন, কৃষি নিয়ে তাঁদের স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্য থাকে কৃষি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো— বিপ্লবের পর কৃষিতে আনা হবে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, উৎপাদন সংগঠিত হবে বড় মাত্রায় (scale), কৃষক সেখানে কাজ করবেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রমজীবী হিসেবে। অন্য দিকে, যাঁরা মনে করেন কৃষিতে পর্যাপ্ত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি, প্রাক-পুঁজিবাদ (সামন্ততন্ত্র) প্রাধান্যে থেকে গেছে, তাঁদের কৃষি কর্মসূচি হলো সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানোর কর্মসূচি। সামন্ততন্ত্রে অবসান ঘটানো হবে জমির পুনর্বণ্টন মারফত, প্রকৃত কৃষক জমির মালিক হবেন এই বিপ্লবের ফলে। মালিকানার চরিত্র হবে পুঁজিবাদী, কৃষকের থাকবে জমি কেনাবেচার অধিকার (অর্থাৎ পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনা আদায়ের অধিকার)। এই বিপ্লব

যে জন্য (বুর্জোয়া) গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে, এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হয়ে যাবে। অঙ্গ হয়ে যাবার লক্ষণ হলো— জমির মালিক হয়ে যাবার পর একটা পর্যায়ে কৃষকের চাষ পরিণত হবে সমবায় চাষে, যা শেষ পর্যন্ত যৌথ চাষে (কমিউন) রূপান্তরিত হবে— বড় জোতে যৌথ চাষ হবে এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সমবায় চাষ থেকে যৌথ চাষে উত্তরণের পর্বে মালিকানার ব্যক্তিগত চরিত্রেরও অবসান হবে, জমি কেনাবেচার বাজার অবলুপ্ত হবে, জমি থেকে পুঁজিবাদী ভূমিখাজনা আদায় করার বিষয়টাও অবান্তর হয়ে যাবে। মালিকানার অন্য যা লক্ষণ— জমির ওপর উত্তরাধিকার-স্বত্ব— সেটাও থাকবে না এই অবস্থায় এসে। এগুলি অবশ্য ঘটবে ধাপে ধাপে। ধাপগুলো পরিস্থিতি বিশেষে দ্রুত অতিক্রম করা যায়। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, কোন ধাপটাই বাদ দেওয়া যায় না।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোতে যদি আমরা রুশ বিপ্লবের কৃষি কর্মসূচির মূল্যায়ন করি, তাহলে কী শিক্ষা আমরা নিতে পারি? রুশ বিপ্লবের স্তরটি এই অর্থে ছিল সমাজতান্ত্রিক যে কেরেনস্কি সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জারতন্ত্রের অবসান হয়ে ইতিমধ্যেই সেখানে বুর্জোয়ার হাতে রাজনৈতির ক্ষমতা চলে এসেছিল এবং বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের লড়াইটা করে রুশ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইটা সেখানে যখন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হচ্ছে, বুর্জোয়া সংস্কারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ— মুজিক কৃষকদের হাতে জমি-মালিকানা দেবার কাজটা তখনও ছিল অসম্পূর্ণ। কুলাকদের জমি থেকে জমি-মালিকানা সরিয়ে এনে কৃষকদের হাতে আইনসিদ্ধ উপায়ে জমি-মালিকানা অর্পণ করার কাজটি কেরেনস্কি বুর্জোয়া সরকার করতে চায়নি, বরং এই সরকার কুলাকদের সাথে একজোট হয়ে মুজিক চাষিদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করছিল। এই অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যুদ্ধটির চরিত্র সমাজতান্ত্রিক হলেও, এই যুদ্ধে গ্রাম-রাশিয়ার জন্য এই কর্মসূচি সঠিক ছিল যে জমির মালিকানা যাবে মুজিক চাষিদের কাছে (Land to the Tiller)। লেনিন যদিও রাশিয়ার সরকারি তথ্য ঘেঁটে এই কথাটা প্রমাণ করেছিলেন যে রাশিয়ার কৃষিতে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ প্রাধান্যে এসে গেছে, কর্মসূচি প্রণয়নের সময় তিনি এটা ভাবেন নি যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা অবসানের কর্মসূচিই হবে বলশেভিকদের কৃষি কর্মসূচি। তিনি নিয়েছিলেন সমাজবিপ্লবীদের (SR) কর্মসূচি— কুলাকদের জমি দখল করে তা মুজিক চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার কর্মসূচি। কেন এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো? উত্তরটা এই রকম যে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যে বুর্জোয়া সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তার দায়িত্ব ছিল বুর্জোয়া ভূমি সংস্কারের; তাদের বকেয়া কাজটা করতে হয়েছিল কমিউনিস্টদের। কমিউনিস্টরা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা অবসানের কাজটা করে তার পরের পর্যায়ে।

লক্ষ্যণীয় যে, এভাবে দেখলে রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের মধ্যেকার কৃষি কর্মসূচিতে সারের দিক থেকে কোনো তফাত পাওয়া যাবে না। দু জায়গাতেই কৃষিতে যা করা হয়েছিল তা হলো গণতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রশ্ন উঠবে, এবং সঙ্গত কারণেই উঠবে, রাশিয়ায় যদি ইতিমধ্যেই কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে পুঁজিবাদ প্রাধান্যে চলে এসে থাকে, তবে সেই কৃষিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার স্তরটা থেকে যায় কী করে? রাশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রা নিয়ে লেনিনের যা মূল্যায়ন, সেটা কি তাহলে ভুল ছিল?

বর্তমান লেখকের মতে, সমস্যাটা পুঁজিবাদী বিকাশের মাত্রা নির্ণয় থেকে আসে না। কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ সংক্রান্ত বিতর্কে যে বিষয়টা অনালোচিত থাকে, সমস্যার উৎস আছে সেখানেই। পুঁজিবাদী বিকাশ যদি কৃষিকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবীদের ব্যক্তিগতভাবে জমি-মালিকে রূপান্তরিত করার বাস্তবতা থাকে না, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর, একমাত্র সে ক্ষেত্রেই কৃষকের ব্যক্তিমালিকানায় জমি ফিরিয়ে দেওয়ার কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হয়। যত দিন সেটা হবে না, ততদিন বুর্জোয়া বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ হিসেবে কৃষককে জমির মালিক করার কাজটা থেকেই যাবে। অর্থাৎ শুধু পুঁজিবাদী কৃষি নয়, একটা বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী কৃষি, যেখানে কৃষির উৎপাদন সংগঠিত হয় বৃহদায়তন শিল্পের মতো বড় মাত্রায়, একমাত্র সেখানেই বুর্জোয়া বিপ্লবের অঙ্গ হিসেবে যে কৃষি বিপ্লবের কথা ভাবা হয়, তার প্রাসঙ্গিকতার অবসান ঘটে। রাশিয়াতে যদি প্রাক-রুশবিপ্লব যুগে কুলাকদের নেতৃত্বে বৃহৎ জোতে পুঁজিবাদী চাষ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতো, মার্কিন কৃষিতে বা কানাডার কৃষিতে যা গড়ে উঠেছে, তা হলে সম্ভবত 'Land to the Tiller'-এর কর্মসূচিকে পাশ কাটিয়েই বলশেভিকরা সে দেশে যৌথ খামার বা রাষ্ট্রীয় খামার গড়ার কর্মসূচি নিয়ে ১৯১৭-এ ক্ষমতা দখল করতে পারত। রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজটা থেকে গিয়েছিল, বলশেভিকদের সে কাজটা সাঙ্গ করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। থেকে যাবার কারণটা এই নয় যে সেখানের কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। থেকে যাবার কারণটা এই যে প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় কৃষিতে পুঁজিবাদের পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটা সত্ত্বেও সেখানে ভূমিসংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা থেকে গিয়েছিল।

কৃষি কর্মসূচি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, এই বিষয়টি তাঁদের গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ভারতীয় কৃষি হলো সবুজবিপ্লব ঘটে যাওয়া ভারতের কৃষি। এই কৃষিতে বাজার-অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে বিপুলভাবে। জমির বাজার, পুঁজির বাজার, সার-কীটনাশকের বাজার, শ্রমের বাজার এবং ফসলের বাজার— সবগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে এদেশে। নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি চালু হবার পর এই কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কর্তৃত্ব যে আরও প্রসারিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতৎসত্ত্বেও ভারতের কৃষিতে এখনও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা এই কারণে থেকে গেছে যে এই অর্থনীতিতে এখনও ভূমি সংস্কারের প্রাসঙ্গিকতা আছে, ভূমিসংস্কার সম্ভব, এবং ভূমি সংস্কার হলে কৃষির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ রুদ্ধ হবে না, বরং তা আরও প্রসারিত হবে।

এই কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করা দরকার। ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ কতটা ঘটেছে? সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব আছে কি এই কৃষিতে? পুঁজিবাদের বুনিয়াদি লক্ষ্য হলো শ্রম (শ্রমশক্তি) কেনাবেচার বাজার তৈরি হওয়া, যে বাজারে শ্রমশক্তির মালিক স্বাধীনভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে পারবে। কৃষিতে এই শ্রমশক্তির বাজার তৈরি হয়েছে বহুদিন আগেই, মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রির ব্যবস্থার অস্তিত্ব এদেশে বহুদিন ধরেই আছে। তবেই এই বাজারটায় প্রাক-পুঁজিবাদের উপাদানের অস্তিত্বও ছিল বিপুলভাবে। বাঁধা শ্রমিক, মাহিন্দর, ঋণজাল আবদ্ধ শ্রমিক ইত্যাদি, অঞ্চলভেদে যা নানা নামে চিহ্নিত হতো, এসবই ছিল এই গোত্রের মজুর। কোথাও কোথাও এর সঙ্গে জুটতো বর্ণভিত্তিক পীড়ন, জাতিভেদ প্রথার সুযোগ নিয়ে যে পীড়ন চালিয়ে যেত গ্রামীণ ক্ষমতাবান জমিমালিকরা। কোথাও কোথাও ছিল 'বন্ডেড লেবার', আইন করে যা তুলে দেবার ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল ভারত রাষ্ট্রকে। সময়ের সাথে সাথে কৃষি মজুরের কাজের বাজারে এই প্রাক-পুঁজিবাদী (সামন্ততান্ত্রিক) উপাদানের গুরুত্ব কমতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার করা যাবে না যে কৃষি মজুরের কাজের বাজারে এখনও সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্ব আছে। একই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা দরকার যে এই সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্বের মাত্রা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন; কোথাও তা বেশি আছে, কোথাও বর্তমানে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু অস্তিত্বের মাত্রা যতটাই হোক না কেন, কৃষিমজুরের কাজের বাজারে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান প্রাধান্যে আছে এমন পরিস্থিতি সম্ভবত ভারতের কোথাও আর নেই। এদেশের কৃষিমজুরের বাজার এখন মূলত স্বাধীন মজুরের বাজার। এই মজুরের কাজের জগতে এখনও সামন্ততান্ত্রিক পীড়নের অস্তিত্ব আছে, তবে সেটার গুরুত্ব কম। প্রাক-পুঁজিবাদী বর্গাদারী প্রথার গুরুত্ব কমেছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেখানেও পুঁজিবাদী চুক্তি প্রথার (ভাগচাষ সহ) গুরুত্ব বাড়ছে। উৎপাদন সম্পর্কে পুঁজিবাদী উপাদান প্রবলতর হয়ে উঠেছে এদেশে।

ফসলের জগতটি বাজার ব্যবস্থার অধীনে এসে গেছে দীর্ঘ দিন আগেই। কোন্ ফসলের বাজার ভালো, কোন্ ফসলের বাজার খারাপ, এসব খবর এখন কৃষকের কাছে থাকে। বাজারের দিকে তাকিয়ে উৎপাদন করা এখন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চুক্তি চাষ বাড়ছে; খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে এই চুক্তি চাষের প্রবণতা বাড়বে। বাজার মন্দা থাকলে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে ফসলের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো এখন এদেশে ধনীকৃষকের রাজনীতির একটা বড় দিক, পঞ্চাশ বছর আগে যে রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল না। বলা যায় যে এদেশের কৃষি উৎপাদন এখন অনেকটাই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির অঙ্গ। কৃষিপণ্যের বিশ্ব বাজারের সঙ্গেও এই অর্থনীতি যুক্ত হয়ে পড়েছে। ফসলের আগাম বাণিজ্য বাড়লে এই বাজার-অর্থনীতি বিশ্ব বাজারের সঙ্গে আরও বেশি করে জুড়ে যাবে। একইভাবে, চাষের যন্ত্রপাতি থেকে জল, সার, কীটনাশক সব কিছুই এখন বাজার ব্যবস্থার অধীন এবং এই বাজারও বিশ্ব বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। সামন্ততান্ত্রিক যুগের কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে এই কৃষি অর্থনীতির মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিছুটা প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক এখনও আছে ঋণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দুর্লভ থাকায় ক্ষুদ্র কৃষককে এখনও মহাজনি ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই মহাজনি ঋণ ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সঙ্গে অর্থনীতি-বহির্ভূত সম্পর্ক রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ ক'রে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের যে অবশেষটুকু গ্রামভারতে এখনও বিদ্যমান তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবশেষটুকু সঙ্গে নিয়েই ভারতের কৃষি অর্থনীতি এখন যে মূলত পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। এই যুক্তিগুলির সারবত্তা স্বীকার না করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই পুঁজিবাদী বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একটি কমিউনিস্ট কৃষি কর্মসূচি প্রণয়ন করার সময়ে পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি হিসেবে এর দুর্বলতা কী সেটা বিচার করাও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটেছে ধীর গতিতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এবং আধাখেঁচড়া সংস্কারের মধ্য দিয়ে। এই রূপান্তর প্রাক-পুঁজিবাদী ভূস্বামীদের একাংশকেই পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে পরিণত করেছে। এরা বড় জোতের মালিক, সামন্ত অবশেষকে সঙ্গে নিয়েই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চলতে এরা পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী কৃষির দুর্বলতা

এই যে, জোতের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে বড় মাপের পুঁজিবাদী চাষ সংগঠিত করার ক্ষমতা নেই এই পুঁজিবাদের নেতৃত্বে থাকা ভূস্বামীবর্গের। এরা এদেশের অসংগঠিত সামন্ততান্ত্রিক কৃষিতেই এনেছে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক। একথা অবশ্য একই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে যে রাষ্ট্র প্রণীত ভূমি সংস্কারের দিশা ও রাষ্ট্র প্রণীত কৃষিনীতিও নানা কারণে সংগঠিত পুঁজিবাদী কৃষি গড়ার পক্ষে অনুকূল ছিল না স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও এদেশের কৃষি-অর্থনীতি হলো মূলত অসংগঠিত কৃষি। এই প্রবন্ধেই আমরা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য উল্লেখ করে দেখিয়েছি, এদেশে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত ২৪.৪৮ কোটি শ্রমজীবীর মধ্যে মাত্র ২৭.৪ লক্ষ কাজ করেন সংগঠিত কৃষিতে। বাকি সবটাই অসংগঠিত কৃষি, যেখানে এক সঙ্গে অল্প কিছু শ্রমজীবী কাজ করেন, কাজের চরিত্রও যেখানে সংগঠিত ক্ষেত্রের মতো নয় (অনিয়মিত কাজ, চুক্তির কাজ, বেতন-ভাতা নেই, ছুটি-পেনশন নেই)। ভূস্বামী নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি ভবিষ্যতে কোনো এক সময় সংগঠিত পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবে, এ সম্ভাবনাও নেই। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আধাখেঁচড়া সংস্কারের মধ্যে গড়ে ওঠা এই ভূস্বামীবর্গ যতটা পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে এই দেশের কৃষিতে, সেটাও ঘটেছে সরকারি সাহায্য ও অনুদানের ওপর নির্ভর ক'রে। এদেশের কৃষিতে সবুজবিপ্লব কেন্দ্রিক পুঁজিবাদের বিকাশের গোটা ইতিহাসটাই এই ধরনের। নিজস্ব ক্ষমতায় আরও বিকশিত হয়ে এই কৃষি স্বাবলম্বী হবার পথে যায়নি। এই অবস্থায় আবার এই কৃষির ওপর নেমেছে নয়া উদারবাদী সংস্কারের আক্রমণ। নয়া উদারবাদ শক্তিশালী করে তোলার বদলে আরও বিপন্ন করে তুলেছে এই ভূস্বামীকুলকে। এই অবস্থায় এই ভূস্বামী নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদ এদেশের কৃষিকে সংগঠিত কৃষিতে রূপান্তরিত করবে, এই সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে।

অসংগঠিত পুঁজিবাদী কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকা শ্রমজীবীদের যাঁরা একটি বিপ্লবী কৃষি কর্মসূচির সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করতে চান, তাঁদেরকেও একথা মনে রাখতে হবে যে এই শ্রমজীবীরা এমন কোনো সংগঠিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নন, যেখানে তাঁরা উৎপাদন সম্পর্কের এমন বিপ্লবী পরিবর্তন করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবেন, যেখানে বিপ্লব-উত্তর উৎপাদনক্ষেত্রে কৃষি জমির মালিকানার চরিত্র হবে সামাজিক মালিকানা। বড় মাত্রার উৎপাদনে (যথা আধুনিক শিল্প) যে শ্রমজীবীরা কাজ করেন তাঁদের মানসিকতায় উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে ব্যক্তি মালিকানার কথা কখনেই থাকে না, কেননা সেটা যে অসম্ভব এ ধারণা তাঁদের ভালোমতোই থাকে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে, বিশেষত অসংগঠিত কৃষির ক্ষেত্রে মালিকানার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্ভাবনা কিন্তু কখনোই নাকচ হয় না, এই কারণেই তা নাকচ হয় না যে ব্যক্তি মালিকানায় এই উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষত কৃষি ক্ষেত্রে যেহেতু ক্ষুদ্র মাত্রার চাষ সমান রকমের উৎপাদনকুশল, উৎপাদনের উপকরণের খণ্ডীকরণ সম্ভব— মানসিক জগতে অসংগঠিত কৃষির সঙ্গে যুক্ত এই শ্রমজীবীদের এ বাসনা থেকেই যায় যে ভূস্বামীর জমি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তারাও উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারবে— কারখানা ভাগ করে যা করা যায় না। যদি এই ভূস্বামী-কৃষি বড় মাত্রায় কেন্দ্রীভূত কৃষিতে পরিণত হতো, শ্রমজীবী যেখানে কারখানা-শ্রমিকের মতো কাজ করে, তবে এই পশ্চাৎপদ চেতনা থাকত না, পুঁজিবাদী কৃষি সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারত সমাজতান্ত্রিক কৃষিতে।

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বললে এই কথাগুলোর তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, কৃষিতে অসংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে, সেই পুঁজিবাদ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি— ভূমি সংস্কারের কর্মসূচিকে— নাকচ করে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ এই সমাজেও থেকে যায়। কর্মসূচি রূপায়ণের সময় এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। কৃষিতে পুঁজিবাদের পর্যাপ্ত বিকাশ সত্ত্বেও প্রাক-বিপ্লব রাশিয়াতে যেমন ভূমি সংস্কারের কর্মসূচির বাস্তবতা থেকে গিয়েছিল, কুলাকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদের বাস্তবতা সত্ত্বেও যেমন সে দেশে মুজিক চাষিদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়াটা বলশেভিক কর্মসূচির অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলে, সামন্ত অবশেষ সঙ্গে নিয়ে ভূস্বামী নেতৃত্বে গড়া ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রেও বিপ্লবী কৃষি কর্মসূচির প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হিসেবে থাকবে ভূমি সংস্কার মারফত কৃষিজমির পুনর্বণ্টন।

এই ধরনের পুনর্বণ্টনের বাস্তবতা যে আছে, এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে তা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। একটি বাস্তবতাসম্পন্ন কৃষি কর্মসূচিতে এই ভূমি সংস্কারে ভারতবর্ষের রাজ্যগত পরিস্থিতিগুলি অবশ্যই আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু সে বিবেচনা সীমিত থাকবে কেবলমাত্র পারিবারিক জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আলোচনায়। এই কৃষি সংস্কার যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় হবে না, সেটাও আমরা আলোচনা করেছি। এই ভূমি সংস্কার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি হলেও সেটা শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অঙ্গ হয়ে যাবে, কৃষি জমি শেষ পর্যন্ত সামাজিক মালিকানায় চলে আসবে। প্রক্রিয়াটি কত দ্রুত বা কত বিলম্বিত হবে সেটা অবশ্য নির্ভর করবে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর।

গল্প

সায়েব ও লোকটা

অমর মিত্র

জঙ্গল তুমি কতটা চেন, গাছগাছালি, শিকড়বাকড়?

ভুলেই গেছি স্যার।

জংলীদের কতটা চেন?

চিনতাম স্যার, এখন আর মনে নেই। বলল সে।

জংলী মানে ট্রাইব, আদিবাসী। সায়েব-বাবুরা তাই বলতে অভ্যস্ত। সে নিজেও তাই। তার নাম চৈতন মুর্মু। চৈতন্য থেকে চৈতন তা বোঝা যায়। এই নাম কতকাল আগে পাওয়া, কত কতদিন আগের কথা মনে পড়ে এখন। মনে হয় কত যুগ। গাঁ থেকে সে পাকাপাকি চলে এসেছে বছর পাঁচ আগে। না এসে উপায় ছিল না। এত ধরপাকড়। মেয়েমানুষও বাদ গেল না। সে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল টাটা। তখন পুলিশ ছিল না, বন্দুক বাহিনী ছিল। পুলিশ বাহিনী ঢুকতে পারত না বনের ভিতরে ভিতরে গাঁগুলিতে। ছিল তারা। পাহাড় থেকে নেমে, বন থেকে বেরিয়ে তাদের গাঁয়ে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। অন্ন নিয়ে আসত প্রথম প্রথম, যাদের পেটে ভাত ছিল না তারা বলল, রহো, তোমাদের পাঠিয়েছে মারাংবুরু, পাহাড় থেকে তো এলে। তোমাদের পাঠিয়েছে বনদেবতি, বন থেকে তো এলে।

কী দিন গেছে তখন। তারপর সে টাটা গেল বন্দুকের ভয়ে। এখন অবশ্য ওই বন্দুক পিস্তলই তাকে বাঁচাচ্ছে। না ধরতে জানলে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ হত না।

টাটা থেকে সে ক'দিনের জন্য ফিরেছিল মকরে। আর পুলিশ মিলিটারিও তাক করে ছিল, মকরে গাঁ উজার করবে। পরবে সব ঢিলেঢালা থাকে। সব চেয়ে বড় পরব তো। গাঁ ছেড়ে যারা উগ্রপন্থী হয়েছে, তারাও ফিরতে পারে। পরব বলে কথা। পরবে জংলীদের গাঁ নেশা খেয়ে উল্টে থাকে। তখন পটাপট মারাও যাবে মশা মাছির মতো। জংলী গাঁয়ে দুর্গাপুজো নেই। তাদের এই পরবই সব। দুর্গাপুজো শহরে গঞ্জে গঞ্জে। ছমাস আগে থেকে মানুষকে দিন গুণতে হয় কবে আসবে মা, অসুর বধ করবে এসে। তারা নাকি অসুরের বংশ। এমনিই শুনেছিল সে গাঁয়ে আসা বাইরের মানুষের মুখে। দিনে বন্দুক ধরার ট্রেনিং, রাতে এই সব কথা। তাই তাদের পরব আলাদা। তাদের পরবে শহরের জুলুস নেই। শহরের জুলুস থাকবে কী করে, জঙ্গল আর শহর কি এক হল? তবু পরব তো। নতুন জামাকাপড়, নতুন ধানে নবান্ন, পিঠেপুলি, মাংস মিঠাই, নাচ গান— শীতের রাত ভোর। যাত্রা বায়োস্কোপ, ভাড়া করে ভিডিও— সব। সেই পরব তছনছ করে দিল। টুসু ভাসানোও হল না। পরবের আগের দিন পুলিশ বাহিনী ঢুকল। কাঁথা-কানি নিয়ে সব বনে লুকোল। তার মা বুড়ি আর বুড়ো বাপ বন অবধি পৌঁছতে পারেনি, তুলে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দিল। এখনো জেলে। সেও থাকত। মারাংবুরু বড় সহায়। গ্রাম দেবতি সহায়। বনের গাছগাছালি সহায়। মকরঠাকুর সহায়। মকরঠাকুর আছে কিনা সে জানে না। তবে সংক্রান্তিটা তো মকরের। সে অনেক কিছুই জানে না। জানতে বুক ছমছম করে।

কাজ ছেড়ে টাটা থেকে পালিয়ে এসেছিল সে। ওখেনে বারবার থানায় ডাকত। বলেছিল সপ্তাহে একবার থানায় হাজিরা দিতে। তার নাম চৈতন মুর্মু। আদিবাসী তো, জংলী তো। জংলী—আদিবাসী বলেই সন্দেহ। তারপর সে এসেছে ভিন প্রদেশ থেকে। পুলিশ খোঁজ করছিল। একদিন সকাল থেকে সন্ধে অবধি জেরা করেছিল। তারপরই সে পালায়। লেদ কারখানার আর এক 'লেবার' সুরেন বলেছিল তার আগে একজন ঢুকেছিল, যতন বাস্কে, তাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে।

কেন সে কী করেছিল?

কী করেছিল তা পুলিশ জানে, পুলিশ বানিয়ে দিয়েছিল সব কাহিনী।

তোমরা জান না?

না।

পরে সুরেন বলেছিল, কিছু পায়নি বলেই সন্দেহ বেশি হয়েছিল, শেষে ঢুকিয়ে নিল জেলে, চার্জ দিল অনেক।

সুরেনের সঙ্গে তার কথা হত রাতে। শেষের কথা শুনে চৈতন ভয় পেয়েছিল। সুরেন ছিল বহড়াগোড়ার লোক। বহড়াগোড়া থেকে ঝাড়খন্ড আরম্ভ বলা যায়। আবার উল্টে বলা যায় বাংলা আরম্ভ হল ওখান থেকেই, পুবে চলে গেল, আরো নামালে চলে গেল। এদিকওদিক সব জঙ্গল মহল। কোথাও জঙ্গল গভীর, কোথাও তা হাল্কা হয়ে গেছে গাছ কেটে কেটে। তাদের পায়রাকুলি গাঁয়ের ধারেই বন। দূরে সিংভূমের পাহাড়, উত্তর পশ্চিমে কানাইশোর পাহাড়। বছর বছর আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় শনিবারে মারাংবুরু বড় পাহাড়ের পুজো হয় সেই পাহাড়ের অনেকটা উপরে গুহায়। নিচে মেলা। ক'বছর ধরে সে মেলার জুলুস নেই। সেখেনেও পুলিশ আর বন্দুক বাহিনী। তাদের খুঁজতে এসে পুলিশ তার বুড়ো মা বাবাকে তুলে নিয়ে গেছে। গাঁয়ের বউ লক্ষ্মীকে সার্চ করেছিল নাঙ্গা করে। একটা বন্দুকধারী তার কাপড় খুলেছিল, অন্যরা দেখেছিল। আসলে সে কতটা মেয়েমানুষ তা দেখে নিতে চাইছিল। এরপর সেই লক্ষ্মী গলায় দড়ি দেয়। চৈতন এসব ভাবছিল। সায়েব জিজ্ঞেস করল,

তুমি কতদিন চলে এসেছ?

অনেকদিন সার।

তুমি কি জান, আমি আমাদের কোম্পানির নতুন প্রজেক্ট দেখতে যাচ্ছি, পাবলিক বলছে পাহাড় ভাঙতে দেবে না, কিন্তু ওদিকের পাহাড়ে কপার, তামা মিলেছে, পাহাড় নিয়ে কোম্পানি বড় শহর বসাবে শিগগির।

আমি জানি না সার।

বিশটা গ্রাম নিয়ে নেব আমরা, একেবারে খালি করিয়ে দেব।

আমি কিছুই জানি না সার।

এই সায়েব লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা শহরে। শহর লাগোয়া গাঁয়ে নতুন প্রকল্প। শহরে আসার পথে কিছুটা জঙ্গল দেখেছিল সে। তারপর নাঙা ডাহি, ঘাসও নেই। বড় বড় গহ্বর, মোরাম মাটিও চলে গেছে শহরে। বড় বড় দীঘি ভরাট করতে লাগে। সায়েব বসেছে পিছনে। সামনে সে। তার পাশে ড্রাইভার। সে সায়েবের দেহরক্ষী। সিকিউরিটি এজেন্সি করে দিয়েছে কাজটা। মাসে মাসে সেই জন্য কিছু টাকা কাটা পড়ে তার বেতন থেকে। এজেন্সি পায়।

সায়েব বলল, খুব মন দিয়ে কাজ করবে।

ইয়েস সার।

বন্দুক চালাতে পার?

না পারলে এই কাজ কি হত?

কবে শিখলে?

কোম্পানি শিখিয়েছে। কথাটা বলে একটু কেঁপে গেল। সে জানত। তাকে শিখতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। না শিখলে তারা তাকে শেষ করে দিত। রীতিমতো ট্রেনিং ক্যাম্প করে তারা সকলকে বন্দুক হাতে তুলে নিতে বলেছিল। বন্দুকই সমস্ত অবিচারের অবসান ঘটাবে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। গরিবের যুদ্ধ শেষ হয় না। তাতে গরিবকেও মারতে হয়, কিন্তু সে মরণ গরিবের ভালর জন্য। সে পালিয়েছিল টাটানগর। তারপর ফিরেছিল সেই বছরখানেক বাদে মকর পরবে। এর ভিতরে কী হয়েছে জানে না। পরবের আগের দিন এল যৌথবাহিনী। আবার পালিয়ে সে টাটা গেল না। টাটা গেলে পুলিশ তাকে ঢুকিয়ে দিত জেলখানায়। সুরেন বলেছিল বারবার জেরায় কিছু না পেলে পুলিশ মনে করে তাহলে সে বড় কেউ। বড় কিছু করে এসেছে। জেরায় পেয়ে গেলে পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়, না পেলে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে দশ-বিশরকম ধারা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখে। জামিন অযোগ্য। তারপর এদিক ওদিক করে কলকাতা শহর, এজেন্সি। মা বাবা জেলখানার ভাত পাচ্ছে। ভগ্নিপতি তাই। বোনের খোঁজই নেই। কোন জেলখানায় কে আছে তা সে জানে না। চৈতন বলল, সার, আমার কিছু মনে নেই। কথাটা বলে চৈতন টের পেল, সে ভুল কথা বলল, তার মনে আছে কী না এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি। স্যার জিজ্ঞেস করছিলেন, সে কবে শিখল বন্দুক চালানো। সুরেন তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, কথায় কথায় বলবি জানি না সার, মনে নেই সার, ছেলেবেলায় নামালে ফেলে গিয়েছিল মা বাপ... একটা গল্প তাকে বলে দিয়েছিল বহড়াগোড়ার সুরেন। গল্পটা সুরেনের। সুরেন ভাসতে ভাসতে টাটা গিয়ে পড়েছিল, তাকে বহড়াগোড়ায় ফেলে গিয়েছিল তার মা। বাবা ছিল না। মা আর একজনের সঙ্গে ভেগেছিল ধান রোয়ার কাজে গিয়ে মনে রং এলে। সুরেনের তখন বছর সাত, বাবুরা রেখে দিয়েছিল তাকে বাগাল করে।

কী মনে নেই?

মায়ের কথা।

মার কথা কি জিজ্ঞেস করেছি?

তাহলে কী জিজ্ঞেস করলেন সার।

সায়েব বললেন, কবে শিখলি বন্দুক চালানো?

কোম্পানি জানে।

তুই জানিস না?

আমার সব মনে থাকে না সার।

এত যদি ভুলে যাস, কাজ করবি কী করে?

চৈতন চুপ করে থাকলো। গাড়ি পৌঁছে গেল বন পাহাড়ের ছায়া ফেলা শহরটিতে। সন্ধ্যা হয়ে এল। চৈতনের চোখে পড়ল দূর বহুদূরের সাঁওতাল পরগণার নীল পাহাড় জেগে আছে দিগন্তে। আলো ফুরোলে ওরাও মুছে যাবে। রাস্তার দুধারে রুক্ষ অহল্যাভূমি। পাথর পাথর। সায়েব বললেন, বন কেটে নিয়েছে?

চৈতন বলল, মনে নেই সার।

কী মনে নেই।

মা আমায় ফেলে চলে গেল।

কোথায় গেল?

জানি না সার, কেউ নিয়ে গেল মাকে।

বাংলোয় প্রবেশ করল গাড়ি। ঘণ্টা দেড় বাদে সায়েব তাকে ডাকলেন। সায়েবের হাতে রঙিন পানীয়র গ্লাস। এসব ব্যবস্থা ড্রাইভার করে। বাংলোর চৌকিদারকে দিয়ে সব আনিয়ে নিয়ে সায়েবের আরামের ব্যবস্থা করে চৌকিদারের বউকে রান্নার নির্দেশ দিচ্ছে। বউটির বয়স কম। চৌকিদারের বউ এতখানি ঘোমটা দিয়ে আছে। ঘোমটা নামাতে পারেনি ড্রাইভার। আর আগুনের সামনে বসে আছে বউটা। ভাত ফুটছে, মাংস মাখছে সে তেল হলুদে। সায়েবের রান্না শেষ হতে হতে চৌকিদার ফিরে আসবে গাঁ থেকে কাউকে নিয়ে। ফেরেশ— চৌকিদার বলে, শাক সব্জি মাছ মাংস, সব এখেনে ফেরেশ, গাঁর মেয়েছেলেও তেমন।

সায়েব বললেন, চৈতন বস, না না মেঝেয় না, সোফায়।

চৈতন মেঝেয় বসল। কী ঠাণ্ডা মেঝে। সাদা মার্বেল পাথরে

বাঁধানো। সায়েব বললেন, তোদের মহুয়া আমি খেয়েছি, তুই জানিস কী করে মহুয়া ফল থেকে লিকার করে?

চৈতন বলল, জানতাম।

এখন ভুলে গেছিস?

হাঁ সার।

তোর কি মনে আছে?

চৈতন চুপ করে থাকল। সে বুঝতে পারছে তাকে জেরাই করছে তার সায়েব। যা জিজ্ঞেস করছে টাটাতে পুলিশও ঠিক সেই কথা জিজ্ঞেস করত। চৈতন তার কোমরে হাত রাখে। অস্ত্রটি কী ঠাণ্ডা! সায়েব তা দেখেছে, বলল, চলে আসবে, আমি খবর দিয়েছি, তোর ওতে কিছু নেই, ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিলাম, একটা ট্রাইবালের হাতে লোডেড পিস্তল রাখা ঠিক না, রাতে সবাই ঘুমবে।

চৈতন বলল, আমি আবার লোড করেছি সার, ড্রাইভার চৌকিদারের বউ-এর ঘোমটা নামাচ্ছে এখন, কিন্তু রাত কাবার করেও পারবে না।

সায়েব ধীরে ধীরে হুইস্কি সিপ করছেন। বাইরে অরণ্য পাহাড়ের অন্ধকার। বললেন, তুই কে তা আমি টের পেয়েছি, কিন্তু তোর চোখ বলছে আমাকে তুই মারতে পারবি না, আমি শুধু তোর সম্বন্ধে জানতে চাইছি।

চৈতন পিস্তলটা রাখল মেঝেয়, বলল, আমি আবার পালাব।

আমাকে মারবি না? সায়েব জিজ্ঞাসা করল ভয় ভয় গলায়।

কুকড়া মারতেও পারি না সার, রক্তে ভয় করে।

জংলীর রক্তে ভয়! রক্ত কি খায় না ট্রাইবালরা, সায়েব হা হা করে হাসলেন, না মেরে পালাবি!

জংলী অমনি পালায়, ভয় করছে সার পালাই।

খবর চলে গেছে, কোথায় পালাবি?

চৈতন বলল, অন্ধকারে, আমি অন্ধকারে দেখতে পাই, জংলী অন্ধকারে লুকোতে লুকোতে বাঁচে, পালাই সার।

সায়েব বলল, এবার ধরা পড়ে যাবি।

চৈতন নিঃশব্দে হাসল, বলল, অন্ধকারে ফিরে যাব, অন্ধকার থেকে এসেছিলাম সার।

সায়েব চৈতনকে দেখতে থাকেন। খবর করা হয়ে গেছে। বাহিনী নিয়ে আসছে এসপি। এখন কথায় কথায় আটকে রাখতে হবে ছেলেটিকে। ও বলছে, কিছুই মনে নেই। ওর সব মনে আছে। সব। কী করে জমিজমা পাহাড় পর্বত, অরণ্য— যা ছিল ওর, ওর পিতৃপুরুষের, তা চলে গেল। চলে গেল মারাংবুরু বড় পাহাড়, বনের দেবতা— সব মনে আছে ওর। মনে থাকাটাই অপরাধ। ও সত্য বলছে না। ওকে সব ভুলিয়ে দেওয়া দরকার। বাহিনী আসছে। আটকে রাখো কথায় কথায়। এসপি বলেছে, নিকেশ করে দেবে ফেক এনকাউন্টারে।

গল্প

কবিতার ছুটির দিনগুলো

মীনাক্ষী সেন

তড়িৎ বললো— রাঘুদা, আপনি যে নবনীতের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন, কাজটা ঠিক হলো?

রাঘু মুখার্জী একটু চমকে উঠে সামলে নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন— তোমাকে কে বললো একথা?

তড়িৎ আবৃত্তি করা লোক, তার গলাও জলদগম্ভীর, উপরন্তু সেখানে স্বরের ওঠাপড়া আছে। তড়িৎও জলদমন্দ্রে বললো— এসব কথা কি চাপা থাকে?

রাঘু একটু ভেবে বললেন— আমি দিইনি। ওরা কালেক্ট করেছে। কিন্তু মিনু মিত্রের মোকাবিলা তো তোমার রবীন্দ্র কবিতা দিয়ে হবেনা, তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তো লাগবে।

—এটা কি পার্টি অনুমোদন করে? নেতৃত্ব?

—কেন করবে না? আমরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে রয়েছি। পার্লামেন্ট দখল একটা কৌশলগত লড়াই। আসল বিপ্লব তো সশস্ত্র হতেই পারে।

—তাহলে সবার হাতে অস্ত্র তুলে দিন। পার্টি সদস্যদের হাতে অস্ত্র দিন। নবনীত তো পার্টি সদস্যও নয় বোধ হয়। ওর হাতে, ছোট্ট একটা গ্রুপের হাতে, অস্ত্র তুলে দিয়ে আপনি ওরা যেমন মিনু মিত্র বানিয়েছে, পার্টির নামে পার্টি বর্হিভূত মাস্তানবাহিনী, তেমনই একটা মাস্তানবাহিনী বানাতে চাইছেন কেন?

রাঘু উত্তর খুঁজে না পেয়ে চটে গেল।

—দেখো তড়িৎ, সব সময় তত্ত্ব কপচানো তোমার স্বভাব, বাস্তবটা বোঝ, এখন যদি তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দিই— তুমি অস্ত্র হাতে নেবে কি? অস্ত্রের নাম শুনলেই তোমার শরীরে ঘামাঘামা দেয়। তুমি তো পার্টি ছেড়ে যে পালাবে, আর ধারেপাশে আসবে না পার্টির। সবার হাতে কি অস্ত্র দেওয়া যায়? অস্ত্র যারা ব্যবহার করতে পারে, তাদের হাতেই অস্ত্র দেওয়া যায়।

—আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না রাঘুদা। পার্টি যদি সশস্ত্র সংগ্রামে নামে, তার মিলিটারি উইং তৈরি হবে— ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে আপনি একটা ভালো ছেলেকে মাস্তান বানাচ্ছেন। ওর অপরাধ ও সাহসী। ভয়ডর নেই। আপনি সেটার মিসইউজ করছেন। আপনি ওর কাছে গডফাদারের মত, ওকে বিপথে চালিত করবেন না—

তড়িৎ উঠে পড়লো, এলাকায় তড়িৎ জনপ্রিয়। কবিতা আবৃত্তি করে। ফাংশন অর্গানাইজ করে। নতুন নতুন ছেলেদের নীহার সরকারের 'কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন' পড়তে দেয়। তবে সে পার্টি সদস্য নয়, সমর্থক। রাঘুর মতে সে পার্টি পাবলিক নয়, ক্লাব পাবলিক। তরুণদের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা না থাকলে রাঘু ওকে পাত্তাই দিত না। ওর এত জ্ঞানও শুনত না। এখন শুনতে হলো। এমন সময় পাঁচু এসে রাঘুকে বললো— রাঘুদা, মিনু মিত্ররা পরশু চাঁদ মিঞাকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল— চাঁদ মিঞার জমির দিকে রিফুজিরা ছুটছে, জবর দখল করবে।

—ফ্যান্টাসটিক।

রাঘু উল্লসিত হলো।

—নবনীতকে খবর দাও। সে যেন কিছু না করে, কেবল ধারে পাশে থাকে। মিনু মিত্র অ্যাটাক করলে ও কাউন্টার অ্যাটাক করবে। নইলে চুপ করে থাকবে। রিফুজিরা জমি দখল করে নিক।

—কিন্তু রাঘুদা ওগুলোও তো আছে হারামি। ওরা এক, দুই, তিন নম্বর কলোনির জমি দখল করে বাড়িঘর বানিয়েছে, তারপর চাঁদ মিঞার জমির দখল নিতে ছুটেছে।

—চুপ, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। যা হচ্ছে তা হতে দাও।

রাঘু মুখার্জী আত্মতৃপ্ত হয়ে আরাম কেদারায় পিঠ এলালেন। একেই বলে 'স্বখাত সলিল'। মিনু মিত্র এতদিনে স্বখাত সলিলে ডুবছে। এতদিন সে গুন্ডারাজ কায়েম করে রেখেছে। রেললাইনের ওপারে বনেদি বাসিন্দারা তো রিফিউজি আতঙ্কে ভোগে— তারা ভাবে মিনু মিত্র ওদের রক্ষক। কিন্তু এপারে রিফুউজিরা তো মিনু মিত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। কেবল রিফুউজিরা কেন, ওই যে মধুরিমা রায়ের মেয়েটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, রাত করে বাড়ি ফিরছিল— শুনেছেন তো মিনু মিত্রের লোকেরা তাকে—

মহিলা অবশ্য মুখ খোলেনা। কেবল মেয়েটার পড়া বন্ধ। মধুরিমা রায়ের মুখে আর হাসি দেখে না কেউ। মোট কথা, মিনু মিত্রর বাহিনী যে কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে! আর খুন? মানুষ খুন তো মিনুর কাছে পিঁপড়ে মারা— এই তো সেদিন সেলুনে দাড়ি কামাচ্ছিল মীরার কাকা নবেন্দু। মিনু মিত্র ঢুকে ক্ষুর চালিয়ে তার মাথা মাটিতে ফেলে বললো— এঃ, ভুল হয়ে গেল, এ যে অন্য লোক। মুখে সাবান থাকায় বুঝিনি—

মিনু মিত্রর এমন আরও কত খুন আর গুন্ডামির কাহিনী। ওর চ্যালা তিনফুট কেষ্টা তো সবিতার স্কুলের সামনে বসে রোজ দিদিমনি আর মেয়েদের অশ্লীল কথা বলে—

সবিতা রাঘুর বউ, বউ-এর অপমান ভাবতে রাঘুর মাথা গরম হলো কিন্তু কিছু করার ছিলনা। সব হারিয়ে আসা রিফিউজিরা জবরদখল করা জমি আর ঘরটুকু আঁকড়ে বাঁচতে চায়— কোনও ঝুট ঝামেলায় যেতে চায় না। চুপ করে মিনুর

গুন্ডামি সহ্য করে। ঘেন্না করে মিনুকে, কিন্তু প্রতিবাদ না— এখন নবনীত স্টেনগান মিনুর চেয়ে ভাল চালায়— পেটোবাজিতে মিনুর চ্যালাদের ফেলে দেবে নবনীতের চ্যালারা। এসব দেখে লোকে তো একটু মনে বল পায়। তড়িৎ-রা হলো তাত্ত্বিক। বাস্তব বোঝে না। নীতি আদর্শের কচকচানিই ওদের সম্বল।

আবার তড়িতের কথা মনে করে বিরক্ত হলো রাঘু। তারপর ভাবলো— ভাগ্যিস পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধটা লাগলো। মিনু মিত্র সংখ্যালঘুদের এলাকা-ছাড়া করতে মাঠে নেমে পড়লো যেন ওরাই পাকিস্তানি।

যেমন ওদের পার্টি, রিঅ্যাকনারি থটস্, তেমনই ওদের গুন্ডারা। সংখ্যালঘুদের কৃষিজমি, বাড়িঘর, বসতজমি মিনু কি করে দখল করে নেবে? পূর্ব পাকিস্তান থেকে সব ফেলে আসা রিফিউজিদের মনে জমির খিদা দাউদাউ করে জ্বলছে। জমি পড়ে আছে, তাও সংখ্যালঘুদের ফেলে যাওয়া, শুনলেই ওরা লাঠি হাতে জমি-বাড়ি জবরদখল করতে ছুটছে। জমির খিদা জবর খিদা। এতদিন শত চেষ্টাতেও যাদের মাঠে নামানো যায়নি— জমির নামে আজ তারা লাঠি হাতে মাঠে। নবনীত কেবল ওদের প্রটেকশন দেবে, ব্যস, এলাকা এই রাঘু মুখার্জীর হাতে।

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে রাঘু নিজের বুক নিজে বাজিয়ে দিলো।

এখন আমাদের আন্দোলনের দাবি হবে— রিফিউজিদের জমির পাট্টা দিতে হবে। জবরদখল জমি বলা চলবে না। ওরাই জমির মালিক।

ভেতরে চলুক নবনীতের খেলা। মিনু মিত্র অচিরেই হটে যাবে এলাকা থেকে। সামনে ইলেকশন। রাঘু মুখার্জীর জয় কেউ আটকাতে পারবে না।

—ভাবা যায় না! কিছুদিন, মানে কয়েক বছর আগেও নেহরু বলেছিলেন— অ্যাম আই টু মেক দি অপজিশন ইটসেল্‌ফ?

আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে চলেছি, আমি স্পষ্ট দেখছি, হ্যাঁ, আমিও জিতবো। মিনু মিত্রের গুন্ডারাজ খতম করে আমি জিতবো।

নবনীত। তার সাহস, তার জঙ্গিপনা, অথচ নিখুঁত চরিত্রবল, কতবড় অ্যাসেট তা ওই তড়িৎ কী বুঝবে— নবনীতকে ও কবিতা আবৃত্তি শেখাতে চায়... শালা বুরবক তাত্ত্বিক। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে না নিলে কখনো জেতা যায়?

পাঁচু বললো— যাই তবে রাঘুদা—

—হ্যাঁ যা, নবনীতকে বলবি আননেসেসারি কোনো ভায়োলেন্স নয়। কেবল রিফিউজিদের সাহস জোগাবে।

—মিনুর দলবল অ্যাটাক করতে এলে ওরা থাকবে রিফিউজিদের পাশে এইটুকু। জানিস না তো তোদের হাতে কটা অস্ত্র এসেছে বলে কত লোকের মাথা গরম।

—কার রামুদা?

পাঁচু চলে যেতে গিয়েও দাঁড়ালো।

—ওই যে প্রফেসর বাড়ির তাত্ত্বিক তড়িৎ।

—ও, তরি-দা।

পাঁচুর মুখের রেখা কোমল হলো। বোঝা গেল, তড়িৎ সম্পর্কে তারও যথেষ্ট দুর্বলতা।

—ও তরি দা অমন বলে। কিন্তু জেনুইন লোক।

পাঁচু চলে গেল।

(২)

নবনীত রাঘু মুখার্জীর পাশে এক চেয়ারে মাথা নীচু করে বসেছিলো। রাঘুর ভেতর ভেতর রাগ হচ্ছিলো। তিনি এলাকার উড-বি এমএলএ, হয়তো মন্ত্রীও হবেন। একটা মাস্তান তার পাশে পায়ে পা তুলে বসে আছে যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ। নবনীত বললো— কাকু, কাল ভাবছি কেষ্টাকে যতীনদাসের সামনে থেকে উঠিয়ে দেব। আর টলারেট করা যায় না।

—কেন? নতুন কিছু করেছে?

—নতুন আর কি? রোজই তো কোমরে দুটো ড্যাগার ঝুলিয়ে স্কুলের সামনে বসে মেয়েদের ভয় দেখায়। তাড়া করে, ওর কাছে তো এটা একটা খেলা, ফুর্তি। গতকাল একটা মেয়ে তাড়া খেয়ে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে।

—ও হ্যাঁ, সবিতা কাল বলেছিল বটে! কিন্তু এমন ডিরেক্ট অ্যাটাক করতে গেলে ওরাও সরাসরি নামতে পারে, তোমরা অত বড় ধাক্কা সামলাতে পারবে? আর ইউ রেডি?

—হ্যাঁ কাকু। আপনি একটুও ভাববেন না। রিফিউজিদের তাড়া খেয়ে কলাবাগান, বড় মাঠ অঞ্চলে তো ওরা আর আসেই না, ঐ যতীন দাস স্কুল পর্যন্ত, কিন্তু অনেক অপমান করেছে ওরা মেয়েদের, আর আমরা মানব না।

—বেশ। আমি বিকেল পর্যন্ত ভাবি। তুমি ততক্ষণ প্ল্যান করে নাও।

—হ্যাঁ কাকু। আসলে মেয়েরা যারা ট্রেনে যায় আসে কলকাতা, তারা তো এতদিন রাত হলেই ভয়ে কাঁপত। কত মেয়ের কত সর্বনাশও তো করেছে, আপনি জানেন! কী করবে, পেটের দায়ে মেয়েদের তো যেতে হয় চাকরি বাকরি করতে। জান-মান হাতে করে আতঙ্কের মধ্যেই ওরা এতদিন গেছে এসেছে, লাইনের কাছ থেকে কেষ্টাকে হটিয়ে দিলে এ দিকটা সেফ হয়ে যায় মেয়েদের জন্য—

—ঠিক আছে। তবে এ বিষয়টাই প্রচারে রাখতে হবে, যে মেয়েদের সেফটির জন্যই আমরা কেষ্টাকে... নাহলে তো তড়িতের মতো বুকিশরা... লোকের কাছে বলে বেড়ায় ফর মাই ওন ইন্টারেস্ট আমি তোমায় ইউজ করছি—

—কে তরিদা? না, না, তরিদা কেষ্টাকে তাড়ালে খুব খুশি হবে—

রাঘু দেখলেন নবনীতের মুখের রেখাও তড়িতের নামে কোমল। দেখে রাগ হল রাঘুর। তড়িতের নেহাৎ আবৃত্তি আর নাটক করা ছাড়া কোন উচ্চাকাbখা নেই, নাহলে জনপ্রিয়তায় রাঘুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারত।

রাগ করে রাঘু হাসলো, হেসে বললো— তড়িৎ কি তোমাকে আবৃত্তি শেখাচ্ছে নাকি? কার কবিতা? নজরুল, সুকান্ত, না রবীন্দ্রনাথ?

নবনীতের মুখে অপূর্ব এক আলো ফুটে উঠলো। লাজুক হেসে নবনীত বললো— না, না, আবৃত্তি আমি পারি না, তবে বলেছেন, ঝামেলা টামেলা কমে গেলে একটা নাটক নামাবেন, সেখানে আমাকে একটা বড় রোল করতে হবে।

রাঘুর এত হাসি পেল। তড়িৎ সত্যিই অদ্ভুতকর্মা। কল্পনাবিলাসী। নাহলে নবনীতের মত স্টেনগান চালনা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে নাটক নামানোর কথা ভাবতে পারত না। একেই বোধহয় নজরুল বলেছেন 'তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি-চাঁছা'। নজরুলের কবিতার লাইন মনে পড়তেই রাঘুর মনে পড়লো ছবি আঁকা, বিশেষত স্কেচের হাত তার খুব ভালো। তড়িতের প্রফেসর দাদা সরিৎ তাকে অনেক বই-এ ডায়াগ্রাম আঁকার কাজ এনে দিত— নিজের বইতেও ডায়াগ্রাম আঁকিয়েছে রাঘুকে দিয়েই। রাঘুর হঠাৎ মন খারাপ লাগলো। জীবনটা যদি ছবি এঁকে হেসে খেলে চলে যেত তো ভালই হত, কিন্তু মিনু মিত্ররা এমন হতে দেয় কই? তাছাড়া এই রিফিউজি জীবন! তিনিও তো রিফিউজি-ই। পূর্ববাংলা থেকে থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে এই মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের পরিত্যক্ত জমিতে নিজের, মাসতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ও জ্ঞাতিগুষ্ঠি সবাইকে দিয়ে জবরদখল করিয়ে তবে তো বসলেন এখানে। তারপর জীবিকার সন্ধান। সবিতা বিএ পাশ না হলে, স্কুলে চাকরি না পেলে, না খেয়ে মরতে হতো। পরক্ষণেই মনে পড়লো দীর্ঘকায়, টকটকে ফর্সা ব্যক্তিত্বশালী বাবাকে। পূর্ববাংলার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর ছিলেন। দাপুটে, রাশভারী। অনুভব করেন, সেই ব্যক্তিত্ব তার নেই। স্বভাবে অনেকটাই তিনি হালকা, কিন্তু রাজনীতি করার আকাbখা পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। না হলে নিজেও একটা কিছু চাকরিবাকরি করে সবিতার সঙ্গে শান্ত জীবন কাটাতে পারতেন। রাঘু মুখার্জী কিছু একটা ভাবনায় ডুবে আছে দেখে নবনীত আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রাঘু চটকা ভেঙ্গে ডাক দিলেন, নবনীত কাছে এলে চাপা গলায় বললেন—

—ওদিকে তোমার কিছু আমদানি হচ্ছে তো?

নবনীতের মুখে কিছু একটা অস্বস্তি, অপরাধবোধ ও বিড়ম্বনার ছবি ফুটে উঠলো। সে তার উঁচু মাথা নীচু করে বললো—

—হ্যাঁ, ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি লাইনে আর ওরা যায় না তো। তবে এখান থেকে দমদম জংশন, দক্ষিণেশ্বর লাইনে এখনও ওরা আছে।

—হবে, আস্তে আস্তে সবই তোমার হবে। ধৈর্য্য ধরতে হবে। কিন্তু রসদের যোগাড় না থাকলে এত বড় কাজ তো চালিয়ে যেতে পারবেনা। বাই দি ওয়ে, তোমার বাড়িটা পাকা করতে শুরু করেছো তো?

—হ্যাঁ কাকু।

নবনীত মাথা নীচু করে বললো।

—আচ্ছা এসো এখন।

নবনীত চলে যেতেই সবিতা চা নিয়ে ঢুকলেন।

—নবনীত চলে গেল?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি ওর জন্য চা এনেছিলে নাকি?

সবিতা মাথা নাড়লেন— হ্যাঁ।

—অত আস্কারা দিও না, বেসিকালি তো—

—না দিয়ে উপায় কি?

সবিতা মুচকি হাসলেন।

—মানে?

বলে কি ভেবে রাঘু সোজা হয়ে বসলেন।

—ওতো আমাকে রাঘুদা বলতো সুবু, হঠাৎ কাকু বলছে?

—ঠিকঠাক সম্বোধন করতে চাইছে।

—মানে?

—মানে বুঝছ না? যে ঢলানি তোমার ভাইঝি। এখন তো নবনীতের নামে চলে যেতে ঢলে পড়ছে, চিটে-চিনি ভেদ করতে পারছে না।

রাঘু মুখার্জ্জীর মুখ ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠলো।

—হোয়াট?

রাঘু উঠে পায়চারি শুরু করলেন। রাঘু সন্তানহীন। সবিতার সন্তানধারণের বয়সও চলে গেছে। সেজন্য কোনো আপশোষ নেই রাঘুর— বরং তার রাজনীতিতে মন দেওয়া এজন্য সহজ হয়েছে মনে হয়। কিন্তু ভাইঝি ডলি আর স্ত্রী সবিতা তার জীবনের দুটি কোমল বন্ধন। সবিতা আবার ডলিকে তত পছন্দ করেনা। কিন্তু স্নেহ বড়ো বিষম বস্তু। তা মনে একবার জেগে উঠলে তাড়ানো মুস্কিল। রাঘু ডলিকে ভালবাসেন।

—একটা গুন্ডাই তো, খুনিও, তার সাথে! ওর কি ব্রেন খারাপ? ডলির? মুখার্জী বংশের মেয়ে ও, ভুলে গেছে? তাঁর গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠলো।

—আহা। এখন থাক না। কিচ্ছু বলো না এখন।

সবিতা হঠাৎ রহস্যময় গলায় বললো।

রাঘু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সবিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তবে বুঝলেন সবিতা কী বলতে চাইছেন।

—ওঃ।

রাঘু আবার আরাম কেদারায় বসে পড়লেন।

(৩)

রণাঙ্গন এখন শান্ত।

কেবল রুমি তাদের তাদের পুকুরঘাটে উবু হয়ে বসে ঘষে ঘষে একটা জামা পরিষ্কার করছে।

পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। তড়িৎও সেই ভীড়ে আছে। একটু বাদে জানালায় রুমির মায়ের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা দিলো, তিনি ডাকলেন— ওখানে কী করছো রুমি? ঘরে এসো বলছি।

—হ্যাঁ মা, এই যাই—

বলে রুমি জামাটা বার দু-তিন পুকুরের জলে ডুবিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলো।

রক্তের দাগ একবার লাগলে তা পুরোপুরি মোছা কঠিন, হালকা আবছা একটা দাগের মত যেন দেখা যায়। তবে ভালো করে না দেখলে বোঝা যায় না। জামাটা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে।

—ধীমান কাকু, জামাটা কি আপনাকে দেব? শুকাতে হবে তো?

—হ্যাঁ, উঠোনে একটু মেলে দিয়ে ঘরে যাও। তোমার মা ডাকছেন।

ধীমান বললো রুমিকে।

আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত এলাকায় মহারণ হয়ে গেছে। গতকাল কেষ্টাগুন্ডার পেটে ড্যাগার চালিয়েছিল নবনীতের লোকজন।

—এলাকা এখন, রেল লাইনের এপারে নবনীতের দখলে। এখানে আর মিনু মিত্রের গুন্ডামি চলবে না। এটা কেষ্টার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছিলো মিনু মিত্রকে। নবনীতের তাড়া খেয়ে অতবড় গুন্ডা কেষ্টা পকেটের রিভলভার, কোমরের ড্যাগার কিছুই বের করতে পারেনি। দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছিলো ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বেঞ্চির নীচে। ওখান থেকে বের করে এনে নবনীতরা ওর পেটে ড্যাগার চালিয়ে দেয়। কেষ্টা মরেনি, গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে। কেষ্টা মিনু মিত্রের খাস লোক। এর জবাবে মিনু মিত্র আজ কালো মুখোশ পরে, বাইক চড়ে স্টেনগান চালাতে চালাতে ঢুকে পড়েছিল এপারে। নবনীতও ঘাবড়ে যায়নি। সে রেডি ছিলো, দলবল নিয়ে পাল্টা জবাব দেয়। যা নবনীতও ভাবেনি, তা হলো মানুষের সাড়া। হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসে মিনু মিত্রদের তাড়া করে। সামনে মিনু মিত্র ও তার দলবল, তাদের মুখোমুখি নবনীত ও তার দলবল, ওদের পেছনে হাজার মানুষ। মিনুরা বোমা, গ্রেনেড, পেটো, গুলি সবই চালাচ্ছিলো। কিন্তু অত মানুষ, তাও মারমুখো, ওদের সঙ্গে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র সহ নবনীতের দলবল— যারা স্টেনগান বা পেটো চালনায় মিনু মিত্র বাহিনীর চেয়ে কম দক্ষ নয়। হয়তো বা বেশিই।

ফলে একটু পরেই মিনু মিত্র পিছু হটতে শুরু করে। পিছু হটা মানে লাইনের ওপারে মিনু মিত্রদের জন্য নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাওয়া। মিনু মিত্ররা রেল-লাইনের দিকে ছুটেছিলো, পেছনে নবনীতরা ও জনতা।

রেল-লাইনের কাছাকাছি গিয়ে নবনীতরা একটু পেছনে সরে আসে— ওদের অনুমান ছিল ওখানে পুলিশ মোতায়েন থাকতে পারে এবং শাসক দলের খাস লোক মিনু মিত্রের পক্ষেই থাকবে তারা— নবনীতদের কোতল করবে। নবনীতরা পিছিয়ে দাঁড়ালেও যুবক ছেলেরা এগিয়ে যায়। যাদের মধ্যে ছিল ধীমান, বাদলা, পিন্টু এরা। বাদলা দুটো লাইন পার হয়েছে, পেছনে ধীমানরা— হঠাৎ উল্টো লাইনে দ্রুত গতিতে ছুটে আসে ট্রেন। বাদলা ওপাশে একা পড়ে গেলে মিনু মিত্ররা গুলি চালিয়ে ওকে ঝাঁঝরা করে দেয়। ট্রেন চলে গেলে ধীমানরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো। তখন বাদলা মৃত। তারপর রক্ত ধুতে, জল খেতে ওরা তড়িৎদার বাড়ি এসেছিল। তড়িৎদার ভাইঝি রুমিকে দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে জল আনাচ্ছিল। পুকুরে নেমে ধীমানের রক্ত মাখা শার্ট ধুয়ে দিচ্ছিল এগারো বছরের রুমি আর কখনো চোখে না দেখা বাদলার জন্য কান্না পাচ্ছিল তার। রুমি হাঁ করে শুনছিল, ওরা বলছে মিনু মিত্র ওপারে গিয়েও নিরাপদ হতে পারেনি, ওদিকেও বেশির ভাগ লোক এখন মিনু মিত্রের বিরুদ্ধে। ওরা এখন মিনুকে ঘিরে রেখেছে। মিনু একটা বড় বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে প্রাণ বাঁচাতে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষিপ্ত জনতা।

রাঘু মুখার্জী এ খবরটা পেলেন খানিকটা পরে। তিনি আজ নিজের বাড়িতে না থেকে একই পাড়াতেই ওনার পিসতুতো বোনের বাড়িতে বসেছিলেন— লাইনের এধারে মিনু মিত্র বাহিনীর হানার খবর পেয়ে। লড়াই যখন হারজিত আছেই। যদি মিনু এ যাত্রা জিতে যায় ক্যাজুয়ালটি হবে অনেক। ওনারও নিজের বাড়ীতে থাকা নিরাপদ হবে না বিবেচনায় তিনি পিসতুতো বোনের বাড়িতে এসে বসে ছিলেন। পাড়া ফাঁকা, বাড়ির ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে, লেটেস্ট কী খবর শুনতে। দরকার হলে তারাও এগিয়ে যাবে মিনু মিত্র বিতাড়নে। কাজেই তক্ষুনি তক্ষুনি খবর এনে দেবার কেউ ছিল না। নিজেকে কেমন পরিত্যক্ত আর একা মনে হচ্ছিল রাঘু মুখার্জীর। চারদিকে নবনীতের নামে জয়ধ্বনি। রাঘু মুখার্জী অস্বস্তি আর আশংকায় ভুগছিলেন। তিনি নেতা— লোকে নবনীতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে? তিনি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করে বসলেন নাকি? —এসব সাত-পাঁচ ভাবনা তাকে পীড়িত করছিলো— এমন সময় সবিতা এসে বলল— বাড়িতে তিনবার ফোন করেছেন দুই থানার ওসি। লোকাল এমএলএ। তোমাকে একবার যেতে বলছে— না হলে সিচুয়েশ্যন ট্যাকেল করা যাচ্ছেনা। মিনু মিত্র এক বাড়িতে শেল্টার নিয়েছিলো প্রাণ ভয়ে— হাজার মানুষ সে বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে— ওরা মিনুর

রক্ত চায়— বাদলার বদলা। কিন্তু পুলিশ কী করে তা হতে দেয়? রাঘু তড়িৎ গতিতে উঠে বসলেন।

—এই তো, দারোগা আর অপজিশন এমএলএ জানে তিনিই নেতা। এই সিচুয়েশনকে বাগে আনতে রাঘু মুখার্জী ছাড়া কেউ পারবে না। রাঘু গেঞ্জি আর প্যান্ট পরেছিলেন। তড়িৎগতিতে একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে রওনা দিলেন অকুস্থলের দিকে। রাস্তা থেকে কয়েকজন ছেলেকে ডেকে নিলেন। একেবারে একা যাওয়া ঠিক হবেনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। নবনীত কোম্পানিকে কোথাও দেখলেন না। হাজার হাজার মানুষ, মানুষ আর মানুষ।

—পুলিশ ঘিরে রয়েছে বাড়িটা, জনতার ভিড়ের ভেতর থেকে চাপা অথচ জেদি স্বরে ধ্বনি উঠে আসছে— মিনু মিত্র— মিনু মিত্রকে চাই আমরা। মিনুকে বের করে দাও।

রাঘুকে দেখে জনতা হর্ষধ্বনি উঠে এলো— যেন এবার রাঘু বাবু মিনু মিত্রকে এনে দেবেন জনতার হাতে।

—আমিই নেতা। ওরা জানে।

ভিড়ের হর্ষধ্বনি রাঘুবাবুকে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছিল। তিনি ভীড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে গেলেন বাড়িটার দিকে। জনতা তাকে পথ করে দিলো সরে গিয়ে। রামু ভেতরে ঢুকলেন।

লাইনের দুপারে দুই থানা, দুই ওসি ভুরুতে চিন্তার ভাঁজ ফেলে বসে আছেন। মধ্যে লোকাল এমএলএ, তিনি ঘর্মাক্ত।

—এই যে রাঘুবাবু।

এমএলএ উঠে দাড়ালেন পর্যন্ত রাঘুকে দেখে।

—দেখুন রাঘুবাবু, অবস্থাটা। আপনার পিপল কী আনরুলি। আইন নিজেদের হাতে নিতে চায়। এটা কী করে সম্ভব? আমি কী ভাবে মিনুকে ওদের হতে তুলে দেব?

—জনতার হাতে তুলে না দিন, ওকে অ্যারেস্ট করতে তো পারেন? মিনুর মত হিংস্র ধর্ষক আর খুনিকে তো ছেড়ে রাখা যাবেনা। তাহলে ও কত লোককে খুন করবে আরও— তার ঠিক নেই।

—না, না, ছাড়ার কথা হচ্ছে না। ওকে আমরা তো অ্যারেস্ট করতেই চাই। আপাতত বাদলার হত্যার অভিযোগে। এছাড়া আরও কত অভিযোগ তো আছেই— সাবসিকোয়েন্টলি সেগুলোও চালু হবে। এপারের থানার ওসি তাড়াতাড়ি বললেন। ওনার ওপরই চাপ বেশি। রাঘু মুখার্জী বা তার চ্যালাচামুন্ডা— এখন থেকে ওদের তো ওসিকে ট্যাকল্ করতে হবে।

—এটা আমি মানবো না।

এমএলএ সাহেব টেবিলে ঘুসি দিলেন।

—মিনুকে অ্যারেস্ট করতে হলে নবনীতকেও অ্যারেস্ট করতে হবে। একতরফা বিচার আমি মানবো না।

রাঘু মুখার্জী বললেন— উত্তেজিত হবেন না এমএলএ সাহেব। উত্তেজিত হলে বিপদ আপনাদের বাড়বে বই কমবে না। নবনীত কেন অ্যারেস্ট হবে? ওর অপরাধটা কী?

—অপরাধ? ওয়াগন ব্রেকিং কটা করেছে নবনীত হিসেব আছে আপনার? আর আজকে তো অনেক ক্যজুয়ালটি— মারা না গেলেও এদিকে সিরিয়াস ইনজিওরডের সংখ্যা অনেক।

—তো আপনি ভাবছেন নবনীতকে অ্যারেস্ট করা হবে শুনলে ওই জনতা মেনে নেবে? এই বাড়িঘর, আপনাকে— আমাকে সব্বাইকে উড়িয়ে দেবে।

এমএলএ সাহেব কথার উত্তর না দিয়ে প্রবলভাবে মাথা নাড়াতে থাকলেন অসম্মতির। শেষে রাঘুই কথা বললেন— শুনুন বলছি। এখন আমি সামনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। জনতাকে শান্ত হতে বলছি। আপনারা, ওসি সাহেবরা, মিনু মিত্রকে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে থানায় নিয়ে যান। কাল কোর্টে তুলে দেবেন। জনতার মনোযোগ আমার দিকে থাকবে, আপনাদের অসুবিধা হবেনা।

—কিন্তু নবনীত?

এমএলএ নাছোড়। তার দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্য যে ভেঙ্গেছে তাকে ছাড়তে দিতে পারেন না তিনি।

—আমি কথা দিচ্ছি। নবনীতও অ্যারেস্ট হবে। তবে আজ নয়। কয়েকদিন পরে ওকে সারেন্ডার করিয়ে দেব, ইটস মাই প্রমিস।

(৪)

তড়িৎ তার ঘরে বসে একটা কবিতা পড়ছিলো। দরজার কাছে এসে কেউ দাঁড়ালো, তার দীর্ঘ ছায়া এসে পড়লো মাটির মেঝেতে।

—কে? নবনীত? আরে, কবে ছাড়া পেলি? কেমন আছিস? তড়িৎ উঠে নবনীতকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

—আজই ছুটেছি। জামিন। তুমি তো একদিনও দেখতে গেলেনা তড়িৎদা। ডলি একদিন গেছিলো, আর মা, আর কেউ তোমরা গেলে না। যাবে কেন, আমি তো গুন্ডা! নবনীতের স্বর অভিমানে গাঢ় হয়ে আসে।

—দেখ নবনীত, তুই হয়তো শুনিস নি, তুই যখন জেলে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়েছে। তাতে মার্কসবাদীরা যোগ দিয়েছে। শুনেছিস বোধহয়। মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী ঘুরে গেছেন বাদলার বাড়ি, ওর মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে।

—হ্যাঁ শুনেছি।

—ওই দ্যাখ, আমার ভাইঝি রুমি উঁকি দিয়ে তোকে দেখছে। তুই গুন্ডা হবি কেন, তুই তো হিরো। মিনু মিত্র হটানো তার কালো রাজত্বের অবসান ঘটানো হিরো। কি রে রুমি, বৌদিকে ম্যানেজ করে একটু চা-টা যদি....

—বলছি মাকে, বলে দৌড়ে চলে গেল রুমি। আবার দৌড়ে

ফিরে এসে দরজার বাইরে দাঁড়ালো।

—তবে কি জানিস নবনীত— সব কিছু তো বদলে গেল নকশালবাড়ির ঘটনার পর। আমি তো এখন রাঘুবাবুর চোখে এনিমি। তোকে জেলে দেখতে গেলে আদারওয়াইস নিত।

—এই ঘটনাটাই কিছু বুঝলাম না তরিদা। কমিউনিস্ট তো কমিউনিস্ট, তার আবার ভাগ—

—বাঃ, সিপিআই ভেঙ্গে সিপিএম হয়নি? কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোকে নিয়ে ভাবছি।

—দেখরে নবনীত, বিপ্লব, সশস্ত্র বিপ্লব, সেই পার্টি, তার সংগঠন, তার বিপ্লবী প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা এক ব্যাপার আর অস্ত্র হাতে মারপিট অন্য। তুই আগে বল নবনীত, রাঘু কি তোকে পার্টি সদস্য পদ দিয়েছে? কোন সশস্ত্র ইউনিট বানিয়ে তোকে তার ইনচার্জ করে দিয়েছে? আমি জানি দেয়নি, মিনু মিত্র তার গুন্ডারাজ দিয়ে সবাইকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলো, মিনুকে হটিয়ে তুই এখন সবার, এমনকি রুমিরও হিরো। ওই দেখ কীভাবে তোকে দেখছে উঁকি দিয়ে। কিন্তু এই হিরো নবনীত তোর জায়গা পার্টিতে কোথায়? বল।

—রামু তোর মিলিটারি এফিসিয়েন্সিকে এখন কাজে লাগাবে নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার সুরক্ষিত করার জন্য— আর খুন, ওয়াগন ব্রেকিং করিয়ে তোকে নিকৃষ্ট গুন্ডা বানাবে— মিনু মিত্রকেও তো ওর পার্টির নেতারা এভাবেই গুন্ডা, টেরর বানিয়েছিল!

—বাঃ, ভোলা যে তোমাদের পার্টিতে যোগ দিলো, ভোলা বুঝি ওয়াগন ব্রেকার নয়?

—ভোলা তো তোদেরই দল থেকে গেল। ও রাঘুর লোক নয়, অন্য ফ্রাকশনের, তাই এত রাগ করছিস ভোলার ওপর— দলটা তোদেরই। যেখানে ভোলা এতদিন ছিলো।

—তুমি এখনই তোদেরই দল বলছ তরিদা? এ দল আর তোমার নেই?

—তুইও তো বললি, তোমাদের দল। কিন্তু এখনও আছে বইকি। আমি কোনোও দলে যোগ দিইনি। জানিসই তো আমি ভিতু মানুষ, সব কিছু ওয়াচ করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়া যদি ভুল হয়, তবে নবনীতকে দিয়ে মিনু মিত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ কী ভাবে হয় সেটা আমি বুঝি না।

—বারে, মিনুর রাজত্ব থাকলে—

—খুব খারাপ, কত খারাপ তা নিয়ে তোর আমার কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু যারা আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপ্লবের কথা বলছে, ভূমি ব্যবস্থার বদল চাইছে, তাদের ওপর সরকারের বসেই গুলি চালানোটা ঠিক? তুই তো জানিস, নতুন সরকার গুলি চালিয়ে সাতজনকে মেরেছে নর্থবেঙ্গলের নকশালবাড়িতে?

—তরিদা, এত ভারী ভারী কথা আমি বুঝতে পারিনা। গুলি চালিয়ে মেয়েদের মারা ঠিক হয়নি, আমিও মনে করি। কিন্তু তুমি বলো ভোলা কী করে— তড়িৎ হেসে ফেলল।

—তোর তো মেন কনট্রাডিকশন মনে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ নয়, সামন্তবাদও নয়, ভোলা। দেখ ভোলাকে যদি ওরা লুম্পেন থেকে বিপ্লবীতে কনভার্ট করতে না পারে, ভোলার লুম্পেন মিলিটারি এফিসিয়েন্সির ওপর নির্ভর করে, তবে ওরাও ধসকে যাবে। আমার আশা ওরা ভোলাকে বদলে নেবে। না পারলে ওরাও লুম্পেন পার্টি হয়ে যাবে।

—তুমি বলছ আমিও লুম্পেন?

নবনীত অভিমান ভরা চোখে তড়িতের দিকে তাকায়।

—আমি কী বলছি আর এক দিন শুনিস, আজ শোন আমার ভাইপো কী ভাবে তোকে নিয়ে, রাঘুবাবুকে নিয়ে। আমার ভাইপো কী ব্রিলিয়ান্ট জানিসই তো, সঙ্গে আবার কবি কবি ভাব। ওর কবিতাটি তোকে পড়ে শোনাই—

তড়িৎ বালিশের তলা থেকে একটা খাতা বের করে নবনীতকে কবিতা শোনায়— তার আবৃত্তি করা, সুনিয়ন্ত্রিত স্বর বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে ওঠা পড়া করে—

লড়াই ছাড়া নেইকো গতি
বললে তুমি শুনে এলাম বেশ
বক্তৃতাটা হয়েছে জবর মনেতে নেই সন্দেহেরই রেশ
কিন্তু যদি এটিকেটে মানো জিগেস করবো একটি কথা
বেলঘরিয়া বেহালার সে ক্লেদপূর্ণ ছেষট্টির সনে
কোথায় ছিলে তুমি? নিশ্চয় বড্ড বিজি ছিলে অফিসে
নইলে হয়তো হয়েছিল দূরে কোথাও স্বাস্থ্যোদ্ধারে যেতে
থাকগে এসব কথা এখন লজ্জা পাবে মনে
বিভীষিকার স্মৃতি সেসব চুকে গেছে কেউ বা টেনে আনে।
কাজের কথায় আসি এবার নবনীতকে চেনো?
যা বলেছ এই এলাকার মস্ত বড় ফিগার একটা
চিনবে নাই বা কেন?
তবে লোকটা বিপ্লবী কি?
ঠিক বলেছ বিপ্লবী কি পথে ঘাটে ফলে
প্রফেশনাল গুন্ডা হয়তো হয়নি বনাবনি
হনুমিত্রের দলে।
এই বিষয়ে সূক্ষ্ম তর্ক গোটা কতক আছে তবে আজ
চা জুড়ালো ওই দিকেতেই মন দেওয়াটাই আপাতত কাজ।
তবুও আজ ঝড়ো হাওয়া বলে
নবনীতরা চিরকালই আমাদের দলে।
কালোয় ছাওয়া শহরতলি দানবতার কাল
দিন মানে গুন্ডাবাজি ইলেকশনের সাল।
বিভীষিকার ভরা দিনে নবনীতরা আসে
শয়তানেরা চমকে ওঠে থমকে দাঁড়ায় ত্রাসে।
দাঁড়ায় রুখে নবনীতরা মুঠোয় করে জান—

মা বোনেদের মান বাঁচে আর আমরা বাঁচাই প্রাণ।
আজকে মাতাল হাওয়া কাঁপন জাগায় বনে বনে
বিদ্রোহী তাই নবনীতরা সাতষট্টি সনে
কারাগারের আড়ালেতে মুক্তির দিন গোনে।

(৫)

রাঘু বললেন— ডলি, নবনীতের জন্যও চা-জলখাবার কর। ডলি জানত তার আর নবনীতের ব্যাপারটা কাকু পছন্দ করে না— এহেন আদেশ পেয়ে কাকুর দিকে গদগদ দৃষ্টিপাত করে সে চা-জলখাবার বানাতে ছুটলো।

রাঘু বিনা ভনিতায় বললে— তড়িৎ-এর বাড়িতে গিয়ে যে ব্রেন ওয়াশ করিয়ে আসছ, তোমার কি জানা আছে ভোলাকে দিয়ে ওরা তোমাকে এলিমিনেট করাতে চায়?

—আপনাকে কে বললো?

—কে বলবে? তুমি তো রোজ অগ্রগামীতে যাচ্ছ। ওর পাশেই মিলনায়তনে রোজ ভোলা তো থাকে তুমি জানো, তারপর সোদপুর থেকে একজন খুব ভালো শ্যুটার আনছে রোজ। তোমাকে ওয়াচে রাখছে। বাগে পেলেই শ্যুট করবে সেটা মনে রেখো।

ডলি চা আর চিঁড়া ভাজা নিয়ে ঢুকছিলো। আদুরে গলায় বললো— নবনীত, কাকু যেমন বলে, তেমন করো। তড়িৎদার বাড়ি যেয়ো না, অগ্রগামীতে যাওয়া বন্ধ রাখো ক'দিন।

—ভোলার ভয়ে?

নবনীত গম্ভীর ভারী বলায় বলল। মিনু মিত্রকে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ফেলে যাওয়া ওয়াগন ব্রেকিং সাম্রাজ্যের দখলও নবনীতের হাতে এসেছে। রাঘু প্রথম থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, গরিবের ছেলে নবনীত এভাবে যদি কিছু অর্থোপার্জন করে, রাঘুর আপত্তি নেই।

এ লাইনে ভোলা তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। মিনু মিত্রের সঙ্গে লড়ে সে ওয়াগন ব্রেকিং করতো আগেই। আজকাল সে বিপ্লব করছে বলে ওয়াগন ব্রেকিং ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নবনীত তাকে বিশ্বাস করেনা। মিনু মিত্র নয়, নবনীত জানে মিলিটারি এফিসিয়েন্সির দিক থেকে তার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে একজনই— সে ভোলা।

—না, ভয়টয় নয়।

রাঘু বললেন।

—তবে সাবধানে থেকো। বিশেষত সোদপুর থেকে যাকে আনছে...

বিকেলে নবনীত অগ্রগামী ক্লাবে বসে সাত-পাঁচ ভাবছিলো। তড়িৎদার কথা তার মনকে সহজে ছুঁয়ে যায়— আর তার ভাইপোর ওই কবিতা— ধুস শালা নবনীত, তোকে নিয়ে কেউ কবিতা লিখবে ভেবেছিস কখনো?

নবনীত নিজেই নিজেকে মুখ ভ্যাঙায়।

—কিন্তু ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দিলে খাবো কী? বাড়িটা পাকা করা শুরু করলাম। বিয়ে তো করতে হবে— ডলি আর কত অপেক্ষা করবে? কাকুর তো এখন মত হয়েছে মনে হয়।

—নাঃ, অন্তত ডলির জন্যও তো আমি রাঘুকাকুর বিরুদ্ধে যেতে পারবো না— কিন্তু তড়িৎদা যে বলে কাকু কি আমাকে ডিপেনডেবল গুন্ডা বডিগার্ড ভাবে।

নবনীত উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে ক্লাবের উঠোনে নেমে এলো। সে অন্যমনস্ক ছিলো— তাই একটু দেরিতে খেয়াল করলো একটা লম্বা ছিপছিপে ছেলে, হাত দুটো পিছনে করা ঈষৎ হেসে তার দিকে হেঁটে আসছে।

—এই নিশ্চয়ই সেই সোদপুরের শ্যুটার। ভোলা যাকে আমাকে মারার জন্য হায়ার করেছে— একা আমাকে ফেস করতে পারেনা— কাওয়ার্ড। নবনীত স্টেনগান আনতে দৌড়ে ঘরে ঢুকল।

—আরে, নবনীত শুনেছিলাম আমাদের দিকে ঝুঁকেছে। ওর সঙ্গে একটু আলাপ করব ভাবলাম।

সোদপুরের কমরেড বাদল নবনীতকে ডাকার জন্য হাত দুটো সামনে আনলো।

—ভোলার মতই নবনীতও নিশ্চয়ই খাঁটি। এরা খাঁটি হয়। একটু পলিটিকস্, রেভলিউশনারি পলিটিকস্ এদের ইনজেক্ট করলেই নিখাদ সোনা হয়ে উঠবে। আসছিই যখন, ভোলার সঙ্গে নবনীতের ক্লাসটা একত্রে নিয়ে নিলে ভালো হত— বাস্তব পৃথিবীকে কিছুমাত্র না জেনে, কলেজে পড়ে, বই পড়ে, আর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে রাজনীতি শিখেছে, সেই বাদল এই সব ভাবতে ভাবতে নবনীতের অগ্রগামী ক্লাবের দিকে আরও এগিয়ে গেল।

—বাদলদা সরে আসুন— বাদলদা শুয়ে পড়ুন বাদল দা— চিৎকার করতে করতে ভোলা বাদলের দিকে ছুটে আসার আগেই নবনীত তার বিখ্যাত ক্ষিপ্রতায় স্টেনগানের গুলি বাদলের বুকে উগরে দিলো।

রাঘু স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

তড়িতের চোদ্দ পুরুষে কেউ কোনো দিন রাজনীতি করেনি। তড়িৎই প্রথম। রাঘু রক্তে করে রাজনীতি এনেছেন। তড়িৎ পারবে রামুর সঙ্গে? রাঘু জানেন কাল ওরা পোস্টারে পোস্টারে এলাকা ছেয়ে দেবে— বাদল হত্যাকারী নবনীতের মুন্ডু চাই। অথবা, বিপ্লবীরা নবনীতের মুন্ডু নিয়ে গেন্ডুয়া খেলবে। নবনীত আর কখনো ওদের দিকে যাবে না। রাঘুর লোকই থাকবে। কৌটিল্য নীতির মোকাবিলা কবিতা দিয়ে করা যায় না। রাঘু ঠিক করলেন, আগামীকাল নবনীতকে দিয়েই তড়িতের কাছে এলাকা ছাড়ার নোটিশ পাঠাবেন।

গল্প

আপদ বিদায়

দীপঙ্কর দাস

উত্তর কলকাতার এক জনবহুল এলাকায় সরু গলির ভেতরে দেড় ঘরের এক ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক চেষ্টা চরিত্রের পরে সুপ্রিয় যেদিন কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার বাইরে তেঁতুলতলা অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে সদ্য সমাপ্ত 'আকাশ-প্রদীপ' নামের একটি বহুতল আবাসন প্রকল্পের ভেতর দুই বেডরুম বিশিষ্ট মাঝারি মাপের ফ্ল্যাট কিনে স্ত্রী অপর্ণা আর চার বছরের পুত্র রুবানকে নিয়ে সংসার পেতেছিল, তখন কেবল সুপ্রিয় একাই নয়, অপর্ণাও দীর্ঘ কারাবাসের পরে মুক্তি পাওয়া বন্দীর মতই মুক্তির শ্বাস ফেলেছিল।

ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের মালিকানাধীন একটা ফ্ল্যাটে বসবাসের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা জনিত স্বস্তি থাকেই। তার ওপর সেই ভাড়াবাড়ি যদি মাত্র দেড়ঘরের অতিস্বল্প পরিসরের অন্ধকূপ-সদৃশ এক অন্ধকূপ হয়, আর বাড়ির বর্তমান মালিকপক্ষ তাদের তিনপুরুষের পুরানো বাড়িটাকে কোনো স্থানীয় প্রভাবশালী প্রোমোটারকে দিয়ে ভেঙে ফেলে বহুতল আবাসন নির্মাণের জন্য সেই প্রোমোটারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে বাড়ির বিভিন্ন ভাড়াটেদের উচ্ছেদের জন্য প্রোমোটারেরই ছেলেদের ভাড়াটেদের পেছনে লাগিয়ে দেয়, তাহলে সেই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে সংসার নিয়ে পথে বসার আগে একটি নতুন ফ্ল্যাট কিনে নতুন করে সংসার পাতার বিরল সুযোগ পেয়ে গেলে সেই স্বস্তি যে কোনো মধ্যবিত্তের সংসারে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেবে— এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সুপ্রিয় এবং অপর্ণা সেই স্বাভাবিক মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল।

এটা ঠিক যে সুপ্রিয় ফ্ল্যাট খুঁজতে নেমে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ— দুই দিকের শহরতলিতে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে টের পেয়েছিল আজকের বাজারদর যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, সেই দরে শহরতলিতেও একটি দু-ঘরের ফ্ল্যাট কেনা অন্তত তার বাকি জীবনে সম্ভব হবে না। সুপ্রিয় খুব বড় চাকুরে নয়। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। যদিও এটাও বাস্তব যে, আজকাল দুর্নীতি যখন প্রায় মহামারীর আকার নিয়ে সমাজকে এতদূর সংক্রামিত করে ফেলেছে যে এই সংক্রমণ মুক্ত কোনো সরকারি কর্মচারী প্রায় লুপ্ত প্রজাতি হিসেবেই চিহ্নিত হতে বসেছে। এখন কেন জানি কোন্ ভূতের তাড়নায় সুপ্রিয় সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়রের মতো পদে দীর্ঘ চোদ্দ-পনেরো বছর কাজ করে এসে আজও নিজেকে সেই সংক্রমণ থেকে মুক্ত রেখে চলেছে। ফলে সুপ্রিয় জানত তার বৈধ আয়ের সাধ্য নেই শহরতলিতে কোনো ফ্ল্যাট কেনার। তাই সে যখন তার এক সহকর্মীর মুখে শুনলো, সহকর্মীরই এক ভায়রাভাই দীর্ঘদিন বিদেশে কাজ করে দেশে ফিরে এসে শহরতলি ছাড়িয়ে দুই একটি পঞ্চায়েতের অধীনে জমি কিনে প্রোমোটিং-এর ব্যবসা শুরু করেছেন, অবশ্য ব্যবসা বলতে যে লোভনীয় মুনাফার কথা ভেসে ওঠে শ্রোতার মনে, ঠিক সেরকম ব্যবসায়ী নন তার ভায়রাভাই। নিছক বসে না থেকে সামান্য মার্জিন রেখে কাজ করছে। এইরকমই একটা আবাসন প্রকল্প ভায়রা সদ্য সদ্য সমাপ্ত করেছেন। বেশ কিছু ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। দু-চারটি এখনও বাকি আছে। সুপ্রিয় যদি কিনতে রাজি থাকে, তাহলে সহকর্মীটি তার ভায়রার সঙ্গে সুপ্রিয়র যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে যে কোন ইচ্ছুক ক্রেতা সকলের আগে ফ্ল্যাটের অবস্থান জানতে চায়। কিন্তু ততদিনে সুপ্রিয়র কাছে এই কৌতূহলও প্রাসঙ্গিকতাও হারিয়ে ফেলেছিল। সুপ্রিয় কেবল সহকর্মীকে দ্বিধা নিয়ে বলেছিল— আমার ক্ষমতা তো জানেনই পরেশবাবু। যা করব, সবটুকু ধারদেনা করেই করব। সেই ঋণের পরিমাণটাও আয়ের মতোই সীমিত হবে। তার মধ্যেই...

—আরে বাবা তার মধ্যে হবে বলেই তো আপনাকে দক্ষিণের নরেন্দ্রপুর ছাড়িয়ে তেঁতুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেতরে ভায়রার ঐ 'আকাশ-প্রদীপ' প্রোজেক্টটার কথা বলছি। আপনাকে তো আর পার্ক স্ট্রিট কিংবা ভবানীপুরের কথা বলছি না। তেমন বুঝলে একদিন মিসেসকে নিয়ে দেখেও আসতে পারেন।

নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তেঁতুলতলা কেন, সুপ্রিয় তখন সুন্দরবনের ভেতরেও ফ্ল্যাট কিনতে প্রস্তুত। তাই দ্রুত ফ্ল্যাটটা কেনা হয়ে গেছিল সুপ্রিয়র।

(২)

নতুন জায়গা। কোথায় উত্তর কলকাতার সংকীর্ণ গলির ভেতর অন্ধকূপের মতো দুশো বছরের পুরনো দেড় ঘরের ভাড়া বাড়ি, দেয়ালের স্থানে স্থানে ঝরে পড়া চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা গাঁথুনির উৎকট হাসি, ফাটা মেঝে থেকে সময়ে অসময়ে তেঁতুলবিছে বেরিয়ে পড়া, উঠোনের কলে কর্পোরেশনের জলের সরু সুতোর মতো জল পড়া— এই নিয়ে পালিত প্রায় আট-দশ বছরের দাম্পত্য জীবন ছেড়ে একেবারে শহরের দক্ষিণ শহরতলির সীমানা পেরিয়ে পৌরসভার বাইরে তেঁতুলতলা অঞ্চল পঞ্চায়েতের ভেতর ঝকঝকে দুই ঘরের ফ্ল্যাটে নতুন করে সংসার পাতা— এতবড় পরিবর্তন সামলাতেই অপর্ণার মাসাধিক কাল কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টেরও পেল না।

এখন সুপ্রিয়কে অনেক সকালে আটটার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে টিফিন নিয়ে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হয়। বড় রাস্তা থেকে বাস ধরে গড়িয়া খাল পাড়ে নেমে মেট্রো ধরে। তবে না দশটায় অফিসে হাজিরা দিতে হয়। রুবানকেও কাছেপিঠে কোথাও ভর্তি করাতে পারেনি। বারুইপুরের এক ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে কেজি টুতে ভর্তি করাতে হয়েছে। স্কুলের নিজস্ব বাস আছে, এই যা রক্ষে। বড় রাস্তায় স্কুল বাস আসে ঠিক দশটায়। স্কুলবাসে রুবানকে তুলে দেওয়ার জন্য অপর্ণাকে পৌনে দশটায় বেরতে হয়। আবার বিকেল সাড়ে চারটেয় বাস এসে নামিয়ে দিয়ে যায় রুবানকে। অপর্ণা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে একটি বিশ্বস্ত কাজের বউ— কানন আছে বলেই অপর্ণা এতদিক সামলাতে পারছে।

সুপ্রিয় নিরুপায় হয়ে এখন অফিসের পরে একটি কনসালটেন্সি ফার্মে সান্ধ্যকালীন পার্ট-টাইম কাজ নিয়েছে। এস্টিমেট করা থেকে ড্রাফ্টসম্যানের কাজও করে দেয়। তাই কোনোদিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরা হয় না সুপ্রিয়র। খুব চাপ যাচ্ছে সুপ্রিয়র। এছাড়া কোনো উপায় তো ছিল না। যত কমেই ফ্ল্যাট কিনুক সুপ্রিয়, সব মিলিয়ে বারো লাখে দাঁড়িয়েছে মোট ঋণের পরিমাণ। এই ঋণ পরিশোধের জন্য সুপ্রিয়কে প্রতি মাসে কিস্তি জমা দিতে হয়, তারপর আর সংসার চালানো অসম্ভব।

তবু অপর্ণা স্বস্তিতেই ছিল। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই অপর্ণার সব সুখশান্তি উধাও হয়ে গেল। রোজ সন্ধ্যার পরে অপর্ণা গা ধুয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে একটা ভালো শাড়ি পরে তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় কাটায়। বাড়ির পুব মুখে একটা বস্তি আছে। দিনমজুর খাটা বস্তিবাসীরা এসময় ফিরে এলে বস্তিটা যেন জেগে ওঠে। ওদের গৃহস্থালি দেখে অপর্ণা। হঠাৎ করে সেদিন তার কানে অদ্ভুত একটা করুণ সুর এসে লাগল। ঠিক সুর নয়, অনেকটা যেন কান্নাই হবে। কোনো বিগত যৌবনা হতভাগ্য এক প্রবীণা কাছেপিঠে কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের বিস্তৃত আখ্যান বিবৃত করতে করতে কপালে চাপড় মেরে একনাগাড়ে ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে কেঁদে চলেছে। সেই কান্নার ধ্বনিটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম রাতের অতিব্যস্ত এই এলাকার আকাশে যে মনে হচ্ছে যেন, এই কান্নাটা কেবল আজই প্রথম ধ্বনিত হচ্ছে না। বহুদিন থেকে, ক্রন্দনরত বৃদ্ধার জন্মের আগে থেকে হয়তো। এই গ্রহে প্রাণের বিকাশের পরমুহূর্ত থেকেই অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে। এতদিন পরে অপর্ণাই যেন এই বিশ্বের প্রথম মানবী যে প্রথম সনাক্ত করল এই কান্নার শব্দকে।

প্রথমে অপর্ণা ভেবেছিল যে, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সামান্য কিছু উপার্জন করে যে সমস্ত নারী-পুরুষ সবে বস্তিতে ফিরে এসে রাতের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়েছে, তাদেরই ঘরের কোনো অভিমানী অবুঝ কন্যা কিংবা বৃদ্ধা মাতা একগাদা অনুযোগ নিয়ে কেঁদে চলেছে। আর সেই কান্নার শব্দটা বস্তির খোলার ঘরের বাইরে এসে তিনতলার ওপর অপর্ণার কানে পৌঁছিয়ে এমন অজাগতিক ধ্বনি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অল্প কিছুকালের মধ্যেই অপর্ণার ভুল ভাঙল। এই কান্না কোনো বস্তিবাসী পরিবারের কোনো কিশোরী কিংবা বৃদ্ধার নয়। কান্নাটাও ঠিক বস্তির ভেতর থেকেও ভেসে আসছে না। বস্তির পশ্চিমপ্রান্তে— যেখানে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ দাঁড়িয়ে আছে— সেখান থেকেই উঠে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে অপর্ণার হাত-পা কোনো অজানা অকল্যাণের আশঙ্কায় হিম হয়ে উঠল। কারণ সেই কান্নার মাঝখান থেকে বৃদ্ধার উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ খুব পরিষ্কারভাবে অপর্ণা শুনতে পেল— সব নির্বংশ হবি। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওলাওঠায় মরবি। মা-মনসার অভিশাপে সপরিবারে কাল কেউটের বিষে জ্বলে পুড়ে মরবি। এত পাপ মা শীতলা সইবে না। সব শীতলার অভিশাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি।

—কা-ন-ন! অ্যাই কানন, শিগগির একবার ব্যালকনিতে আয়তো। অপর্ণা গলা চেরা উচ্চগ্রামের ডাক শুনে কানন রান্নাঘর থেকে একরকম দৌড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

—এমন চেঁচাচ্ছ কেন বউদি! কানন বিস্ময়ের গলায় বলল— হঠাৎ কী হল তোমার?

—তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস! অপর্ণার গলা কাঁপল।

—কতরকমই তো শব্দ হচ্ছে। বড় রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দ, লোকজনের কোলাহলের শব্দ— সবই তো শোনা যাচ্ছে।

—বাজে কথা রাখ। অপর্ণা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল— কোনো কান্নার শব্দ! কোনো বুড়ি কেঁদে কেঁদে কাদের যেন অভিশাপ দিচ্ছে এমন কোনো শব্দ! শুনতে পাচ্ছিস!

—ওমা! ওটা তো ঐ পাগলি বুড়ির কান্না। সারাদিন বুড়িটা যেন কোথায় কোথায় ঘোরে। আর সন্ধ্যা নামলেই বস্তিটায় ফিরে এসে রোজই এমন করে দুনিয়াসুদ্ধু মানুষকে অভিশাপ দিতে দিতে কাঁদে। বস্তির লোকেরাই বুড়িকে রাতের খাবার দেয়। সেটা খেয়ে বুড়িটা বস্তির কোনো ঘরের দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হতে না হতেই উধাও হয়ে যায়। তুমি এতদিন ঐ কান্না শুনতে পাওনি— সেটাই তো আশ্চর্যের!

—কাঁদুক। তাই বলে এমন বিশ্রীভাবে অভিশাপ দিতে দিতে কাঁদবে কেন?

—আসলে বুড়িটা তো আগে এমন ছিল না। কানন বলল— যে জমিটার ওপর তোমরা এখন বাস করছ, সেই জমিটার মালিক ছিল তো ঐ বুড়িটাই। এই জমির ওপর বুড়ির শ্বশুরের একটা বাড়িও ছিল। সেই বাড়িতে বুড়ি তার দুই ছেলে, ছেলে বউ নিয়ে সুখেই ছিল। কিন্তু প্রোমোটারের সঙ্গে সাঁট করে বুড়ির দুই ছেলে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে বুড়িকে ভুল বুঝিয়ে

প্রোমোটারের কাছে জমি-বাড়ি বিক্রি করে দিল। বুড়ি তো আর এ্যাতো প্যাঁচঘোঁচ বোঝেনি। ছেলের পরামর্শ মতো চলে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ছেলে দুজন মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে বুড়িকে ফেলে রেখে বারুইপুর না কোথায় যেন চলে গেল। বুড়ি জানতে পারেনি। সেই থেকেই তো বুড়িটা মাথা খারাপ করে ফেলেছে। ওর ধারণা হয়েছে প্রোমোটার নয়, আকাশ-প্রদীপের বাসিন্দারাই চক্রান্ত করে বুড়িকে উচ্ছেদ করেছে। তাই তোমাদের নামে এমন গাল পাড়ে।

—তুই এত কথা জানলি কোথা থেকে? শ্বাস-চাপা গলায় বলল অপর্ণা।

—কেমন করে আর জানব? লোকে বলে বলেই তো জেনেছি— কানন বলল।

—কিন্তু আমাদের এমন অভিশাপ দেয় কেন? অপর্ণা ক্ষুব্ধ গলায় বলল— বুড়িকে তো আর আমরা উচ্ছেদ করিনি। সম্পত্তিও কেড়ে নিইনি। ঠকিয়েছে তার দুই ছেলে আর প্রোমোটার। অভিশাপ দিতে হবে ওদের দিক না! অপর্ণার গলায় ক্ষোভ আর বিরক্তি একসঙ্গে ফুটে উঠল।

—এ কারণেই তো ওকে পাগলি বুড়ি বসে সবাই। তোমাদের আকাশপ্রদীপ-এর কেউ বুড়ির কথায় কানও দেয় না। মাথাও ঘামায় না। কথায় বলে না— পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়। এতদূর বলে কাননের হয়তো খেয়াল হয়েছিল সে রান্নাঘর ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ। আসার সময় দ্রুততার কারণে ওভেনের গ্যাস বন্ধ করতে ভুলে গেছিল। হয়তো ওভেনে বসানো ডাল ফুটে ফুটে এতেক্ষণে শুকনো হয়ে যেতে বসেছে নির্ঘাৎ। তাই আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত ব্যালকনি ছেড়ে রান্নাঘরের উদ্দেশে ছুটে গেল।

সেই দিনকার সন্ধ্যারাতে তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অপর্ণা প্রথম আবিষ্কার করেছিল তার অজানা অপরিচিত এক পাগলি বুড়ির কান্নার শব্দ। মনোযোগ দিয়ে কান্নার ধ্বনি শুনতে শুনতে সনাক্ত করেছিল ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে কান্নার সঙ্গে উচ্চারিত আকাশ প্রদীপ-এর বিভিন্ন তলে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের উদ্দেশে উচ্চারিত অভিশাপের স্রোত। তারপর থেকে অপর্ণা যেন শত চেষ্টা করেও ঐ কান্না এবং অভিশাপগুলিকে নিছকই পাগলের প্রলাপ হিসেবে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। প্রতিদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে, বড় রাস্তায় স্কুল বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া রুবানকে বাড়ি নিয়ে আসার পরে রুবানের স্কুল ইউনিফর্ম বদলে বাড়ির পোশাক পরিয়ে বিকেলের জলখাবার খাইয়ে অপর্ণা মনে মনে সংকল্প করেছে, কোনো অবস্থাতেই সে সন্ধ্যায় গা ধুয়ে ফ্রেস হয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াবে না। আর এই কারণেই অপর্ণা সন্ধ্যার পর রুবানকে হোমটাস্ক করতে বসিয়ে অপর্ণা একরকম জোর করে রুবানের হোমটাস্ক করার তদারকি করার অছিলায় রুবানের সামনে বসে থাকার জন্য মনস্থির করল। রুবানের এখন কেজি টু। আগামী বছর ক্লাস ওয়ান হবে। রুবানের স্কুলে আন্টিরা এমনভাবে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে দেয় যে, হোমটাস্ক বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। ফলে সামান্য হোমটাস্কের তদারকিরও প্রয়োজন হয় না। তাই অপর্ণা রুবানের সামনে বসে থাকলেও তেমন করে রুবানের হোমটাস্কের মধ্যে নিজেকে জগত সংসার ভুলে ডুবতেও পারে না। তার ওপর সেই সন্ধ্যা গড়িয়ে প্রথম রাতের দিকে পা বাড়ায় সময়। ঠিক তখনই বুড়ির কান্নাটা শুরু হয়। আর সেই কান্নার ধ্বনিটা দক্ষ সাপুড়ের বাঁশির সুরের মতো অপর্ণাকে সম্মোহিত করতে শুরু করে। অপর্ণা দাঁতে দাঁত দিয়ে উপেক্ষা করতে চায় সেই সম্মোহনকারী কান্নার ধ্বনিটাকে। মাঝে মাঝে ঘরে টিভিটা জোরে চালিয়ে দেয়। টিভির গমগম ধ্বনিটা সারা ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়ে। কানন পর্যন্ত হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে এসে দেখে অপর্ণার এমন দৃষ্টান্তবিহীন কাণ্ড। তবু অপর্ণা যেন কিছুতেই ঐ পাগলি বুড়ির কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ঘোষণা করা অভিশাপগুলোকে কানে ঢোকার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে পারে না। আর আশ্চর্যের এটাই যে, অপর্ণা একসময়, সাপুড়ের বাঁশির সুরে মন্ত্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়া বিষধর গোখরো সাপ যেমন ফণা নামিয়ে সুর সুর করে সাপুরের ঝাঁপির ভেতর আশ্রয় নেয়, তেমনি ঘর ছেড়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। শোনে পাগলি বুড়ির কান্না আর অভিশাপ।

শহরতলি হলেও প্রথম রাতে এদিকেও শব্দের কম প্রাবল্য থাকে না। অদূরে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলা বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ির চাকার শব্দ, যানবাহনের হর্নের তীব্র শব্দ, বড় রাস্তায় লোক চলাচলের শব্দ, কাছেপিঠের কোনো কারখানার নানা ধরনের ধ্বনি, সামনের বস্তিতে সারাদিনের কাজকর্মের পরে মেয়ে-মরদের ব্যস্ততার শব্দ, ওদিকে দক্ষিণ পাড়ায় বরফ কলের শোঁ শোঁ শব্দ, তেঁতুলতলার হরিসভায় নাম-সংকীর্তনের শব্দ— শব্দে শব্দে এদিকের প্রথম রাতের আকাশ ভরে থাকে। শব্দের এমন জটিল আর কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামের মিশ্রণের তুলনায় বুড়ির ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে কান্নার ধ্বনি এতটাই দুর্বল যে তাকে আলাদা করা যে কোনো মানুষের পক্ষে একরকম দুরূহ কাজ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, প্রতিদিন সন্ধ্যারাতে অপর্ণার কানে ঐ পাগলি বুড়ির কান্নার শব্দটাই কেবল ধরা পড়ে। অপর্ণার কাঁধের পেশিতে দমে ওঠে এক অমঙ্গলের আশঙ্কা। সেই আশঙ্কা অপর্ণার শিরদাঁড়া বেয়ে হিলহিল করে নেমে যায় পায়ের দিকে।

(৩)

—বুঝি না বাবা! মাঝে মাঝে রাতের খাবার টেবিলে বসে অপর্ণার মুখ থেকে ঐ পাগলি বুড়ির কান্নার প্রসঙ্গ শুনে শুনে এক একদিন সুপ্রিয় বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। বুড়িকে যদি

সত্যি সত্যি কেউ ঠকিয়ে থাকে, ঠকিয়েছে তো বুড়ির ছেলে-ছেলে বউরা। আমরা তো কেউ ঠকাই নি। প্রোমোটারের কাছ থেকে ন্যায্য দাম দিয়েই বৈধ ফ্ল্যাট ওনার হিসেবেই বাস করছি। ফলে আমরা পিকচারে আসছি কেমন করে?

—কিন্তু বুড়ি তো আমাদেরই তার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করে। আমাদেরই অভিশাপ দেয়। বলে ছেলে ওলাওঠায় মরবে। তোরা মা মনসার বিষে নির্বংশ হয়ে মরবি। এতদূর বলে অপর্ণা আর কান্না রাখতে পারে না। গোঁঙিয়ে উঠে বলে— আমার রুবানের যদি কিছু হয়...।

—কি মুসকিল! একটা পাগলি বুড়ি অকারণে কিছু ফালতু গাল দিলেই কি সেটা সত্যি হয়ে যাবে নাকি? সুপ্রিয় বিব্রত গলায় বলে— বুড়ি কি দুর্বাসা মুনি না বিশ্বামিত্র যে অভিশাপ দিলেই ফলে যাবে।

অপর্ণার মনের এমন বিচলন দেখে সুপ্রিয় মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ে না এমন নয়। কারণ কেউ না জানুক সুপ্রিয় জানে রুবানকে ঘিরে অপর্ণার মনে কোনো মাত্রায় উৎকণ্ঠা কাজ করে আসছে রুবানের জন্মের পর থেকেই। এই উৎকণ্ঠা সময় সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে যায় যে সুপ্রিয় অপর্ণাকে কোনো সাইক্রিয়াটিস্ট-এর কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য ভাবতে থাকে। রুবানের সামান্য একটু সর্দি-হাঁচি হল কি কিছুদিন খাওয়ায় অনিচ্ছা জাগল, হয়তো বা একদিন একটু তরল মলত্যাগ করল— যেসব উপসর্গগুলি যে কোনো শিশুর শরীরে জন্মের পর থেকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যতদিন না খাপ খাইয়ে নিতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত প্রায়শই দেখা যায়— সেইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে এতটাই উতলা হয়ে পড়ে যে সুপ্রিয়র মনে বিরক্ত জাগিয়ে তোলে। একবার তো শহরের এক নামি চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাক্তার রুবানের তথাকথিত অসুস্থতার বহর দেখে সুপ্রিয়কে চেম্বারে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন— আপনার ছেলের জন্য নয়, আপনার মিসেসকে কোনো সাইক্রিয়াটিস্ট দেখান। মাদারকে এভাবে অ্যাঙ্কসাস হতে দেখলে বেবিও একদিন সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কথাটা অপর্ণাকে বলেনি সুপ্রিয়। কারণ সুপ্রিয় অপর্ণার রুবানকে নিয়ে এমন অযৌক্তিক উৎকণ্ঠার পেছনের কারণটা বেশ ভালো কলেই সনাক্ত করতে পারে। বিয়ের পর তিনবছর পরিকল্পিত দাম্পত্য জীবন পালন করার পর সুপ্রিয় এবং অপর্ণা উভয়েই একটি সন্তান আনার জন্য মনস্থির করেছিল। ঠিক তার ছ-সাত মাসের মাথায় তাদের আকাচিWত সন্তানের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল অপর্ণার শরীর। কিন্তু মাত্র তিনমাসও গড়ায়নি। তার মধ্যেই অপর্ণার মিসক্যারেজ হয়ে গেছিল। জীবনে প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের বার্তা শরীরে ধ্বনিত হওয়ার পরে কোন স্ত্রীর জীবনে মিসক্যারেজের মতো ঘটনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের চোখে এতবড় বিপদ বলে চিহ্নিত না হলেও স্ত্রীর জীবনে খুব সামান্য ঘটনা নয়। তবু অপর্ণার মানসিক বিপর্যয় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছিয়ে গেছিল যে সুপ্রিয় নিরুপায় হয়ে তখন অপর্ণাকে সোজা করে দাঁড় করানোর জন্য সেই সাইক্রিয়াটিস্ট-এরই শরণাপন্ন হয়েছিল। অপর্ণার মনে কেন জানি বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছিল যে, সে আর কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। যদিও বা তার গর্ভে সন্তানের আগমনের উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলেও সেই ভাবী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

বছর দেড়েকের মাথায় অপর্ণা যখন আবার সন্তানসম্ভবা হল, আর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলে একদিন রুবানের জন্ম দিল অপর্ণা, তখন অপর্ণা তার মানসিক জটিলতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যদিও অপর্ণার অজান্তে মস্তিষ্কের ভেতর রুবানকে ঘিরে একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করেছিল, তবে সেই উদ্বেগ কিংবা উৎকণ্ঠা কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যার জন্য সুপ্রিয়কে অপর্ণার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু হঠাৎ করে কোথা থেকে এক পাগলি বুড়ির কান্না আবিস্কার করে বুড়ির শাপশাপান্ত শুনে অর্পণা যে রুবানকে নিয়ে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়েছে, টেরও পায় নি সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়র খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। সরাসরি বাথরুমে না গিয়ে তার মুখোমুখি খেতে বসা অপর্ণার ভেঙে পড়া শরীরের কাঁধে সান্ত্বনার হাত রেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলল— ঐ বুড়িটা তো কেবল তোমাকেই চিহ্নিত করে অভিশাপ দেয় না অপু! ও তোমাকে কেন, সম্ভবত আমাদের এই আবাসনের কোন বাসিন্দাকেই চেনে না। তাই সকলের উদ্দেশ্যেই অভিশাপ দেয়। তাদেরও ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। কিন্তু কৈ, তাদের তো ঐ বুড়িকে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। শকুনের শাপে গোরু মরে না। রুবানেরও কিছু হবে না। তুমি কেবল একটু শক্ত থেকো। ওসব বাজে কথায় কান দিও না। তাহলেই হবে।

(৪)

সুপ্রিয়র যুক্তিসঙ্গত সান্ত্বনা অপর্ণার মনে কতখানি প্রভাব ফেলল, সে কথা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও অর্পণা ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থির হয়ে উঠল। এদিকে শহরের আকাশে বর্ষার মেঘ জমল। মেঘ বৃষ্টির সন্ধ্যারাতে মাঝে মাঝেই সেই বুড়ি তার নিত্য দিনের কান্না এবং অভিশাপ দেওয়ার কাজে কামাই দিল। সেই সব সন্ধ্যা রাতগুলি অর্পণার জন্য অন্য এক উৎকণ্ঠা বয়ে নিয়ে এল। বুড়িটার আবার শরীরটরির খারাপ করল নাতো! কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ অর্পণা তো বেশ কয়েকটা রাতে তিনতলার জানলা দিয়ে দেখেছে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বুড়িটা কোন বস্তিবাসীর চালাঘরের সামনের দাওয়ায় ঘুমিয়ে আছে। এমন মেঘবৃষ্টিতে বুড়ির ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজারি হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দিন কয়েক কামাই দিয়ে পুনরায় সন্ধ্যারাতে বুড়ির কান্না শুনতে পেয়ে অর্পণা স্বস্তি ফিরে পায়। না, মরেনি।

এভাবেই বর্ষা পেরিয়ে শরৎ হেমন্ত ডিঙিয়ে শীতকালও চলে এল। শহর কলকাতায় শীতের অনুভূতিটা তেমন করে পাওয়া না গেলেও শহরতলি ছাড়িয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এদিকটায় শীতের কামড় বেশ ভালো করেই টের পাওয়া যায়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শীতের মাত্রাটা বাড়তে থাকে। শীতের ছোট বেলা। সূর্য অস্ত না যেতেই হুড়মুড় করে ছুটে আসে উত্তরের হিম বাতাস। তখন ঘরবাড়ির দরজা জানলা দ্রুত বন্ধ করে দিতে হয়। আকাশ প্রদীপ হাউসিং-এর প্রতিটি ফ্ল্যাটও এই নিয়মে চলে।

তবু এর মধ্যে অর্পণা সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ার পরে মোটা শাল দিয়ে কান মাথা, বুক পিঠ ঢেকে একবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবেই। দেখবে চারদিকে ঘন কুয়াশার চাদর ঝুলছে। দেখবে বস্তিতে ফিরে আসা বাসিন্দাদের কর্মতৎপরতা। অপেক্ষায় থাকবে কখন সেই পাগলি বুড়ির কান্না শুরু হয়। কান্না এবং অবিশ্রান্ত অভিশাপের বর্ষণ শুনে তবেই ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে ফিরে আসে। দরজা বন্ধ করে দেয়।

ডিসেম্বরের শেষ এখন। ক'দিন আগে বড় দিন আসছে। এদিকে সাহেব বাগানে যে গির্জাঘরটা আছে, বড়দিন উপলক্ষে সেটাকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। আলোর সাজ এখনো খোলা হয়নি। চলবে ইংরেজি নববর্ষের রাত পর্যন্ত। ফলে সাহেব বাগানের ওদিকের আকাশটা এখনও আলোকিত হয়ে আছে।

কিন্তু আজ সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল। সাতটা বেজে আটটার ঘর ছুঁয়ে ফেলল ঘড়ির কাঁটা। তবু অর্পণা পাগলি বুড়ির কান্না শুনতে পেল না। অর্পণা ভাবল হয়তো সাহেব বাগানের গীর্জা ঘরে সন্ধ্যারাতে গরিবদুখিদের কেকটেক বিলি করেন পাদ্রীরা। বুড়ি নিশ্চয় খাওয়ার আকর্ষণে কান্নার কাজ ফেলে সেখানেই গেছে।

একদিন গেল। দুদিন গেল। ইংরেজি নববর্ষের রাতের পরে সাহেব বাগানের গির্জাঘরের আলোকসজ্জা খুলে নেওয়া হল। তবু বুড়ির কান্নার শব্দ শুনতে পেল না অর্পণা।

দুপুরে খেতে বসে মনের উদ্বেগটাকে অর্পণা কাননের কাছে প্রকাশ না করে পারল না। বলেই ফেলল— বেশ ক'দিন সন্ধ্যারাতে পাগলি বুড়ির কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন রে কানন? এলাকা ছেড়ে চলে টলে গেল নাকি?

— ওম্মা, তুমি শোননি বউদি? কানন মুখে ভাতের গ্রাস নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল। — বুড়ি তো এখন হাসপাতালে। ঐ যে তোমার গোবিন্দপুরে যে খ্রিস্টান মিশনারিদের ফ্রি হাসপাতাল আছে, বস্তিবাসীরা বুড়িকে ঐ হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। প্রায় এক হপ্তা হতে চলল। হাসপাতালেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।। তুমি কান্না শুনবে কেমন করে?

বুড়ি হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে! এ কারণে অর্পণা রোজ সন্ধ্যারাতে বুড়ির সেই অভিশপ্ত কান্না শুনতে পাচ্ছে না। কানন ভুল খবর আনে নি। কারণ কাননকে বাইরের কোন কাজে পাঠালে কোনদিন সহজে বাড়ি ফেরে না। কাজ সেরে সারা পাড়া বেরিয়ে সব ঘরের খবরাখবর সংগ্রহ করে তবে বাড়ি ফেরে। যদিও কাননের সংগ্রহ করে আনা অন্যের হাঁড়ির খবরের প্রতি অর্পণার কোন কৌতূহল নেই, তবু কানন তার বিরল কৃতিত্ব তার বউদির কাছে উগরে না দিয়ে স্থির হতে পারে না। অর্পণা এই কান দিয়ে শোনে, আবার ঐ কান দিয়ে বের করে দেয়। গায়ে মাখে না। প্রতিপ্রশ্ন করা তো দূরের কথা!

কিন্তু আজকের সংবাদটা কাননের মুখ থেকে শুনে অর্পণা গায়ে ভালো করে না মেখে পারল না। দীর্ঘ দিন ধরে এক ভাগ্যবিড়ম্বিত দুই পুত্র দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেরই বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হয়ে মাথা খারাপ করে ফেলা এক বিধবা বুড়ি, বস্তির কোন অদৃশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে নিত্যদিন সন্ধ্যারাতে কোন অমঙ্গলের বার্তা বহন করা সুরে ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে কেঁদে কেঁদে আকাশপ্রদীপ-এর প্রতিটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের উদ্দেশে শাপশাপান্ত করে অর্পণার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা বৃদ্ধা, আজ সপ্তাহখানেক ধরে এক বিনাপয়সার হাসপাতালের শয্যায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে— কাননের মুখ থেকে এতবড় স্বস্তির সংবাদ শুনে, কোথায় অর্পণার মন আনন্দে ভরে উঠবে— সেখানে হঠাৎ করে কেন যে অর্পণার মন গভীর বিষাদে ডুবে গেল— অর্পণা বুঝতে পারল না। অর্পণার তখনও খাওয়া শেষ হয় নি। থালায় অর্ধেক ভাত পড়ে আছে। পড়ে আছে মাছের বাটিটাও। তবু অর্পণার আর খাবার ইচ্ছা চলে গেল। অর্পণা থালার ভাত থালায় রেখে উঠে পড়ল। শুনল, কানন তখনও বলে যাচ্ছে— বস্তির ওরা বলাবলি করছিল যে বুড়িটা নাকি আর বাঁচবে না। বুড়ির নিমুনিয়া হয়েছে নাকি। ওষুধ কাজ করছে না।

এমন বৃদ্ধ বয়সে এমন তীব্র শীতের রাতে বস্তির মতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দাওয়ায় পড়ে থাকার ফলে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ঘটায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই। অর্পণা এও জানে এই বয়সে দুই ফুসফুসে এমন সংক্রমণ ঘটার পর ওষুধ যদি কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই রোগীর পরিণতি ঠিক কী হতে পারে। বিশেষ করে ঐ পাগলি বুড়ির মতো অনাহারে দিন কাটানো রোগীর ক্ষেত্রে। আর জানে বলেই তো অর্পণার খাওয়ার রুচি হারিয়ে গেল।

দিন তিনেক পরে দুপুরে চানখাওয়া সেরে অর্পণা শোওয়ার ঘরে বিছানার ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোওয়া হয়ে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। পৌষের মাঝদুপুরের রোদ আজকের মতো ব্যালকনি থেকে সরে যাওয়ার পরে কানন ব্যালকনির রেলিঙ-এ মেলে দেওয়া অর্পণার শাড়িটা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তুলে ভাঁজ করতে করতে এক সময় অর্পণাকে নিচু গলায় ডাকল। —বউদি, শীগগির একবার ব্যালকনিতে

এসে দেখ!

কাননের গলার স্বরে এমন এক আকর্ষণ ছিল যে অর্পণা এক রকম লাফ দিয়েই খাট থেকে নেমে ঘর ছেড়ে দ্রুত ব্যালকনিতে কাননের পাশে এসে দাঁড়াল।

কানন হাত দিয়ে অপর্ণাকে বস্তির দিকে ইঙ্গিত করল— দ্যাখো বউদি!

মুখ নিচু করে কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেখল অর্পণা। বস্তির গলিপথে একটা সস্তাদরের খাটের ওপর পড়ে আছে এক বিধবা বুড়ির নিথর শরীর। তার সর্বাঙ্গে ঢাকার জন্য যে সাদা চাদর ব্যবহৃত হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য এতটাই কম যে চাদরের দুই প্রান্ত থেকে বুড়ির মাথা এবং দুই পায়ের অনেকটা অংশ বেরিয়ে আছে। দু'জন বস্তিবাসী কোথা থেকে কয়েকটা রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে এসে খাটের চারপায়ায় বেঁধে দিচ্ছে। আর দুজন দুটো ধূপকাঠির প্যাকেট খুলে কাঠি জ্বালিয়ে গুঁজে দিচ্ছে খাটের পায়ার খাঁজে।

খুব সরল দৃশ্য। এর অর্থ কোন পরিণত বয়সের নরনারীকে বলে বোঝাতে হয় না। কাননও বুঝল, বুঝল অপর্ণাও। আর বুঝল বলেই দুজনেই নীরব দৃষ্টি নিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই চারজন পুরুষ খাটের চার কোণ কাঁধে চাপিয়ে বুড়িকে নিয়ে নিকটবর্তী শ্মশানের উদ্দেশে রওনা দিল। পেছন পেছন কয়েকজন মহিলাও হেঁটে চলল, আর তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেল বস্তির কয়েকটি কুকুর। আশ্চর্য, ওরা একবারও ডাকল না। বস্তির নৈঃশব্দ্য যেন তাদেরও স্তব্ধ করে দিয়েছে। এক সময় বুড়িকে নিয়ে মিছিলটা ডান দিকে বাঁক ফিরে অপর্ণার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

— বাঁচা গেল। আপদ বিদায় হলো। এবার তোমার শান্তি, তাই না বউদি! সম্পূর্ণ অকৃত্রিম আন্তরিক উচ্চারণ। কণ্ঠস্বরে কোথাও নেই সামান্য শ্লেষের ছোঁয়া, কোনও সমব্যথীর গলাতেই এমন সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। কাননের কথাগুলি সেরকমই।

তবু অপর্ণার গা জ্বলে উঠল। রুক্ষ গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল অপর্ণা— জানি, জানি এখন তুই কেন, সবাই আমাকেই ঐ বুড়ির মৃত্যুর জন্য দুষবে। কিন্তু বুড়ি তো এতদিন একপেশে ভাবে আমাকে শাপশাপান্ত করেছে। আমি তো কোনদিন সামান্য একটা কথাও ফিরিয়ে দেইনি। মুখ বুজে সব মেনেই নিয়েছিলাম। তবু সেই আমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ভাগী হয়ে গেলাম।... মা গো...! আর বলা হলো না অপর্ণার। কারণ তার গলাতেই কেবল কান্না জমে কণ্ঠরোধ করে ফেলেনি। দুই চোখও প্লাবিত হয়ে জগৎ সংসার ঝাপসা করে দিয়েছে।

মানুষ আর কুকুরের গল্প

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

রুমা হাসে। হাসতেই থাকে পাগলের মতো। হাসির প্রকোপে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার দশা তার। হাসির রোগ আছে রুমার। তাই বলে এমন পাগলের মতো হাসি?

টুলের উপর বাঁ পা-টা তুলে নর্থস্টার জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে নীল আড়চোখে দেখছিল রুমাকে। লাল টাইটা গলায় ঝুলছে কিন্তু নট্‌টা বাঁধা হয়নি এখনো। ডব্‌ল নটটা রুমারই বেঁধে দেওয়ার কথা। কিন্তু রুমা খালি হেসেই চলেছে।

এই ডব্‌ল নট আর ওই হাসি এ দুয়েরই সামান্য ইতিহাস আছে।

বছর পাঁচেক আগে গ্লোবালাইজেশন যুগের অভাবিত দাক্ষিণ্যে কয়েক কোটি ইউরোর একটা বিরাট আউটসোর্সিং জব হাতিয়ে আনতে পেরেছিল ড্রিমেজিনেশন মাল্টিমিডিয়া কনসার্ন। হঠাৎ সেনসেক্সের দাম পড়ে যাওয়ায় মন্দায় ধুঁকতে থাকা কোম্পানির প্রায় ছপ্পড় ফুঁড়ে আকস্মিকই নেমে এসেছিল এই আশীর্বাদ। এই উপলক্ষেই গ্রান্ড হোটেলে কোম্পানির দেওয়া একটা ককটেল পার্টি আর সেইসঙ্গে কোম্পানি একান্ত বিশ্বস্ত এবং যোগ্য বলে যাদের মনে করে তেমন কয়েকজন কর্মচারীর প্রমোশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নভোনীল সেন তাদেরই একজন যে সামান্য ডিজাইনার থেকে ক্যাঙ্গারুর মতো দুলাফে একেবারে ক্রিয়েটিভ একজিকিউটিভ পদে উত্থান— কোম্পানির প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার একান্ত পুরস্কার।

গ্রান্ড হোটেলের 'বোকো হল'-এ সস্ত্রীক পার্টি। নাচ গান হৈ হল্লা উদ্দাম ফূর্তি। সোমরসের ফেনায় সীলিংয়ের স্বপ্নালু আলোর ঝলকানি। যেন মর্তলোকে নেমে আসা একখণ্ড ইন্দ্রপুরী। পার্টি থেকে বাড়ি ফিরে কিন্তু মুখভার রুমার। ধড়াচূড়ো ছাড়তে ছাড়তে স্যাম্পেনের মিষ্টি 'হ্যাং-ওভার' জড়ানো গলায় বলে নীল রুমার উদ্দেশে— কি গো, মিসেস ক্রিয়েটিভ একজিকিউটিভ, দুয়োরানীর মত মুখ কেন?

সত্যিকারের দুঃখী দুঃখী গলায় বলে রুমা— পার্টিতে একদম ভালো লাগছিল না গো তোমাকে দেখতে। যাদের তুমি ফিসফিস করে চিনিয়ে দিলে তোমার সাব অর্ডিনেট স্টাফ বলে তারাও কি সুন্দর সেজেগুজে এসেছিল। সবার গলায় তিনটাকা দামের সিঙারার সাইজের কী সুন্দর টাইয়ের নট আর তোমার নটটা গোরু ছাগল বাঁধার দড়ির মতো— এইটুকু ছোটো গিঁট। কী বিচ্ছিরি। কোম্পানি তোমাকে গোরু ছাগল বানিয়ে রেখেছে নাকি? আহত গলায় বলে নীল— কী বলছ রুমা? কোম্পানি আমাকে গোরুছাগল মনে করলে একসঙ্গে দু দুটো প্রমোশন দিয়ে দেয়? আসলে আমার এটা হোলো সিঙ্গল নট। আমি সিঙ্গল নট বাঁধব না ডাবল নট সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত চয়েস। কোম্পানি এ-ব্যাপারে কেন খবরদারি করতে যাবে বল তো—

রুমা বলে— যদি নাই করে তাহলে সবার টাইয়ের নট যখন সিঙ্গারার মতো তোমারটা লক্ষ্মীপুজোর পানিফলের মতো কেন শুনি?

এর উত্তরে একটু চুপ থেকে তারপর অবশ্য নীল ঝেড়ে কেশেছিল। বিবৃত করেছিল তার একেবারে মৌলিক সমস্যার কথা।

নীল বলে— কী করব বল? চিরকাল তো পানিফলের মতো সিঙ্গল নটই বেঁধে এলাম— সিঙ্গারার সাইজের ডাবল নট বাঁধা তো আর শিখলাম না। হঠাৎ যে একলাফে ক্রিয়েটিভ একজিকিউটিভ হয়ে যাবো তা তো গতকালও জানতাম না— যারা দু'দিন আগেও আমার সিনিয়ার ছিল তারা অনেকেই এখন আমার জুনিয়ার। জুনিয়ারদের কাছে গিয়ে কখনো নটের টাই বাঁধা শেখা যায় রুমা? সিনিয়রিটির আর কী মান মর্যাদা রইল তাহলে?

রুমা এবার হেসে বলে— হুঁ। অত্যন্ত কঠিন সমস্যা বুঝতেই পারছি। ভয় নেই— এর সমাধান আমিই করছি—

অতঃপর প্রায় যেন জেমস বন্ডের দুঃসাহসী চতুর ভূমিকায় নিজেকে বসানো রুমার এবং কোনো গুপ্তধনের গোপন সাংকেতিক লিপি উদ্ধারের মতোই কোনো এক জুনিয়র স্টাফের বৌয়ের কাছ থেকে চতুর আলাপচারিতার মাধ্যমে জেনে নেওয়া ডবল নট বাঁধার গূঢ় টেকনিক আর তারপর থেকেই অফিসে যাওয়ার আগে নীলের গলায় টাইয়ের নট বেঁধে দেওয়ার দায়িত্ব রুমারই। টাই বাঁধার পর পাখির ডানার মতো দু'দিকে হাত ছড়িয়ে দেয় নীল আর পিছন দিক থেকে তার হাত কোটের হাতায় গলিয়ে দেয় রুমা। ঠিক ফিলমে যেরকম দেখা যায়। আদর্শ বৌয়ের ঠিক যেরকন কোট পরিয়ে দেওয়ার নিয়ম আদর্শ স্বামীকে। কোট টাই পরিয়ে দেওয়ার পর তাকে এপাশ ওপাশ থেকে দেখে নিয়ে বলে রুমা— এই তো খোকামণি, এবারে সত্যিকারের একজিকিউটিভের মতোই লাগছে তোমাকে দেখতে— দেখলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা হয় এখন।

আজও যেরকম সব ঘটার নিয়ম সেরকমই ঘটেছিল— জুতোর ফিতে বেঁধে নিয়েছে নীল এবার রুমার টাই আর কোট পরিয়ে দেওয়ার পালা। সব কিছুই ঠিকটাক— হঠাৎ হাসতে শুরু করল রুমা। হাসতে হাসতে ডাইনিং টেবিলের পাশের চেয়ারে ধপাশ করে বলে পড়ে বলে— বাপ্‌রে, বাপন যখন কাল আঙুল তুলে চু-চু করে ডাকছে তখন তোমাদের রাজা সান্ন্যালের

ভ্যাবাচ্যাকা মুখের ভাবটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। হো-হো-হো— শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে রুমা। ঠিক মনে হচ্ছিল যেন আমাদের ডগি-র মুখ।

নীল বলে— সে তো গতকালের ঘটনা, তার জন্য আজও এত বেলা অবধি হাসতে হবে নাকি?

—আজ কেন? আরও অনেকদিন ধরে হাসতে হবে। উঃ সে মুখ ভোলা যায় না।

নীল বিরক্ত হয়ে বলে— বেশ সারা জন্ম ধরেই হাসো। অতঃপর গলায় টাই না বেঁধেই অফিসে চলে গিয়েছিল নীল।

এই যদি টাইয়ের নটের ইতিহাস হয় তাহলে এই হাসিরও বেশ একটি হাস্যজনক ইতিহাস আছে। সামান্য একজন টাইপিস্ট এবং পিএ টু নভোনীল সেন হলেও রাজা সান্যালকে দেখলে মনে হয় কোম্পানির মালিক যেন আদতে সে-ই। যেমন ফর্সা লম্বা তেমনি সম্ভ্রম উদ্রেককারী চেহারা। কয়েক কোটি টাকার কাজের বরাত পাওয়ার পর কোম্পানির কাজের সময়ের আর ঠিক ঠিকানা নেই। বাড়িতেও প্রায়ই অফিস করতে হয় নীলকে। বকেয়া কাজ শেষ করতে পিএ রাজা সান্যালকে মাঝে মাঝে আসতে হয় অফিস বস্ নীলের বাড়িতে। বাড়ির সকলের সঙ্গেই মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেছে তার এ-সূত্রে। বাপনের সঙ্গেও। এখন রাজা ওর গাল টিপে আদর করলে বিরক্ত হয়ে বাপন আগেকার মতো সরে যায় না। কৌতূহলী চোখে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে ওকে। শুধু বাপন নয়— তুলোর মতো সাদা লোমে আগাগোড়া ঢাকা খেঙ্কুড়ে স্প্যানিয়েল ডগি-ও চিনে নিয়েছে ওকে। টেবিলের পায়ার সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা তুলোর বলটা আগেকার মতো ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায় না ওর দিকে। বরং কেমন উদাস দার্শনিক ভঙ্গিতে কালো কালো চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে নিরীক্ষণ করে ওকে।

কোম্পানির প্রতি বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ ডবল প্রমোশন পাওয়াটাকে সেলিব্রেট করতে নীলই প্রস্তাব দিয়েছিল একটা বিলিতি কুকুর কেনার জন্য। বাড়িতে বিলিতি কুকুর রাখা একটা আলাদা আভিজাত্যের ব্যাপার। নীলের অনেক জুনিয়ার কলিগের বাড়িতেও তো আছে বিলিতি কুকুর। বিকেলে শপিং মলে যায় তাদের মিসেসরা কেনাকাটি করতে— পিছনে জিভ বের করে চার পা-ওয়ালা উলের বলের মতো হাঁটে কুকুরগুলি। কী সুন্দর দৃশ্য! কুকুর কি শুধুমাত্র কুকুর নাকি? কুকুরেরও একটা ইজ্জত আছে।

প্রস্তাবটা মনে ধরেছিল রুমারও। রুমা নীল আর বাপন এই তিনজনে মিলে অতঃপর নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছিল এই সাদা তুলোর বলটাকে। কেনার পর থেকেই ঘরের নতুন অতিথির ডগি-র সঙ্গে দিব্বি বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল বাপনের কয়েকদিনের মধ্যেই। টলমলে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ঘোরে ডগি-র পিছু পিছু আর মাঝে মাঝে ওর গলার বক্লস-এর সঙ্গে বাঁধা চেন টেনে ধরে চু চু শব্দে ডাকতে থাকে রুমার দেখাদেখি। ডগি-ও বেশ হাসিহাসি মুখেই হাঁটতে থাকে ওর সঙ্গে।

সামান্য টাইপিস্ট হলেও কোম্পানি যা মাইনে দেয় তাতে বেশ কয়েক সেট কোট প্যান্ট টাই পুষতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয় রাজার। একটু রাজকীয় চাল পছন্দ রাজা সান্যালের। শীতে গ্রীষ্মে তাই গলায় টাই ঝুলিয়েই মাঝে মাঝে অফিস ফেরৎ আসে সে নীলের বাড়িতে। হলুদের উপর লাল ফুল আঁকা একটা বাটিকের কাজ করা টাই খুব পছন্দ রাজার। সেটা পড়েই আসে রাজা। দিন দুই আগে রাজা কড়া নাড়তে দরজা খুলেই অবাক রুমা। সেই টাইয়ের বদলে রাজার গলায় ঝুলছে একটা দড়ির মতো কালো ফিতে যার সঙ্গে বাঁধা একটা হলুদ কার্ড যাতে কোম্পানি আর রাজার নামধাম লেখা।

রুমা হেসে বলে— একি রাজাবাবু, গলায় এটা কিসের দড়ি? আপনার সেই লাল ফুলের কী হলো?

নির্বিকার ভাবে বলে রাজা— এখন থেকে এই-ই আমার হলুদ ফুল বৌদি। ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বলে নীল— ওটাকে দড়ি বলছ কেন রুমা? অফিস নিয়ম করেছে কোম্পানি স্টাফদের অফিস আওয়ার্সে ওই কার্ড ঝুলিয়ে রাখতে হবে গলায় যাতে বোঝা যায় এই কয়েকঘণ্টা তারা একান্তভাবেই শুধু কোম্পানির লোক— প্রায় সব কর্পোরেট হাউসেই কিন্তু এখন এই নিয়ম রুমা।

কথাটা ঠিক বোধগম্য না হওয়ায় রুমা বলে নীলের দিকে তাকিয়ে— তা তুমিও তো কোম্পানির লোক— কিন্তু তোমার তো—

কথাটা শেষ করার আগেই নীল চোখ টিপে দেওয়ায় রুমা কিছু বুঝতে না পেরে, আচমকা চুপ করে গিয়েও বিড়বিড় করে বলে রাজা সান্যালকে— তা আপনি টাইয়ের উপরই তো পরতে পারতেন ওটা।

নীল বলে— কী যে কথা তোমার, টাইয়ের উপরে কেউ কখনো পরে এসব? স্যাম্পেন আর পবিত্র চরণামৃত একসঙ্গে খাওয়া যায় নাকি!

বাপন একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল রাজাকে। পর্যবেক্ষণ করা ওর এক আশ্চর্য স্বভাব। যা কিছুই চোখে পড়বে ওর— লতাপাতা পাখি ফুল টিকটিকি ব্যাং— সবই হাঁ করে খালি দেখতে থাকবে। রাজার গলায় ঝোলানো ফিতে বাঁধা কার্ডটার দিকে আঙুল তুলে হঠাৎ কচি গলায় বলে— ওতা কি মা? ওতা কী?

রুমা বলে— ও কিছু নয় বাবা, চল, দুধ খাবে চল—

রাজা চলে গেলে রুমা বলে— এমা! কী বিচ্ছিরি!

তোমাদের অফিসের লোকদের এখন থেকে এরকম গলায় দড়ি ঝুলিয়ে থাকতে হবে নাকি? হি হি করে হেসে উঠে বলে রুমা— জানো, আমাদের দেশের গ্রামে দেখতাম কারও হাতে কোনো গোরুবাছুর মারা পড়লে সে গলায় এরকম দড়ি ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করত প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আর মুখে খালি হাম্বা হাম্বা শব্দ করত। তা অফিসে চাকরি করে তোমাদের রাজা সান্যাল গোহত্যার পাপ করল নাকি যে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? এরপর হাম্বা হাম্বা করে ডাকতেও হবে নাকি?

নীল বেশ বিরক্ত হয়ে বলে— ওঃ রুমা! এসব কথা আসছে কোত্থেকে? সব কর্পোরেট কোম্পানিগুলিই এখন এ নিয়ম করেছে। দিনের বাকি সময় তুমি কে, কী তোমার পরিচয় তা জানতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয় কোম্পানি। তুমি যেই হও না কেন— অফিস আওয়ার্সে তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি কোম্পানির মাইনে করা লোক। মাইনের প্রতিদানে তুমি কোম্পানিকে সার্ভিস দেবে। এতে অন্যায় কী হোলো? ভয়ে ভয়ে রুমা বলে— তার মানে? তোমাকেও এরকম গলায় দড়ি ঝোলাতে হবে নাকি? সেদিন আমিও গলায় দড়ি দেব কিন্তু বলে দিলাম।

নীল বলে— অবুঝের মতো কথা বোলো না রুমা। রাজার সামনে তোমাকে কেন চোখ টিপলাম বুঝলে না? অফিসের সবাইকেই গলায় কার্ড ঝোলাতে হবে কে বলল? লোয়ার গ্রেড স্টাফ যারা পার্টি আর ইউনিয়নের জোরে মাঝে মাঝে খোয়াব দেখতে ভালোবাসে যেন কোম্পানির আসল মালিক তারাই— তাদের তো বুঝিয়ে দিতে হবেই তাদের যথাযোগ্য জায়গা কোথায়। একজিকিউটিভ গ্রেডের এমপ্লয়ি যারা তারাই তো কোম্পানি চালায়। তাদেরও গলায় কার্ড ঝুলিয়ে মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি যে তারা কোম্পানির লোক? তাদেরও দারোয়ানদের মতো উর্দি পরতে হবে নাকি? চেনা বামুনের পৈতে দরকার হয় না রুমা।

রুমা আশ্বস্ত হয়ে বলে— যাই হোক বাবা, তোমাকে যে টাইয়ের বদলে ও জিনিষ গলায় ঝোলাতে হবে না তাতেই আমি খুশি। আগেও তো লোকে কোম্পানিতে চাকরি বাকরি করত। কই, তাদের তো এরকম গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলাতে হতো না।

নীল বলে— কী আশ্চর্য! তখন কি এরকম কর্পোরেট দুনিয়া ছিল! জিডিপির গ্রোথ এত ছিল নাকি তখন? তখন আর এখন এক হোল। আগে তো লোকে কাপড়ও পরত না।

ফুট কেটে বলে রুমা — ওরে বাব্বা। তোমাদের সব লজ্জা তবে শেষে গিয়ে গলায় উঠেছে নাকি?

এত সব তর্কাতর্কির কয়েকদিন পরেই ঘটল সেই ঘটনাটা। অফিস ফেরত রাজা সান্যাল এসেছিল নীলের কাছে কয়েকটা জরুরি চিঠির ডিকটেশন নেওয়ার জন্য। গলার তার সেই ঝোলানো ফিতে। টেবিলে বসে কথা বলছিল ওরা। হঠাৎ একটা জরুরি ড্রাফ্ট ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছে ডাইনিং হলের এককোণে একটা আলমারির নিচে। রাজা সান্যাল মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে আলমারির নিচ থেকে কাগজটা কোনোরকমে বের করার চেষ্টা করছে— গলায় লম্বা ফিতে থেকে ঝুলছে তার কার্ডটা। হঠাৎ টলমল পায়ে বাপন কোত্থেকে ছুটে এসেই দুহাতে রাজার গলার চেন ধরে টানতে থাকে আর মুখে আওয়াজ করতে থাকে চু-চু—

রুমা রান্নাঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দ্যাখে এই দৃশ্য। ডগি-র বকলস ধরে মাঝে মাঝে যেমনি টানে বাপন হামাগুড়ি দেওয়া রাজার গলায় কার্ডটা ধরেও ঠিক তেমনি টানছে। রাজার ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে— কিন্তু বস-এর বাড়িতে বলে তো আর বস-এর ছেলেকেই ধমকানো যায় না। তার উপরে সে নিতান্তই অবোধ শিশু। অগত্যা এটা যেন নিতান্তই একটা মজার খেলা এভাবে রাজাকে খানিকটা হামাগুড়ি দিতে হয়। সামনে আর বাপন মজা পেয়ে মুখে শব্দ করতেই থাকে চু-চু-চু—

খাটের পায়ায় বাঁধা ডগি জিভ বের করে দেখতে থাকে এই দৃশ্য। হঠাৎ মনে হতে পারে যে যেন হাসছে। —এ্যাই বাপন অসভ্য ছেলে— কী বাঁদরামি হচ্ছে এসব। রুমি এগিয়ে এসে ঠাস করে একটা চড় মারে বাপনের গালে। এক হ্যাঁচকায় হাতটা ছাড়িয়ে এনে রাজাকে বলে— ছি ছি কিছু মনে করবেন না রাজাবাবু— এত অসভ্য জংলি হয়েছে আমার ছেলেটা— লজ্জায় মুখ দেখানো দায় আমার।

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে শুকনো হাসি হেসে বলে— না, না বৌদি ও তো বাচ্চা ছেলে— ওর আর অপরাধ কী?

অর্থাৎ অপরাধ যেন অন্য কারও একটা আছে— কিন্তু তা যে কার তা অনুক্তই থাকে।

মুখে যাই বলুক ভিতরে ভিতরে সে যে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছে তার প্রমাণ— কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলে রাজা সান্যাল— স্যার আজ থাক। কাল অফিসে গিয়ে করব বাকি কাজটা।

নিঃশব্দে চলে যায় রাজা। রাজা চলে গেলে রুমা নীলের দিকে তাকিয়ে বলে— এবার বুঝলে তো বাপন সেদিন এত নজর করে কী দেখছিল— কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজছিল গলার দড়ি ঝোলানো রাজা সান্যালের। ইস্ ভদ্রলোকের মুখের ভাবটা কেমন হয়ে গিয়েছিল যদি দেখতে— ঠিক যেন আমাদের ডগি-র মতো। মানুষ থেকে একেবারে কুকুর হয়ে যাওয়াটা কম ঝক্কির ব্যাপার নাকি? বাপনকে যখন সরিয়ে নিলাম তখন তার মুখে যে কি করুণ কৃতজ্ঞতার চাউনি। উঃ ভাবলেই আমার পেট ফুলিয়ে হাসি উঠে আসছে— মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসতে থাকে রুমা।

নীল বলে— সত্যি ভারি বিচ্ছিরি হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

রুমা বলে— তোমাদের কোনো স্টাফ কখনো আপত্তি করেনি ও জিনিস গলায় ঝোলাতে?

— দু-একজন করেছিল মৃদু আপত্তি। তারা বলেছিল অফিসের কাজ তারা ঠিকমতোই করবে কিন্তু ওই কার্ড তারা গলায় ঝোলাতে পারবে না— এ ব্যাপারে তারা অপারগ।

— তারপর?

— যারা আপত্তি করেছিল কোম্পানি তাদের দুজনকে স্যাক করে— বাকিরা তারপর অবশ্য সব মেনে নিয়েছে।

রুমা বলে — যাক্ বাবা, তুমি তো বেঁচে গিয়েছ। তোমাকে দেখে তো আর আমাকে এরকম হাসতে হবে না কখনো—

আত্মতৃপ্তির সুরে নীল বলে— সেটা কারও দয়া নয় রুমা, আমাকে এই পজিশনে উঠতে হয়েছে নিজের যোগ্যতায়। ক্রিয়েটিভ একজিকিউটিভ আমি ফাঁকেতালে হইনি। কোম্পানি বাধ্য হয়েছে আমার যোগ্য মর্যাদা আমাকে দিতে। কোম্পানি বোঝে কার স্থান কোথায়—

রুমা বলে— ভাগ্যিস বোঝে, নাহলে তোমার গলায়ও দড়ি ঝুলছে আর তুমিও চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছ... দৃশ্যটা ভাবলেই...

কথা শেষ করতে পারে না রুমি আবার কলকল করে হাসতে থাকে। এই হোলো রুমার আজব হাসির ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাস যেমন ইতিহাস থেকে জাত তেমনি ইতিহাস ইতিহাসের জনকও তো বটে।

এরই কয়েকদিন পর নীল অফিস থেকে ফিরে আসে প্রায় কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ির মতো মুখ করে। সারারাত হুঁ হাঁ ছাড়া প্রায় আর কোনো কথাই বলে না রুমার সঙ্গে।

রুমা বলে— ঠোঁটে সেলোটেপ আটকিয়েছ যে, হোলো কী তোমার? শরীরটরীর খারাপ, নাকি অপিসের কোনো গন্ডগোল?

নীল এড়িয়ে যায়— না, না। সে সব কিছু নয়। কাজের চাপ পড়ে গেছে খুব।

রুমা বলে— ও মা তাতে কী হলো? তুমি তো বল কাজের জন্যই কোম্পানি তোমাকে মাইনে দেয়। তা কোম্পানি তোমাকে মাইনে দেবে না বলেছে বুঝি?

রুমার এই হালকা টিপ্পনির উত্তরে কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যায় নীল। কী একটা কথা সে রুমাকে বলতে গিয়েও যেন বলতে পারছে না। পরদিন ছুটি কিন্তু নীল গম্ভীর হয়ে থাকে সারাদিন। মাঝে মাঝে আড়চোখে নজর করে দ্যাখে রুমাকে। রাতে বিছানায় ঘুমে কাদা বাপন। বিছানার উপর উঠে বসে বলে রুমা— এ্যাই তোমার হয়েছে কী শুনি— দু'দিন ধরে একেবারে স্পীকটি নট— মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছ আমাকে আর আমি তাকালেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছ— ছেলেরা নতুন প্রেমে পড়লে তো দেখেছি মেয়েদের দিকে বোকা বোকা চোখে তাকায় এরকম। এ বয়সে নতুন করে প্রেমে পড়তে চাইছ নাকি আমার সঙ্গে? তা আর হবে না বলে দিলাম।

নীল কোনো কথা না বলে তোষকের নিচে এতক্ষণ গোপনে লুকিয়ে রাখা একটা জিনিস মুঠোয় করে বের করে এনে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে— কাল থেকে আমাকেও এটা গলায় পরে অফিসে বেরুতে হবে। তাই ভাবছিলাম তুমি আবার কী বলবে— তা ভেবেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার।

রুমা দ্যাখে একটা ঝকঝকে সরু চেন তাতে ঝোলানো একটা প্লাস্টিকের কার্ড যাতে ড্রিমেজিনেশন কোম্পানির লোগো এমবস্ করা আর নীলের নাম সোনালি অক্ষরে বেশ বড় বড় করে লেখা।

বিস্ময়ে রুমা বলে — মানে? এই যে সেদিন বলেছিলে কোম্পানি চালায় যাদের তাদের জন্যই শুধু এসব দড়াদড়ির ব্যবস্থা— কোম্পানি চালায় যারা তাদের জন্য নয়—

—তাই ঠিক ছিল রুমা কিন্তু লাস্ট বোর্ড মীটিংয়ে ম্যানেজমেন্ট হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছোটো বড় সব স্টাফই আসলে কোম্পানির সার্ভেন্ট তাই সবার জন্যই এখন থেকে একই ব্যবস্থা। এতে কোম্পানির প্রতি স্টাফেদের আনুগত্য বা সেনস অব বিলংগিং আরও বাড়বে। তাতে কোম্পানির উন্নতি— ফলে সবারই উন্নতি।

রুমা বলে— তোমরা কেউ আপত্তি করলে না?

নীল বলে— কেন আপত্তি করব না? তাও কখনো হয়? আমরা সিনিয়ার স্টাফ যারা সবাই মিলে প্রতিবাদ করলাম যে কার্ড যদি গলায় ঝোলাতেই হয় তাহলে সাবঅর্ডিনেট স্টাফের মতো ওরকম খেলো কালো ফিতের নয়, দামী মেটালের চেন ঝোলাতে দিতে হবে যাতে বোঝা যায় তাদের অন্তত একটা আলাদা আইডেনটিটি আলাদা মর্যাদা আছে।

সন্তোষের হাসি হেসে বলে নীল— আমাদের চাপের কাছে কিন্তু শেষ অবধি সারেন্ডার করতে হোলো ম্যানেজমেন্টকে। ম্যানেজমেন্ট শেষ অবধি আমাকেই দায়িত্ব দিয়ে বলল— এমন একটা চেন ডিজাইন করে দাও যা পরতে কারুর কোনো আপত্তি হবে না। এই যে দেখছ এটা কিন্তু আমারই ডিজাইন করা। আমি গলায় পরছি দ্যাখো; ঠিক মনে হবে যেন রাজার গলার হার। মহাভারতের সিরিয়াল দ্যাখো নি— আগেকার দিনের রাজরাজারাও তো সোনারূপোর হার পরত গলায়। তা কয়েকঘণ্টা রাজা সেজে থাকতে আপত্তি বা কি?

চেনটা নীল পরে নেয় তার গলায়। রুমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন প্রশংসা-লোভী শিশুর চোখে তাকায়—

কেমন? খুব সুন্দর ডিজাইন না? এই ডিজাইনটা সবাই গলায় ঝোলাতে শেষ অবধি রাজি হয়েছে বলে কোম্পানি আমাকে একটা রিওয়ার্ড দেওয়ার কথাও ভাবছে—

অবাক গলায় রুমা বলে — তাই বুঝি?

যেন তারিয়ে তারিয়ে এবার দেখতে থাকে ওকে রুমা।

আস্তে আস্তে ওর চোখের দৃষ্টিতে কেমন মুগ্ধতা ফুটে উঠতে থাকে। মুখে হাতচাপা দিয়ে শেষে খিলখিল হেসে উঠে বলে— না! সত্যি খাসা ডিজাইন হয়েছে তোমার চেনের। ইস্ মুকুট মাথায় থাকলে একেবারে সত্যিকারের রাজার মতোই দেখতে লাগত বটে তবে পুরু না আলেকজান্ডার তা জানি না।

রুমার লঘু রসিকতায় ভয়মুক্ত নীল বলে— ইয়ার্কি হচ্ছে খুব তাই না? উঃ আমার তো খুব টেনশনই হচ্ছিল এটা নিয়ে আবার কী শুরু করবে তুমি।

রুমা বলে— না, না। কী শুরু করব? তুমি রাজা আর আমি তোমার পাটরানি— এটা তো আর ইয়ার্কি না। এ্যাই শোনো রিওয়ার্ড তোমাকে কী দেবে কোম্পানি জানো?

—শুনছি তো গোটা তিনেক অ্যাডভান্সড ইনক্রিমেন্ট প্রায় দশ মাসের এরিয়ার সহ। ভাবছি থোক টাকাটা হাতে পেলে ঘুরে আসব তিনজনে কোথাও। জিডিপি বাড়ছে রুমা, দেশের উন্নতি হচ্ছে। মানুষের হাতে অনেক টাকা। বাইরে যাচ্ছে অনেকেই বেড়াতে— পৃথিবীটা এসে যাচ্ছে মানুষের হাতের মুঠোয়। আগেরবার প্রমোশন পেয়ে বিলিতি কুকুর কিনেছিলাম— এবার ভাবছি বিলেতেই চলে যাব সপ্তাহখানেকের জন্য। অনেকেই যখন যাচ্ছে তখন না গেলে নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগে।

অকৃত্রিম খুশিতে এতক্ষণে বলে রুমা— সত্যি বিলেত যাবে? কী মজা? জানো সদ্য জাকার্তা ঘুরে এসেছে ওদিকের ফ্ল্যাটের এক মহিলা। সেদিন শপিং মলে আলাপ হওয়ার পর বাপরে বাপ এক ঘণ্টা ধরে শুধু জাকার্তার গল্প— ছিনে জোঁকের মতো। আমাকে আর ছাড়তেই চায় না— জাকার্তার গল্প সে আমাকে শোনাবেই শোনাবে। বোঝো, জাকার্তা আবার একটা বেড়াবার জায়গা। ফড়িংও পাখি। এরপর ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে ওকে আমি বিলেতের গল্প শোনাব। বল— মজা হবে না? ও আমাকে এক ঘণ্টা জাকার্তার গল্প শুনিয়েছে আমি ওকে দু'ঘণ্টা বিলেতের গল্প শোনাব।

খিলখিল করে হাসে রুমা। নীলও খুশিমনে হাসে। রুমা খুশিতে খুশিতে ঘন হয়ে নীলের কাছে এগিয়ে এসে ওর গালে আলতো ঠোনা মেরে বলে— খোকামণির স্টার খুব ভালো দেখছি— উন্নতির পর উন্নতি।

নীল রুমার গাল আলতো টিপে আদর করে বলে— তুমি খুশি তো রুমা—

রুমা হেসে বলে— তা একটু খুশি তো বটেই রাজা মশাই।

নীল আবেগঘন গলায় বলে— খুব ফাজিল হয়েছ কিন্তু তুমি— চল, অনেক রাত হয়েছে এবার শুয়ে পড়ি।

আলো নিভিয়ে দেয় নীল— বাপন ঘুমে কাদা বিছানায়। নীল শুয়ে পড়ে কিন্তু রুমা অন্ধকারে বসেই থাকে ভূতের মতো।

নীল মৃদু আকর্ষণ করে রুমাকে— কী হলো, শোও না বাবা— রুমা সে আকর্ষণে সাড়া না দিয়ে হঠাৎ যেন অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে বলে ওঠার মতো বলে উঠল— শোনো একটা কথা বলি—

নীল অধীরস্বরে বলে— কথা পরে হবে, শোও না বাবা এখন। রুমা অনেক দূর থেকেই যেন সেভাবে বলে ওঠে— শোনো, তুমি ওটা পরে কিন্তু কখনো বাপনের কাছে যাবে না। বাপন তো বুঝবে না কোনটা দড়ি কোনটা রুপোর চেন— সেও যদি শেষে তোমার চেন টেনে ধরে অমনি চু-চু করে—

নীল এবার হো হো করে হেসে উঠে বলে— ওঃ। এই ব্যাপার। আরে বাবা, দু'দিন আমার গলায় ঝোলানো এ-জিনিস দেখলে ওর চোখে সয়ে যাবে— যেমনি ভাবে আমাদের সয়ে যায় সব কিছু। তখন আর কুকুর ভেবে বেচারি ভুল করবে না আমাদের। বুঝবে আমরা আসলে মানুষই।

রুমা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চায়। বলে— যাক বাবা, বুঝলেই নিশ্চিন্তি— রাজা সান্ন্যালের চেন সেদিন এমনভাবে টানছিল বাপন যেন মনে হচ্ছিল সত্যি সে কুকুর —

— আর ওর মনে হবে না। নাও শোও এখন। আর বকবক করতে ভালো লাগছে না।

গাঢ় অন্ধকারে তারপর দুজনে পাশাপাশি ঘন হয়ে শুয়ে থেকে যে যার মতো নিজস্ব স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে দেখতে যে ঘুমিয়ে পড়ে তাই কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না যে তারা আসলে কিন্তু মানুষই? কেননা, কুকুরেরা এখনো অবধি সম্ভবত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে শেখেনি।

গল্প

আর্তি

সঞ্জীব আচার্য

একুশে মার্চ ২০১২। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ। এবারের আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে UNO-র অনুষ্ঠান দিল্লীতে। উন্নয়নের রথে চেপে তরতরিয়ে এগিয়ে আসা ভারতকে স্বীকৃতি দিতে এই সম্মান প্রদর্শন। কানাডাও এবারের অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন করেছিলো। কিন্তু আমেরিকার সমর্থন ভারতের দিকে হওয়ায় ভারতই পেলো। আর শুধু নয় শতাংশ বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, ভারত যে ক্রমশ সব বিষয়েই উঠে আসছে তার প্রমাণ দিতে ভারত সরকারও এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনদিন ধরে অনুষ্ঠান চলবে। একসাথে ৮-১০টা সেমিনারও চলবে। পুরোটাই যাতে একটা কমপ্লেক্সে করা যায় তাই দিল্লীর লোধী রোডের উপর 'ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টার'-কে বাছা হয়েছে। স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন। ১০ একর জমির উপর তৈরি এই সেন্টার। বিলাসবহুল থাকার জায়গা আর প্রোগ্রামের জন্য ১৫টি ছোট বড় হল এবং তিনটি খোলা প্রাঙ্গণ। উপযুক্ত জায়গা। খরচও বিশাল। বিল্ডিংগুলোর বাইরের স্থাপত্য প্রাচীন ব্রিটিশ ঘরানার আর ভিতরটা আধুনিকতার চূড়ান্ত। নাক উঁচুরা অনেকে অবশ্য বলেন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সামন্ততন্ত্রের জগাখিচুড়ি। যাইহোক আজ ব্যস্ততা তুঙ্গে। সকাল ১০টায় ইরাবতী হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রায় ১ হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি থাকবেন। মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন UNO, ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক নারী সমিতির তাবড় ব্যক্তিত্ব। নিরাপত্তা ও আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না। আয়োজকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। অতিথিদের থাকবার জায়গা থেকে শুরু করে বিশেষ অতিথিদের বিশেষ আবদার— সবই সামলাতে হচ্ছে। ভারতের তরফে আয়োজকদের প্রধান সুমনা থাপার বর্তমানে দিল্লীর বাসিন্দা। নারী আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। বহু আইনি লড়াইয়ে দিল্লীর সরকারি মহলে যাতায়াতের ফলে দিল্লীতে পরিচিত নাম। প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে গত কয়েকমাস। আয়োজকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশের তক্মা পুরোপুরি পেতে গেলে দেশে 'মহিলাদের সম্মাননার মাত্রা' প্রমাণ করা দরকার। তাই আয়োজনে কোনও ত্রুটি নেই। নামকরা ক্যাটারার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনে। ডেকরেশনে দিল্লীর নামী সংস্থা। সবার আশা 'ভারত আবার জগৎ সভায়...'।

এই আশা নিয়ে ঠিক দশটায় শুরু হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মঞ্চে রয়েছেন ৫ জন। UNO-র সভাপতি, আন্তর্জাতিক নারী সমিতির সভানেত্রী, ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, ভারতের নারী সমিতির সভানেত্রী এবং আয়োজকদের তরফে সুমনা থাপার। UNO-র সভাপতির ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একে একে বাকি অতিথিরাও বললেন। সুমনা থাপার জানিয়ে দিলেন মূল অনুষ্ঠানে ইউরোপ, আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ), আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে একজন করে প্রতিনিধি তাদের আন্দোলনের সমস্যা নিয়ে বলবেন। আয়োজক দেশ হিসাবে ভারতেরও একজন প্রতিনিধি বলার সুযোগ পাবেন। সকলেই ইংরাজিতে বলবেন।

UNO-র সভাপতি তার ভাষণে যে কোনও দেশের মহিলাদের অবদানের কথা তুলে ধরলেন। UNO-র অগ্রাধিকারের তালিকায় নারীর অধিকার যে প্রথম সারিতে সে কথাও তুললেন। ভারতে নারীদের মাতৃতুল্য সম্মানের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের বন্দনা করে ভারত সরকারকে দেদার ধন্যবাদও দিলেন। এরপর শুরু বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের তাদের দেশের নারীদের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য। UNO-র প্রতিনিধি তার বক্তব্যে অনুরোধ করেন যে, প্রত্যেক বক্তা যেন তাদের সমস্যাগুলোকে উদাহরণ ও নির্দিষ্ট ঘটনার সহযোগে বলেন যাতে সেগুলিকে রেফার করে তারা রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করলেন জেসি। ফ্রান্সের। অত্যন্ত গোছালো ভঙ্গিতে কাটা কাটা ইংরাজিতে তিনি বললেন, "আপনারা অনেকে হয়তো মনে করেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মহিলারা সমানাধিকার পান। অত্যন্ত ভুল ধারণা। এখনও আমাদের দেশে পুরুষদেরই আধিপত্য। বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে একজন পুরুষ যা করতে পারে আমরা তা পারি না। অথচ মুখে বলা হচ্ছে নারী-পুরুষ সমান অধিকার। আমরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।" মহিলার ভঙ্গিমায় এমন একটা নির্যাতিতার সুর ছিলো যে, হল শুদ্ধু আওয়াজ উঠল 'শেম শেম্'...। এরপর বলতে উঠলেন এশিয়ার প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্যেও নারীপুরুষে অধিকারের বৈষম্যের কথা উঠে এলো। কর্মরতা মহিলারা আজও ঘরের কাজ থেকে কোনও ছুটি পান না। এখনও পুরুষের ঘরকন্নার কাজে মহিলাদের সাহায্য করার দায় নেয় না। অফিস থেকে ফিরে রান্নার দায়িত্ব মহিলাদেরই অথচ মহিলার রোজগার ভোগ করার ক্ষেত্রে পুরুষের কোনও লজ্জা নেই। কুণ্ঠা নেই। এ বৈষম্য নিয়েও পুরো সভা সরব হলো। একে একে আফ্রিকা, আমেরিকা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা তাদের দেশে নারীদের প্রতি বঞ্চনার কথা তুলে ধরলেন। এক এক দেশে বৈষম্যও এক এক রকম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেষ বক্তা ভারতের। আয়োজক দেশের। বক্তার নাম ইনিতা। মনিপুরের বাসিন্দা। দিল্লীর নেহরু কলেজের উজ্জ্বল ছাত্রী। ইনিতাকে মঞ্চে ডাকলেন সুমনা থাপার। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ইনিতা

ধীর স্বরে সবাইকে সম্ভাষণ করে বলতে শুরু করলেন। ''আমি আমাদের দেশের একটি রাজ্যে নারীদের উপর একটি বিশেষ বৈষম্যের কথা আপনাদের শোনাবো। এই বৈষম্য বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। আমার বাড়ী মণিপুরে। গ্রামের নাম খালং। পড়াশুনার জন্য আমি গত তিন বছর দিল্লীতে। আমার তখন বয়স ১৪ বছর। ক্লাস নাইনে পড়ি। আমরা বাড়ীতে ছিলাম চারজন। মা, বাবা, আমার দিদি মনোরমা আর আমি। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসের রাত। সন্ধ্যার পরই গ্রামে লোকজন ঘরে ঢুকে যায়। এমনিতেই আমাদের চলাফেরা খুব সাবধানে করতে হয়। সারা রাজ্যেই সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা জঙ্গি ধরার জন্য রাইফেল উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে। পান থেকে চুন খসলেই রক্ষা নেই। তাই সন্ধ্যার পর ওখানে কেউ বাইরে বেরোয় না। আমরাও সেদিন রাত ৮টায় খেয়ে দেয়ে বিছানায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। দিদি কলেজের পড়া তৈরি করার জন্য জেগে রয়েছে। এমন সময় হঠাৎ দরজায় দুমদাম লাথির আওয়াজ। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলতেই পাঁচ ছ জন মিলিটারীর জওয়ান ঘরে ঢুকে পড়লো। জংলা ছাপের উর্দি। হাতে আধুনিক অস্ত্র। বাবা জানতে চাইলেন কী হয়েছে। তারা বাবাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়লো। আমরা হতভম্ব। আমরা এতদিন বাড়ীতে জওয়ানদের সার্চ করার নামে জুলুমের ঘটনা শুনেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা ছিলো না। এমনিতে বাড়ীতে আমরা দুজন মেয়ে ছিলাম বলে বাবা মা কিছুটা নিরাপদ বোধ করতেন। কেন না মণিপুরে বাড়ীতে জোয়ান ছেলে থাকলেই আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়। জঙ্গি বলে মিলিটারি ধরে নিয়ে যেতে পারে যখন তখন। কিন্তু আমরা তো দুজন মেয়ে। অবাক হয়ে দেখি দুজন জওয়ান দিদির হাত ধরে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসছে। বাকী জওয়ানেরা বাবাকে হিন্দীতে বলছে দিদি কলেজে জঙ্গিদের সাথে মিশছে। দিদি নাকি সন্ত্রাসবাদী। বাবা আকুল স্বরে বোঝানোর চেষ্টা করছে—'এসব মিথ্যা। আমার মেয়ে বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। কোনও রকম আন্দোলনের সাথেই ও যুক্ত নয়'। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দিদিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। দিদি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে। চারজন জওয়ান চ্যাংদোলা করে তুলে নিলো দিদিকে। মা ছাড়াতে গেলে একজন সজোরে ঠেলে দিলো মাকে। বাবা ঘাবড়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। আমি ভয় পেয়ে কথাও বলতে পারছি না। গলা থেকে স্বর বেরোচ্ছে না। ওরা দিদিকে বার করে নিয়ে বাইরে থেকে আমাদের দরজা বন্ধ করে দিলো। বাইরের গেট খোলার আওয়াজ কানে এলো। ভিতরে আমরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে। মা ভয়ে, আশঙ্কায় চোখ বুঁজে ফেললো। আমার মনে পড়ে গেলো ইথোবার কথা। ইথোবা আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। গত সপ্তাহেই জওয়ানেরা এসে ওকে তুলে নিয়ে বাইরে বের করে গুলি করে মারে। পরে বলে ও জঙ্গি ছিলো। শুধুমাত্র সন্দেহ করলেই মেরে ফেলা যায় আমাদের রাজ্যে। আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট চালু আমাদের রাজ্যে। সবাই সংক্ষেপে ওই আইনকে AFSPA বলে। এই আইনের বলে সেনা জওয়ানেরা সন্দেহ করলেই কাউকে মেরে ফেলতে পারে। আমরাও মনে মনে শিউরে উঠছি দিদির কথা ভেবে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। জানি এরপর একটা গুলির আওয়াজ আর আমার দিদির ঠান্ডা নিথর দেহ। যেমন ইথোবার হয়েছিলো। কিন্তু গুলির আওয়াজ তো আসছে না। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চোখে জিজ্ঞাসা। কই গুলির আওয়াজ আসছে না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই দিদিকে মারে নি। একটু স্বস্তি পেতে চায় বুকটা। আশায়—আশঙ্কায় দরজায় কান পাতি। দিদির গলার আওয়াজ যদি পাই। পেলাম। মনে হলো দিদি গোঙাচ্ছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এসব করো না। দোহাই, আমাকে তোমরা মেরে ফেলো। তাহলে কি ওরা দিদিকে — মাগো! ভাবতেও ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন আমাকেই— আমি দুহাতে নিজেকে আগলাবার চেষ্টা করি। মা বাবা আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। সংবিত ভাঙে একটা গুলির আওয়াজ। আর একটা মরণ চিৎকার— 'মাগো'— সেই গুলির আওয়াজে। অনেকক্ষণ ধরে যে আওয়াজের অপেক্ষায় তিনজনে ঘরে বন্দী হয়েছিলাম। পরস্পরকে ছেড়ে ছিটকে যাই। যে যার মাটিতে। আশঙ্কার শেষ। কিন্তু আবার গুলির আওয়াজ। একসাথে অনেকগুলি পরপর। থামেই না। তাহলে কি অন্য কেউ এলো। জওয়ানদের কি কেউ তাহলে মারলো। মেরেছে কি? ভাবতে ভাবতে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ। ঘরে বন্দী আমরা তিনজন। বাইরে শান্তিতে শুয়ে আমার দিদি। অনেকক্ষণ পর পাড়ার কেউ এসে দরজা খুললো। ছুটে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে দিদিকে দেখতে গেলাম। দেখি বাড়ীর গেটের বাইরে চিৎ হয়ে শুয়ে আমার দিদি—মনোরমা থাংজম। বুকের বাঁদিকে একটা ছোট্ট ফুটো। গুলির। আর কোমরের নীচেটা অসংখ্য গুলিতে ছিন্নভিন্ন। রক্তে মাখামাখি। শরীরের কাপড় ছিন্নভিন্ন। সারা শরীরে আঁচড় আর কামড়ের দাপাদাপি। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দিদির শরীরের উপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল দেখি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরের মধ্যে অনেক লোকজন। খবরের কাগজের লোকজনও রয়েছে। দেখি বাবার হাতে একটা স্থানীয় সংবাদপত্র। শিরোনামে দিদি— 'অসম রাইফেলসের জওয়ানদের হাতে মনোরমার মৃত্যু। হত্যার আগে ধর্ষণের অভিযোগ।'—শিরোনাম দেখেই ওই ভয়ঙ্কর রাতের কথা মনে পড়ে গেলো— আবার জ্ঞান হারালাম— তার পরের ঘটনা তো সবাই জানেন।''

ইনিতা একটানা যখন ঘটনাটা বলে গেলো। পুরো হল নিশ্চুপ। ইনিতা থামতেই চঞ্চলতা শুরু হলো। সভার মাঝখান থেকে একজন বলে উঠলো, ''এ অসম্ভব। সন্দেহ হলেই গুলি

করে মারা যাবে। বার্বারিয়ান! জংলি দেশে কোনও আইন নেই। এ হতে পারে না—''। ইনিতা বিনম্র কণ্ঠে বলে ওঠে, ''আইন আছে বলেই তো জওয়ানেরা এত সাহস পায়। আইনই ওদের বাঁচায় আর আমাদের মরবার জন্য তৈরি থাকতে বলে। আমি Armed Forces Special Power Act-র কথা আগেই বলেছি। ঐ আইন আমাদের রাজ্যে লাগু আছে। ঐ আইনের চার নং ধারায় বলা আছে, ''হাবিলদার পদের কোন পুলিশও যদি কাউকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে সন্দেহ করে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারে—।''

''শুধুমাত্র সন্দেহ করলেই মারা যাবে! তদন্ত বা প্রমাণের দরকার নেই!'' হল থেকে উত্তেজিত হয়ে একজন প্রশ্ন করে। ''হ্যাঁ, শুধুমাত্র সন্দেহ করলেই মেরে ফেলা যাবে। তদন্ত বা প্রমাণের দরকার নেই। এটাই ওই আইনের ক্ষমতা।'' "It is State Terror"— বিদগ্ধ কেউ গম্ভীর গলায় বলে। অভিযোগটা রাষ্ট্রের দিকে যাচ্ছে দেখে মঞ্চে বসা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী নড়ে চড়ে বসেন। কিছুটা প্রশমিত করার চেষ্টায় বলেন, ''না না, আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। এখানে বিচার ব্যবস্থায় যে কেউ বিচার চাইতে পারে। এটা ঠিক বলা হচ্ছে না।'' ইনিতা হাতদুটো বুকের কাছে এনে যথাসম্ভব বিনয়ের সাথে বলে, ''না ম্যাডাম— সম্ভবত আপনি এই আইনের চেহারাটা জানেন না। এই আইন যে অঞ্চলে চালু থাকবে সেখানে সেনা জওয়ানদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে মামলা করা যাবে না। জওয়ানদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। যেটা কোনওদিনই পাওয়া যায় নি। কারণ সরকারের হাত ওদের মাথায়। আজ পর্যন্ত মণিপুরে কয়েকশো মানুষ জওয়ানের গুলিতে মরেছে। কিন্তু একজনেরও শাস্তি হয়নি।''

''কিন্তু এরকম একটা ঘটনা তোমার দিদির সাথে ঘটলো আর কোনও প্রতিবাদ হলো না!'' একজন আফ্রিকার প্রতিনিধি জানতে চায়।

''প্রতিবাদ হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে। আমাদের রাজ্যের মায়েরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অসম রাইফেলসের সদর দপ্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে চিৎকার করেছে— 'এসো জওয়ানেরা আমাদের ধর্ষণ করো— আমাদের মেয়েদের ছেড়ে দাও'— দশজন পঞ্চাশোর্ধ মহিলার এই প্রতিবাদ আজও মণিপুরের আকাশে বাতাসে ফুঁপিয়ে কাঁদে।''

''কিন্তু একটা সংগঠিত প্রতিবাদ দরকার''— UNO-র প্রতিনিধি বলে ওঠেন।

''গত বারো বছর ধরে আমাদের রাজ্য থেকে এই আইন তুলে নেওয়ার দাবিতে শর্মিলা ছানু অনশন চালাচ্ছেন। শুধুমাত্র একটাই দাবি। মণিপুর থেকে AFSPA-র কালা আইন তুলে নিতে হবে। ২০০২ সালে একটি বাসস্ট্যান্ডে একটা গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ায় পর মিলিটারিরা বোমা ফেটেছে সন্দেহ করে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা নিরীহ দশজনকে নির্বিচারে গুলি করে মারে। সেই ঘটনা দেখার পর শর্মিলা অনশনে বসে। এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে। আজও চলছে তার অনশন। কিন্তু আইন তোলা হয়নি।''— UNO-র প্রতিনিধিরা কথার উত্তরে শর্মিলার অদম্য লড়াইয়ের কথা তুলে ধরে ইনিতা।

সমস্ত হল তখন আরও প্রশ্ন করতে চাইছে। ''বারো বছর ধরে অনশন'', ''সন্দেহ করলেই হত্যা''—এরকম একগাদা প্রশ্ন।

আলোচনায় ভারত সরকার বারবার কাঠগড়ায় চলে আসছে দেখে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলে ওঠেন, ''কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নারীর অধিকার, নারীর প্রতি বৈষম্য। সন্ত্রাস দমন-আইন-জঙ্গি— এসব বিষয়ে আলোচনার মঞ্চ এটা নয়। আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফেরা দরকার।'' বিষয়টা অন্য মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে দেখে মন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের নারী সমিতির সভানেত্রী বলে ওঠেন, ''হ্যাঁ, তোমার দিদির ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু এ ঘটনার নারীর প্রতি বৈষম্য কিভাবে হলো বোঝা গেল না। আমারও মনে হয় আমাদের নারীদের অধিকার বিষয়ে ফেরা দরকার। এই ঘটনায় নারীদের আন্দোলনের সাথে যোগ কোথায়?''

''কেন ওই যে বাড়তি ২৬টা গুলি''— ইনিতা দৃঢ়ভাবে বলে ওঠে। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

''আমাদের পাশের গ্রামের ইথোবাকে মেরেছিলো একটা গুলিতে। আর দিদিকে একটা গুলিতে মারাব পর মৃতদেহের উপর বাড়তি ২৬টা গুলি বিঁধে দেয়। —এটা বৈষম্য নয়? দিদিকে মারার আগে ধর্ষণ করেছিলো জওয়ানেরা। ধর্ষণের প্রমাণ লোপাট করার জন্য নিম্নাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দেয় আরও ২৬টা গুলিতে। দিদি একজন মহিলা বলেই এই বৈষম্যের শিকার। নাহলে ইথোবার মতো একটা গুলিই বরাদ্দ হতো দিদির জন্য। আমরা মণিপুরের ছেলেমেয়েরা জানি, AFSPA যতদিন আমাদের রাজ্যে থাকবে ততদিন আমাদের প্রাণ জওয়ানদের হাতে। চাইলেই তারা শুধু সন্দেহবশেই আমাদের মারতে পারে। আমরা যারা মেয়ে তারা এটাও জানি যে মারবার আগে জওয়ানেরা আমাদের শরীরটাকে নিয়ে ভোগ করবে। যাকে কিছুক্ষণ বাদে গুলি করে মারবে তার আর শরীর সম্মান-এর মূল্য কী? কিন্তু তা বলে মারার পর মৃতদেহের উপর আবারও গুলি। সেটা তো শুধু মেয়েদের জন্য। ছেলেদের মুক্তি। এটা কি মেয়েদের প্রতি বৈষম্য নয়?''

ইনিতার বলার দৃঢ়তায় সমস্ত সভা নীরবে এই বৈষম্যের স্বীকৃতি দেয় বোধহয়। ঘাবড়ে গিয়ে UNO-র প্রতিনিধি বলে ওঠেন, ''কিন্তু এই সভা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কী করবে?'' ইনিতা বলে ওঠে— ''অবশ্যই এই সভার করার আছে। এই বৈষম্য দূর করার জন্য সভার দাবি তোলা দরকার। আমি আপনাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা বলে বিব্রত করবো না। অস্ত্র নিয়েও নয়, শর্মিলার মতো অনশন করেও নয়। শর্মিলা ২২ বছর ধরে অনশন করেও এই আইন তুলতে পারে

নি। আমি তাই আইন তোলার কথা বলছি না। আমি রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেই এই বৈষম্য দূর করার কথা বলছি। সেটাই তো এই সভার স্পিরিটের সাথে মানাবে। দেখুন, AFSPA আইনে জওয়ানদের জঙ্গি সন্দেহে হত্যা করবার অধিকার দিয়েছে, তাই তারা হত্যা করার পর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে না। শুধু বিবৃতি দিয়ে দেয় নিহত ব্যক্তি জঙ্গি ছিলো। কিন্তু AFSPA আইনে জঙ্গি সন্দেহ করলে কোনও মহিলাকে মারার আগে ধর্ষণ করার অধিকার দেওয়া নেই। তাই ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য অতিরিক্ত গুলি বিঁধতে হয়। এতে রাষ্ট্রেরও খরচ বাড়ে আর নারীর প্রতি বৈষম্য হয়। তাই আমার প্রস্তাব, এই সভা দাবি করুক AFSPA আইনের সংশোধন করতে হবে। ঐ আইনে নতুন ধারা যোগ করে বলতে হবে, 'হাবিলদার পদমর্যাদার কোন জওয়ান সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে কোনও মহিলাকে হত্যা করতে পারে এবং হত্যার আগে যদি তাকে লাঞ্ছনা, এমন কি ধর্ষণও করা হয় তাহলেও জওয়ানের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না, রাষ্ট্রের অনুমতি লাগবে।' কারণ জওয়ানদের দেশরক্ষার মতো মহৎ কাজে এটুকু সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। আর সকলের মতো আমিও জানি জওয়ানের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। আইনের এই সংশোধন করার দাবি তোলা হোক এই সভা থেকে। এই সংশোধন হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মণিপুরে ফিরতে পারি। অন্তত এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারি যে দিদির মতো আমার মৃতদেহে জওয়ানদের বাড়তি গুলি বিঁধবে না। আমার শরীর বাড়তি ২৬টা গুলির থেকে মুক্তি পাবে। যতই হোক না সেটা আমার 'মৃতদেহ'। মৃতদেহেরও তো সম্মান আছে— একটা কষ্ট তো হয়ই— হয় না ম্যাডাম বলুন না—ম্যাডাম বলুন না— হয় না!"

কাঁদতে কাঁদতে ইনিতা মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ডটা হাত দিয়ে চেপে ধরে। চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে। ঝাপসা চোখে দেখে সারা হলের প্রতিনিধিরা মূক বধিরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চেও সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। চেয়ারে হতভম্ব হয়ে বসে আছে মন্ত্রী। ইনিতার ঝাপসা চোখে সকলকে মনে হয় যেন অসংখ্য গাছ। বিশাল বিশাল গাছ। দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু জানে, সবকিছু বোঝে, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না—

ইনিতা ধীর পায়ে মঞ্চ থেকে নামতে উদ্যত হয়।

নীরব হলে মঞ্চের একধারে এতক্ষণ চুপ করে হাত মুঠো করে দাঁড়িয়েছিলো সুমনা থাপার। আয়োজক সম্পাদক। ওই ইনিতাকে নির্বাচন করেছিলো। মনোরমা ছিলো সুমনার সহপাঠিনী। ইনিতা তার পিঠে সুমানরা হাতের স্নেহের পরশ অনুভব করে। একটা অস্ফুট শব্দ তার কানে ভেসে আসে— May you rest in peace Manorama! ইনিতা মনোরমা যেন একাকার হয়ে যায়।

সংস্কার রাজনীতির আরেক অধ্যায়

সুতনু ভট্টাচার্য

সম্প্রতি ভারত সরকার শরিকি মামলার বাধাবিপত্তি কাটিয়ে একগুচ্ছ নীতি পরিবর্তন করে ফেললেন— খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ ৫১ শতাংশ, ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ, দেশি বিমান সংস্থায় ৪৯ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, টেলিভিশন সম্প্রচারে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, রান্নার গ্যাস ও ডিজেলে বড় রকম ভর্তুকি ছাটাই। সংস্কার কর্মসূচির তালিকায় আপাতত বাকি রইল শিল্পসংস্থার জন্য 'জনস্বার্থে' জমি অধিগ্রহণ আইন, ও পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা আর্থিক পণ্যের ফাটকায় খাটানোর জন্য বেসরকারিকরণ। (এ বিষয়ে নতুন ঘোষণার আগে লেখা হয়েছে এই প্রবন্ধটি— সম্পাদক) হঠাৎ করে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলে ভারত সরকারের এ হেন পদক্ষেপে হৈ চৈ পড়ে গেছে। ক'দিন আগেও বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে কয়লা-কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে। খোদ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামা সাহেব খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে ভারত সরকারের টালবাহানা দেখে অধৈর্য হয়ে ধমকে দিয়েছিলেন— ভারত সরকার নীতি-পঙ্গুত্বে ভুগছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সাঙ্গ হওয়ার পরেই হঠাৎ করে যেন ভোল বদলে গেল, মূষিকবৎ আচরণ সিংহবৎ গর্জনে পাল্টে গেল। এমন তৎপর হয়ে ওঠা চোখে পড়ার মতোই। বোঝা যায় শরিকি রাজনীতির অংক মোটের ওপর মিলে যাবে এমন আশ্বাস কোথাও থেকে জুটেছিল। ঘটেছেও তাই। সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে— তাতে কিছু যায় আসেনি। উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর রাজনীতির নায়ক-নায়িকারা, যাদের কীর্তিকলাপ দেখে মনে হয় কারে ছেড়ে কারে ধরি, তারা প্রতিবাদ-টতিবাদ করে সমর্থনটা জারি রেখেছে। এমনটা যে তারা করবে সে ব্যবস্থা করাই ছিল। অল্প কিছুকাল আগেই মার্কিন বিদেশ সচিব স্বয়ং এসে এদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন— 'সৌজন্য সাক্ষাৎ'। অবাক কাণ্ড— ইতিপূর্বে এমনটা ঘটতে বিশেষ দেখা যায়নি। বিশেষত, পররাষ্ট্র বিষয়ক কূটনৈতিকতা তো রাজ্য-স্তরে পড়ে না। মার্কিন বিদেশ সচিব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন কলকাতার মহাকরণে এসে। ঘটনাক্রমে বোঝা গেল তাঁর দৌত্য বিশেষ সফল হয়নি, কারণ আলোচনায় দু'পক্ষের কেউই ঠিক বুঝতে ও বোঝাতে পারেন নি। ভাষাটাও তো সমস্যা, কমিউনিকেশন গ্যাপ তো হতেই পারে।

এদিকে সরকারের সংস্কার পথে 'সাহসী' পদক্ষেপ নিয়ে মিডিয়ার বিশেষজ্ঞদের হৈ হট্টগোলে সাধারণ মানুষের কান পাতা দায়। গত শতাব্দীর ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সংস্কার যাত্রার প্রায় রজতজয়ন্তী হতে চলল। মানুষের সংসার-যন্ত্রণা তো আছেই, এখন এসে জুটেছে সংস্কার-যন্ত্রণা। শেষ আর হয় না। সংস্কার কেন, না-করলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয় জিগ্যেস করলেই বিপদ। সেই ভাঙ্গা রেকর্ড আবার বাজবে— দেশি-বিদেশি বড় বড় বিনিয়োগ ঘটবে, শিল্পসংস্থা গড়ে উঠবে, দেশের মানুষের জন্যই তো সব। সংস্কার যাত্রার একুশটি বছর পার করে এমন কথা শুনলে 'কত্তা ঘোড়ায় হাসব' বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। গরীব মানুষের কিছু সুবিধা হয় এমন সব ভর্তুকি সরকার ক্রমাগত কমিয়েছে, কারণ নাকি ফিসক্যাল ডেফিসিট কমানো আশু কর্তব্য। অথচ, এদিকে দেখা যায় ক্রমাগত বেড়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে দেওয়া নানাবিধ ছাড়। তথ্য বলে, ভারত সরকার ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১, এই তিন বছরে শিল্পপতিদের বিভিন্ন ভাবে ছাড় ও উৎসাহ দিতে মোট রাজস্ব ক্ষতি করেছে যথাক্রমে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কোটি, ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি, ও ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। আর এই তিন বছরে সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এমন ভর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি, ১ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি, ও ১ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। এদিকে কর্মসংস্থানের গল্পও তো জানা আছে। শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে শতাংশ হিসাবে মজুরি থেকে আয়ের ভাগ ক্রমাগত কমেছে। এর সঙ্গে ক্রমাগত খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার এক শক্ত বনিয়াদ যে গৃহস্থের সঞ্চয়, প্রকৃত মূল্যে সেই যাচ্ছে কমে।

সংস্কারের ফলে কী কী ঘটেছে, জনজীবন কীভাবে আরও বিপর্যস্ত হচ্ছে সে নিয়ে নানাদিক থেকে বহু আলোচনা আছে। সাম্প্রতিক সংস্কারগুলি, বিশেষত খুচরো ব্যবসায় বিদেশি মালিকানার সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও ডিজেলের ভর্তুকি হ্রাসের ফলে কী ঘটবে সেও আন্দাজ করাই যায়। প্রশ্ন হল, দুই দশকের ওপর এই সংস্কার যাত্রা লাগাতার চলেছে কেন! সংস্কার কেন, না-করলে কী হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে যে ভাঙ্গা রেকর্ডটি বাজানো হয় তার অন্তরালে আসল গল্পটা কী? এর উত্তর খুঁজতে সামনে আনতে হবে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারগুলি ঘটানো হচ্ছে তার কথা।

সংস্কার যাত্রার আরম্ভের সময় সেই ১৯৯১ সাল। ইতিপূর্বে ১৯৭০ দশকের আরম্ভেই পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বর্ণযুগের অবসানে পুঁজিবাদ এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে একযোগে মন্দা ও মূল্যবৃদ্ধির

সমস্যায়। সাবেকি পথে আর পুঁজি বিনিয়োগ ঘটানো যাচ্ছে না। এই দশকের শেষভাগে এসে দেখা গেল গভীর সংকট আছড়ে পড়তে পারে। তাহলে উপায়? পথ এসে গেল ১৯৮০ দশকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বা দ্বিতীয় বিশ্বের অবসানে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় বেঁধে নিতে রচনা হল ডাংকেল ড্রাফ্‌ট, যা থেকে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্‌লিউটিও। পাশাপাশি, সরকারি মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে তৃতীয় বিশ্বের বড় বড় দেশগুলিকে বাধ্য করা হলো আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার বা আইএমএফ থেকে ঋণ নিতে, এই ধুয়ো তুলে যে এই দেশগুলির আর্থিক অবস্থা নাকি অতি শোচনীয়। সেই সঙ্গে এলো আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের শর্তাবলী— স্ট্রাকচারাল অ্যাডজ্যাস্টমেন্ট পলিসি, যার অর্থ বেসরকারিকরণ, বিলগ্নিকরণ ও উদারিকরণ। ফিস্‌ক্যাল ডেফিসিট কমানো অবশ্য-কর্তব্য হিসাবে স্থির হলো সাধারণ মানুষের জন্য দেওয়া ভর্তুকিগুলি ছাঁটাই করা। ফিস্‌ক্যাল ডেফিসিট কমানোর এই নিদানটির মূল উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র যাতে মূলধনের বাজার থেকে ঋণ কমায়, যার ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলি আরও বেশি সুযোগ পাবে বাজার থেকে মূলধন জোগাড় করার। স্মরণ করলে দেখা যায়, ভারতের সংস্কার যাত্রা আরম্ভের প্রেক্ষিতটি রচনা করা হয়েছিল এই পথে— সংস্কার ছাড়া পথ নেই, ভারতের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বসেছে। শুরু হল ভারতের সংস্কার যাত্রা— এর নাম হলো আর্থিক সংস্কার বা ফাইনানন্সিয়াল রিফর্ম— ছাঁটাই হলো চিনি ও সারে ভর্তুকি, উদ্যোগ নেওয়া হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণের, তুলে নেওয়া হলো শিল্পসংস্থার লাইসেন্স নেওয়ার আইন, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র বাদে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সীমা বাড়ানো হল ৫১ শতাংশে, এবং একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের আইনটি কার্যত বাতিল হলো।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সংস্কারযাত্রা শুরু করিয়ে উন্নত বিশ্বের পুঁজিবাদ খুঁজে পেল তার সংকটমুক্তির পথ। এরপর ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি উন্মুক্ত হলো পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের আরেক দিগন্ত— আর্থিক পণ্যের ফাটকাবাজি। ইতিপূর্বে ১৯৭০ দশকের আরম্ভে এই জাতীয় পণ্যে লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে এই কাজে প্রতিষ্ঠা হয় শিকাগো বোর্ড অফ ট্রেড। তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী প্রসারে আর্থিক পণ্যে ফাটকাবাজির দিগন্ত খুলে গেল— এক লহমায় বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ফাটকা খেলা সম্ভব। এরই প্রয়োজনে এলো আর সব দেশের মতো ভারতেও আর্থিক পণ্যের লেনদেনের বাজার গড়ে তোলা। এবারেও রচনা হলো আর্থিক সংস্কারের নিত্যপ্রয়োজনীয়তার একই গল্প। ঘটল বৈদেশিক মুদ্রার চলতি খাতে অবাধ বিনিময়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার পুনর্গঠন, শেয়ার বাজারের পুনর্গঠন, ব্যাংক ও বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদি। আর্থিক ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি ঘটে দ্রুত, আর্থিক বাজার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে। সেই পথেই এল ভারতের জাতীয় আয়বৃদ্ধি। কিন্তু এই আয়বৃদ্ধির ফলে যে পুঁজির বৃদ্ধি, তার বিনিয়োগ ঘটবে কোথায়? সাবেকি শিল্প পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ানোর তেমন সুযোগ নেই, কারণ সেখানে চলছে চিরস্থায়ী মন্দা। অতএব ২০০০ সাল নাগাদ থেকে সংস্কার যাত্রার অভিমুখে এলো পরিষেবা ও পরিকাঠামো শিল্প, তথা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প, টেলিকমিউনিকেশন, উপনগরী নির্মাণ, বড় বড় রাস্তাঘাট, ব্রিজ, ফ্লাই-ওভার, রিয়েল এস্টেট, ও সেই সঙ্গে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, বিমান বন্দরের আধুনিকীকরণ, খনি ও খনিজ শিল্প, ইত্যাদি ও তা ছাড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষা তো আছেই। এবার সংস্কার যাত্রার প্রয়োজনীয়তার নতুন যে গল্প রচনা হলো, তাতে বড় করে সামনে রাখা হল বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথা। এই গল্পে অনেকেই ভুলেছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারও এতে হাত পুড়িয়েছে— ২০০৬ সালের ২৩৫ এক ধাক্কায় ২০১১ সালে (বা আরও আগেই পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে) এসে নেমে গেছে প্রায় ৩৫-এর কাছে।

উন্নত বিশ্বের পুঁজিবাদের প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বের সংস্কার যাত্রার গল্পের এখানেই শেষ নয়। প্রথম পর্যায়ে ফিস্‌ক্যাল ডেফিসিট কমানোর আর্থিক সংস্কারের পরে এসেছে আর্থিক পণ্যের বাজার গড়ে তোলার সংস্কার, ও তারপর পরিষেবা ও পরিকাঠামো শিল্পে বিনিয়োগের দ্বার খুলে দেওয়ার সংস্কার এবং সম্প্রতি এতে যুক্ত হয়েছে সংস্কারের আরেকটি অভিমুখ। সাম্প্রতিক সংস্কারে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি প্রত্যক্ষ মালিকানার প্রতিষ্ঠা ও হঠাৎ করে ডিজেলের একলাফে অনেকটা ভর্তুকি হ্রাস তথা মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো এই নতুন অভিমুখটির প্রতিফলন। সহসা এই অভিমুখটি নজরে পড়ে না, ও তাই সাধারণ আলোচনাতে স্থানও বিশেষ পায় না। এর হদিশ পেতে জানতে হবে বিশ্ব-অর্থনীতির রাজনীতি ও তার পরিকল্পনা।

এই বিশ্বায়নের বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনমাফিক রাজনৈতিক শাসনক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কে বা কারা? অর্থাৎ, কারা চালায় এই আর্থজগৎ? পাঠ্যপুস্তকে যা লেখা থাকে তা থেকে মনে হবে এর উত্তর হল স্বাধীন সার্বভৌম দেশে দেশে তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকাররা মিলে এই কাজটা করে, দেশে দেশে অর্থনৈতিক নীতি তৈরি করে। উত্তরটা ভুল। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক হল কর্পোরেট প্রভুরা। কথাটা মাঠ-ময়দানের বস্তাপচা রাজনীতির কথা, অর্থাৎ ক্লিশে, মনে হবে। সুতরাং একটু দেখে নেওয়া ভাল। ধরা যাক কর্পোরেট প্রভু ওয়ালমার্টের কথা, যার নাম এই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায় উঠে এসেছে। বাৎসরিক আয়ের হিসাবে,

মোটামুটি ৪০০ বিলিয়ন ডলার, সংস্থাটি সারা বিশ্বে সর্ববৃহৎ। এদিকে সারা বিশ্বে মাত্র গোটা পঁচিশেক দেশ আছে যাদের বাৎসরিক জাতীয় আয় ওয়ালমার্টের থেকে বেশি। সুতরাং এ জাতীয় কর্পোরেট প্রভুদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতটা সে আন্দাজ করাই যায়। গোটা পনেরো এমন কর্পোরেট সংস্থার মিলিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে পৃথিবীর যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে বেশি। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপত্তি এমন বিশ্ব কর্পোরেট সংস্থা (গ্লোবাল ৫০০ কোম্পানি) হলো ১৫৭টি ও এদের মিলিত বাৎসরিক আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের (মোটামুটি ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার) থেকে বেশি।

এ তো গেল কর্পোরেট প্রভুদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার হিসেব। এই ক্ষমতা ব্যবহার হয় কীভাবে? উদাহরণ দেখা যাক। এই উদাহরণে ভারতে সাম্প্রতিক সংস্কারের বিশেষ দিক, অর্থাৎ খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচনের সূত্রটি দেখা যাবে। সময়টা ২০০৫ সালের জুলাই মাস। প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। সঙ্গে গেছে কে? ভারতের তাবড় তাবড় কর্পোরেট প্রভুগণ। আর গেছে কে? ভারতে আছে প্ল্যানিং কমিশন, তার ডেপুটি চেয়ারম্যান পাগড়ি বেঁধেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বসে একগুচ্ছ চুক্তি সম্পাদন করে ফেললেন। কী নেই তার মধ্যে? সায়েন্স-টেকনোলজি ফোরাম, ট্রেড পলিসি ফোরাম, এগ্রিকালচার নলেজ ইনিসিয়েটিভ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ও সর্বোপরি ভারত-মার্কিন কর্পোরেট প্রভুদের নিয়ে সিইও ফোরাম, যার যুগ্ম দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন রতন টাটা এবং এদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব পেলেন ইন্দো-ইউএস ডায়ালগের সভাপতি হয়ে ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। অতি তৎপরতায় ২৬টি কমিটি তৈরি হয়ে গেল, যাতে ২০০৬ সালের মধ্যে কোথায় কী সংস্কার করতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায়। হলোও তাই। সিইও ফোরাম প্রস্তুত করে দিলেন ইন্দো-ইউএস স্ট্র্যাটেজিক ইকনমিক পার্টনারশিপ (মার্চ ২০০৬), যাতে শিলমোহর লাগিয়ে গ্রহণ করলেন দুই দেশের সরকার। এই যৌথ দায়িত্বে অবশ্য মার্কিন দেশের বিশেষ কিছুই করার নেই— যা করার তা মূলত ভারত সরকারকেই করতে হবে। কী নেই এই পরিকল্পনাতে! বিশেষত সিইও ফোরামের পরিকল্পনাটি ও এগ্রিকালচার নলেজ ইনিশিয়েটিভ-এর প্রতিপাদ্যটিতে একটু চোখ বোলালেই দেখা যাবে ভারতের সংস্কার যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়টির অভিমুখ নির্দেশিত হয়েছে এইখান থেকেই। কৃষি ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, বীজ আইনে বীজ বাজার নির্মাণ, জিএম শস্য ও কৃষি গবেষণা, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড ছেড়ে এই উদ্দেশ্যে মূলধন তোলা, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ও নলেজ কমিশন গঠন— সবই আছে, আছে আরও কত কী। এরপরেও কি বলতে হবে দেশটা চলে কীভাবে, চালায় কারা?

লক্ষ্যণীয় হল ভারতের সংস্কার যাত্রার এই পর্বের রচনা শুরু হয়েছিল কর্পোরেট প্রভুদের নির্দেশিত পথে প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে। সে সময় বামপন্থীরা সমর্থন জুগিয়েছিলেন সরকার গঠন ও চালাতে, যা তাঁরা পরবর্তীকালে পারমাণবিক শক্তি চুক্তির বিরোধিতায় প্রত্যাহার করে নেন। অথচ ২০০৬ সালেই এতসব চুক্তি হয়ে গেল ভারত-মার্কিন কর্পোরেট প্রভুদের চাপে, যা ভারতের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চুপ। হয়ত সরকারপক্ষীয় হওয়ার মধুচন্দ্রিমার ঘোর তখনো কাটেনি, দিল্লীর রাজপথ-জনপথে উচ্চতম পর্যায়ের নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভানেত্রীর একেবারে পাশের আসনে বসার রোমাঞ্চকর সুখানুভূতিতে তাঁরা বিভোর ছিলেন; আর এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাঠে-ময়দানে ওঁরা ব্যস্ত ছিলেন জনসভার বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কান ধরে ওঠ-বোস করাতে। তাই এতসব খেয়াল করা হয়নি। অথচ আজকের বিক্ষুব্ধ বামপন্থী প্রসেনজিৎ বোস সেই সময়ই এ বিষয়ে একটি নোট লিখেছিলেন (countercurrent.org, ২২ এপ্রিল, ২০০৬)।

ভারতে সংস্কার যাত্রার সম্প্রতি যে অভিমুখটি এসে যুক্ত হয়েছে তার লক্ষ্য কী? মনে রাখতে হবে, যেসব বিশ্বপতি কর্পোরেট সংস্থাগুলির বিশ্বের আর্থজগতের নিয়ন্ত্রক, তাদের প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হয় জল কোনদিকে গড়াচ্ছে, এবার কোন দিকে যাবে ও সেই মতো স্থির করতে হয় কোন পথে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে নিতে হবে। বিশ্ব আর্থিক সংকটে ২০০৭-০৮ থেকে বহু কর্পোরেট সংস্থার সাজানো বাগানে মড়ক লেগেছে, যা থেকে মুক্তি আজও মেলেনি। এর আন্দাজ ২০০৫-০৬ সালেই কর্পোরেট প্রভুরা করতে পেরেছিলেন ও সেই মতো ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছিলেন। বর্তমানে সংকটমুক্তির জন্য নতুন পথের সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়েছে। সেই মতো সিইও ফোরাম ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলি আরও শাণিত হয়েছে ও দেশে দেশে রাষ্ট্রগুলির ওপর তারা চাপ বাড়িয়েছে। সুদূর নয়, অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে জল-জমি-জঙ্গল থেকে খনি ও খনিজ সহ যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, যোগাযোগ ও পরিবহন পরিকাঠামো, এবং কৃষি, বিশেষত বিশ্ব খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যপণ্য। তাই কর্পোরেট নির্দেশিত সংস্কারের সাম্প্রতিক অভিমুখে এসেছে এইসব ক্ষেত্রগুলিতে কর্পোরেট মালিকানার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আজকের এই সংস্কার যাত্রার অভিমুখ যা দাঁড়িয়েছে তার

তুলনায় ১৯৯১ সালের সেই আর্থিক সংস্কার তো নেহাতই দুগ্ধপোষ্য শিশু। কিন্তু সেই ছিল সংস্কার যাত্রার সূচ হয়ে ঢোকা।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় সাম্প্রতিক সংস্কারে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি সংস্থার পূর্ণ মালিকানা (৫১ শতাংশ মূলধন) প্রতিষ্ঠার অনুমতি ও লিটার প্রতি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি একলাফে ৫ টাকা করার কথা। কী এর আসল উদ্দেশ্য? আর্থজগতের যে বিশ্বমানচিত্র নির্মাণ হয়েছে কর্পোরেট দূরদৃষ্টিতে, তাতে ভারতের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে উন্নত বিশ্বের খাদ্য জোগানোর দেশ হিসাবে। খুচরো ব্যবসা তথা কৃষিপণ্যের ব্যবসায় বিদেশি সংস্থার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা এরই পথ নির্মাণ। বিষয়টি সাদামাঠা বিদেশি সংস্থার বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করলে ধরা পড়বে না। বুঝতে হবে যে এর ফলে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাটি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে গ্লোবাল রিটেল চেন বা বিশ্ব বাজার শৃঙ্খলে। বুঝতে হবে যে ওয়ালমার্ট, টেসকো, ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভারতে আসতে চাইছে এদেশ থেকে পণ্য কিনে এদেশেই বেচতে নয়; গ্লেবাল রিটেল চেন মারফত উন্নত বিশ্বে নিয়ে গিয়ে বেচতে, কারণ সেখানে দাম অনেক বেশি, ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এর পাশাপাশি দেখতে হবে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি। এর ফলে শহরাঞ্চলে সাধারণ মানুষের পরিবহণ ব্যবস্থার খরচ বাড়বে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল, গ্রামে কৃষকদের সেচের জল তোলা ও পণ্য পরিবহণে খরচ বাড়বে অনেকটাই। বহু ক্ষুদ্র চাষি বাধ্য হবে চাষ ছেড়ে কনট্র্যাক্ট ফার্মিং-এ জমি বেচে দিতে; যা এখনই ঘটছে। এই কনট্র্যাক্ট ফার্মিং-এ উৎপন্ন হবে উন্নত বিশ্বের জন্য উন্নত মানের খাদ্য পণ্য, ওয়ালমার্ট বা টেসকো নির্দেশিত কৃষি পদ্ধতিতে। ভারতের মানুষ হারাবে তার খাদ্য সার্বভৌমত্ব— নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে খাদ্য উৎপাদন করে নেওয়ার সুযোগটুকুও ক্রমশ লুপ্ত হবে। খাদ্য সুরক্ষা বা খাদ্য নিরাপত্তার দু'টাকা কেজি দরে চাল-গমের ধোঁকার টাটির পিছনে চাপা পড়ে যাবে খাদ্য সার্বভৌমত্বের কথা। এই প্রবণতা এখনই দেখা যাচ্ছে— দেশে খাদ্যপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, অথচ কৃষিপণ্যের বিদেশে রপ্তানি বেড়েই চলেছে। এটাই কর্পোরেট নির্দেশিত সংস্কার যাত্রায় ভারতে অদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মাত্র।

২৯/০৯/২০১২

অথ রিটেল-দৈত্য কাহিনী

প্রণব দে

দরজাটা মনমোহন সিং হাট করে খুলেই দিলেন। সিঙ্গল ব্রান্ডের (একক পণ্য) ক্ষেত্রে দরজা আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল। মাল্টি ব্রান্ড (বিবিধ পণ্য) খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির প্রবেশদ্বারও খুলে গেল। ভারতের খুচরো ব্যবসার বিশাল জগতে ঠিকমতো ঢোকার সুযোগ না পেয়ে মার্কিনিরা অনেকদিন ধরেই রাগে ফুঁসছিল। হৈচৈ-ও বাড়ছিল। যে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকানদের মন মোহিত করে রাখতেন, প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রাণসখা ছিলেন— ভারতের সেই প্রধানমন্ত্রীকেই কিনা আমেরিকার কাগজ ব্যঙ্গবিদ্রুপ করলো। এতটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। দেশবাসী যা বলে বলুক, তাতে প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের সরকারের বড়ো কিছু এসে যায়না। মার্কিনিদের স্বসৃষ্ট সংকট ভারতের আমজনতার কাঁধে চাপিয়ে সে দেশকে কী করে সংকট-মুক্ত করা যায়, সেটাই তাঁদের অনুক্ষণ চিন্তার বিষয়। না হলে মার্কশিট খারাপ হয়ে যাবে। তা না হলে সারা দেশ যেদিন প্রতিবাদী ধর্মঘটে সামিল, সেই ২০শে সেপ্টেম্বরেই, খুচরো ব্যবসা-জগতে 'আনন্দযজ্ঞে' বিদেশি বন্ধুদের অবাধ নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে কেন? প্রভুভক্তি দেখাতে এটুকু বাড়াবাড়িতে নিশ্চয় কেউ দোষ ধরবেন না।

বেশিদিন আগের কথা নয়। এই ২০১২ সালের ২১শে আগস্ট, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জোতিরিন্দ্র সিন্ধিয়া, রাজ্যসভায় লিখিত বিবৃতি মারফত জানিয়েছিলেন, সুইজারল্যান্ডের ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন 'Wal-Mart's Global Track Record and the Implications for FDI in Multi- Brand Retail in India' শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। বিভিন্ন দেশে ওয়ালমার্টের কার্যকলাপ নিয়ে রিপোর্টটিতে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, যথেষ্ট রক্ষাকবচ না থাকলে, মাল্টি-ব্রান্ড খুচরো ব্যবসায়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ফলে একদিকে ব্যাপক উচ্ছেদ ঘটবে, অপর দিকে খুচরো ব্যবসায়ে, পণ্য পরিবহনে, কৃষিতে ও উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকরা দুরবস্থার সম্মুখীন হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, সরকার রিপোর্টটিতে গুরুত্ব আরোপ করেনি। প্রভু চটে যাবে, এমন কাজ আমরা স্বাধীন ভারত সরকারের থেকে আশাই বা করি কী করে?

ওয়ালমার্টকে আমরা জানি, রিটেল ব্যবসায় কুলচূড়ামণি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ ২৭টি দেশে দশ হাজারের বেশি ব্যবসা কেন্দ্র। প্রতি মিনিটে মুনাফা ৩৪৮৮০ ডলার। অফিস-ব্যবসা মিলিয়ে সারা বিশ্বে ২০ লক্ষের বেশি কর্মী। ইউএনআই রিপোর্টে এই বিশ্বখ্যাত কোম্পানির ব্যবসার ধরন-ধারণের উপর কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, এত বড়ো কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন আহামরি কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক মজুরির তুলনায় বেশ কিছুটা কম। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেথ

জ্যাকবের মতে, "সাধারণ খুচরো কর্মীদের তুলনায় আমেরিকায় ওয়ালমার্ট কর্মীরা ১২.৪ শতাংশ কম উপার্জন করেন এবং একটু বড়ো বিক্রয়কেন্দ্রের তুলনায় ১৪.৫ শতাংশ কম।" অন্য একটি রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় ওয়ালমার্ট কোম্পানির কর্মীদের গড় বার্ষিক বেতন ২০৭৭৪ ডলার, যা কিনা সেদেশের চার-সদস্যের পরিবারের দারিদ্র্য-সীমার থেকেও কম। ১৯৭৬ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে খুচরো ব্যবসা সম্পর্কে সে দেশের সেনসাস ব্যুরো-র পর্যবেক্ষণ ইউ-এন-আই রিপোর্টে উদ্ধৃত করা হয়েছে— "বৃহদাকার দোকানগুলির ('বিগ-বক্স') প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যাবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কর্মসংস্থান, ছোট ছোট দোকান এবং একই ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত ক্ষুদ্রতর বিপণিগুলির টিঁকে থাকার ক্ষেত্রে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিগ-বক্সের এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছোট দোকান বা বিপণিগুলির উপর আঘাতটা সর্বাধিক। অবস্থান যদি এক থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে হয়, তাহলে পাঁচ থেকে দশ মাইল দূরের দোকানগুলির তুলনায় বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।" মিশৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেক বাস্কের, ১৯৭৭-১৯৯৯ সময়কালে আমেরিকার ১৭৪৯টি কাউন্টিতে খুচরো ব্যবসার উপর অনুরূপ এক সমীক্ষায় দেখেছিলেন, ওয়ালমার্ট যেখানে যেখানে ঢুকেছে, ছোট ব্যবসা সেখানে সেখানে কমেছে। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক সমাজ-বিজ্ঞানী ডেভিড নিউমার্কের গবেষণায় ধরা পড়েছে, "প্রত্যেক ওয়ালমার্ট কর্মী ১.৪ জন সাধারণ খুচরো ব্যবসা কর্মীকে স্থানচ্যুত করে। কাউন্টি ভিত্তিতে প্রতি ওয়ালমার্ট স্টোরের পত্তনে খুচরো ব্যবসায় কর্মসংস্থান ২.৭ শতাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ওয়ালমার্ট কর্মীরা আক্ষরিক অর্থে অন্যান্য শ্রমিকদের উচ্ছেদ করে। বাজারে ওয়ালমার্টের প্রবেশ, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের শ্রমিক ছাঁটাই করে খরচ কমাবার জন্য প্ররোচিত করে। খুচরো কর্মসংস্থান সম্যক না কমলেও, ওয়ালমার্ট অবর্তমানে খুচরো ব্যবসায়ে যতটা কর্মসংস্থান হতো, তার তুলনায় কমে গিয়েছিল।" ২০০৮ সালের মে মাসে আইসিআরইআর-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে চিলির সান্তিয়াগোতে ১৫৭৭৭টি ছোট দোকান ঝাঁপ ফেলে দিয়েছিল। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৩-এর মধ্যে আর্জেন্টিনার শহরাঞ্চলে সুপারমার্কেটগুলির ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে ৬৪ হাজার, অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশ ছোট খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওয়ালমার্ট সহ অন্যান্য কোম্পানি কৃষক ও বিভিন্ন উৎপাদনকারীদের কম দাম দিতে শুরু করেছিল এবং উৎপাদকরা দামে পোষাতে না পেরে তাদের বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। মেক্সিকোতেও একই ছবি। নিজেদের লাভের কড়ি ঠিক রাখতে ওয়ালমার্ট মেক্সিকোর বস্ত্র উৎপাদকদের দাম কমাতে বাধ্য করেছিল। ২০০২-০৩ সালের পর স্থানীয় উৎপাদকদের থেকে না কিনে ওয়ালমার্ট তাদের অর্ধেক পণ্য চীনের মতো দেশ থেকে সস্তায় আমদানি শুরু করে। চিলিতে নিত্যব্যবহার্য পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ বাজারই ওয়ালমার্টের দখলে। সেখানেও দামের ব্যাপারে কারচুপি নিয়ে ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। চিলি সরকার তা নিয়ে তদন্তও শুরু করেছে।

শিকাগোতে, যেখানে প্রথম ওয়ালমার্ট কেন্দ্র খোলা হয়, তার চার মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে, সে বিষয়ে লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ২০০৯ সালে সমীক্ষা করেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, ওয়ালমার্টের প্রবেশ স্থানীয় ব্যবসাক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ওয়ালমার্টের আশেপাশে খুচরো ব্যবসা বা কর্মসংস্থান, কোনটারই উন্নতি হয়নি। বরং কাজের বাজার ও বিক্রিবাটায় লক্ষ্যণীয় পতন ঘটেছিল। এক কথায়, এক বছরের মধ্যে ওয়ালমার্টের এক মাইলের মধ্যে ২৫ শতাংশ খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ালমার্ট কী ভাবে দেশে দেশে ব্যবসার জাল বিস্তার করে, সেটাও কম রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ওয়ালমার্টের সব থেকে বেশি বিক্রয়কেন্দ্র মেক্সিকোতে। ১৯৯২ সালে মাত্র ছয়টি স্টোরের মাধ্যমে মেক্সিকোয় ওয়ালমার্টের ব্যবসা শুরু। এখন সেখানে বিক্রয়কেন্দ্র ২০০০-এর বেশি। গত ২১ এপ্রিল ২০১২, আমেরিকার সুবিখ্যাত সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকোর (কোম্পানির মেক্সিকো শাখা) দুর্নীতি প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি আসলে টাইমস পত্রিকার দীর্ঘ অনুসন্ধানের রিপোর্ট। টাইমসের অনুসন্ধানে যেসব প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, তা থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে মেক্সিকোয় ওয়ালমার্টের দ্রুত বিস্তারের পিছনে "উৎকোচের ধারাবাহিক এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে"।

বিষয়টা প্রথম জানাজানি হয় ২০০৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে। ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকোর এক প্রাক্তন কর্মকর্তা সেরগিও সিসেরো জাপাতা, আমেরিকার আরকানশাস প্রদেশে বেনটনভিলেতে (যেখানে ওয়ালমার্টের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত) এক সিনিয়র আইনজ্ঞকে ই-মেল করে জানান, তাঁর কাছে ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকো কোম্পানির সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতির তথ্য আছে। তিনি সে ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছুক। তাঁর মূল অভিযোগ, ব্যবসার পারমিট পাওয়ার জন্যে কোম্পানি দেশের প্রায় সর্বস্তরে উৎকোচ দিয়ে কাজ হাসিল করেছে।

ওয়ালমার্ট হেডকোয়ার্টার সংবাদটি অবগত হওয়ার পর, মেক্সিকোতে একটি তদন্তকারী টিম পাঠায়। টিমের নেতা ছিলেন এফবিআই-এর এক প্রাক্তন স্পেশাল এজেন্ট। কমপক্ষে ২.৪ কোটি ডলার বেআইনি অর্থ প্রদানের কাগজপত্র তাঁদের নজরে আসে। তদন্ত রিপোর্টে বলা হলো, "এটা সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট অবকাশ আছে যে মেক্সিকো এবং আমেরিকার আইনগুলো

লঙ্ঘিত হয়েছে। তবে আরো তদন্ত প্রয়োজন।''

আরো তদন্তের বদলে, ওয়ালমার্ট সমস্ত বিষয়টা ধামাচাপা দেয়। আমেরিকা বা মেক্সিকোর সরকারকে কোন কিছু জানানো হলোনা, ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকোর কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলোনা। ব্যবসা প্রসারের পুরস্কার স্বরূপ উৎকোচ-কাণ্ডের মুখ্য হোতা চীফ এক্সিকিউটিভ এডুয়ার্ডো কাস্ত্রো-রাইটকে ২০০৮ সালে ওয়ালমার্টের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে উন্নীত করা হয়।

২০১১-এর ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক টাইমসে দুর্নীতি বিষয়ক এই সংবাদ প্রকাশের পর ওয়ালমার্ট কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে দুর্নীতির জন্য নয়, সংবাদপত্রে দুর্নীতির গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে কোম্পানির শেয়ারের দামে তার কী প্রভাব পড়তে পারে— এটাই ছিল তাদের মাথাব্যথার একমাত্র কারণ। চাপে পড়ে কোম্পানি অন্তর্তদন্ত শুরু করে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকোর পরিচালকদেরই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ফল যা হওয়ার তাই হলো। তদন্তকারীরা দোষ এবং দোষী খুঁজে পেলনা।

ঝুলির ভিতরের বেড়ালটাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন পূর্বোক্ত সেরগিও সিসেরো জাপাতা। জাপাতা প্রায় দশ বছর ওয়ালমার্ট-ডি-মেক্সিকোর রিয়েল এস্টেটে দপ্তরের দায়িত্বে থেকে উৎকোচ কাণ্ড সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে যতটা স্বীকৃতি আশা করেছিলেন, ততটা পাননি। ক্ষোভে তিনি ২০০৪ সালে পদত্যাগ করেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধির সঙ্গে পনের ঘণ্টার সাক্ষাৎকারে তিনি যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করে দেন। মেক্সিকোয় টাকার বিনিময়ে কাজ করে দেয় এমন এজেন্সিকে বলা হয় 'জেসতোরে' (gestores)। দুজন আইনজীবী এবং বহু জেসতোরের মাধ্যমে জাপাতা উৎকোচ জাল বিস্তার করেছিলেন। শহরের মেয়র, কাউন্সিলর, আরবান প্লানার, সরকারের ছোট-বড়ো আমলা এবং ওয়ালমার্টের শ্রীবৃদ্ধি রোধ করার ক্ষমতা রাখে, এমন কাউকেই জালবদ্ধ করতে বাকি রাখা হয়নি। তাঁর মতে এটা ''চাঁদের অন্ধকার পিঠে কাজ''।

আমেরিকার 'ফরেন কোরাপ্ট প্র্যাকটিশ এ্যাক্ট, ১৯৭৭' অনুযায়ী কোন আমেরিকান কোম্পানি বিদেশের কোন সরকারি কর্মী বা অন্য কাউকে উৎকোচ-স্বরূপ কিছু দিলে আইনত অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ওয়ালমার্ট কোম্পানি বিবৃতি দিয়ে আইন লঙঘনের কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু মার্কিন সরকার এখনও পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি এবং কোন পদক্ষেপও নেয়নি।

খুচরো ব্যবসার জগতে ওয়ালমার্টের আরও দোসর আছে। কিন্তু ব্যবসার অঙ্কে এবং মুনাফার হিসাবে ওয়ালমার্ট তাদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। ওয়ালমার্টের সাম্প্রতিক মুনাফার পরিমাণ ১৫৮০ কোটি ডলার। সেই তুলনায় টেসকো এবং ক্যারিফু-র মুনাফা যথাক্রমে ৬২০.৮ ও ২৫৭ কোটি ডলার। প্রত্যেকের এই বিপুল মুনাফার উৎস নিম্ন মজুরির হার এবং উৎপাদকদের অবনমিত মূল্য প্রদান। 'ক্লিন ক্লোদস ক্যাম্পেন' সংস্থা তাদের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে (Cashing In Giant Retailers, Purchasing Practices, and Working Conditions in the Garment Industry) জানাচ্ছে, থাইল্যাণ্ডে টেসকো-লোটাসকে (টেসকোর থাইল্যাণ্ড শাখা) রেডিমেড্ পোশাক সরবরাহ করে, এমন একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা বলেছিল, ''আমরা লোটাসের জন্য সবসময় মাল তৈরি করতে চাইনা, কারণ কঠিন কাজের জন্য তারা আমাদের কম দাম দেয়। আমাদের অনেকটা সময় দিতে হয়, কিন্তু অর্থ পাই অনেক কম। লোটাসের জন্য কাজ করতে আমাদের উপর প্রচুর চাপ পড়ে। তারা আমাদের সময়ই দিতে চায়না।'' শ্রমিকরা জানায় যে, কোন সময়ে কাজ যদি টেসকো-লোটাসের মনোমত না হয়, তাদেরকে বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, উৎপাদন মূল্যে নয়। ওয়ালমার্টকে জিনিসপত্র সরবরাহ করে, এমন এক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা বলেছিলেন, একটি পোশাক তৈরি করতে মোটামুটি ১০ বাথ (থাইল্যাণ্ডের মুদ্রা) দাম পড়ে। কিন্তু ওয়ালমার্টের জন্য সেই একই জিনিস তৈরি করলে পোশাক প্রতি দাম দেয় ৪ বাথ। অতিরিক্ত ওভারটাইম খেটে এই সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের মজুরি পুষিয়ে নিতে হয়। কিন্তু যেহেতু ওয়ালমার্ট সারা বছর কাজ দেয়, সে কারণেই তাদের ওয়ালমার্টের কাজ ধরতে হয়। অন্যদের থেকে এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায়না। এটাই ওয়ালমার্টের ব্যবসার কৌশল। তারা সারা বছর অর্ডার দিয়ে যাবে, কিন্তু পরিবর্তে সরবরাহকারীদের কম দামে এবং জঘন্য শর্তে মাল দিতে হবে। এক এজেন্টের বক্তব্য, ''কোম্পানিগুলি ওয়ালমার্টকে চায় অতিরিক্ত পরিমাণ অর্ডারের কারণে। পড়তায় কম পড়লেও, পরিমাণের বিরাটত্ব ব্যবসায় স্থিতি এনে দেয়। যে সব কোম্পানির একটা পরিকাঠামো আছে, তাদের যন্ত্রপাতি নিশ্চল থাকলে প্রচুর গুণাগার দিতে হয়। এমতাবস্থায়, লাভ কম থাকলেও, এমন কী কিছুটা লোকসান হলেও, সরবরাহকারীদের অর্ডার নিতেই হয় শুধুমাত্র পরিকাঠামো ব্যয় কমাবার জন্যে।''

খুচরোর জগতে দৈত্য বিহারের এই হলো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশে এই দৈত্যকুল আগেই পা রেখেছে। সিঙ্গল ব্রান্ডের ব্যবসায়ে, অন্য কোম্পানির অংশীদার হয়ে। ওয়ালমার্ট-ভারতীর ১৭টি বিক্রয়কেন্দ্র আছে এ দেশে। টেসকোরও ব্যবসা আছে বাঙ্গালোরে। তবে এদের দৈত্যাকার রূপ তো এ দেশ এখনও দেখেনি। এইবার দেখবে। বাঙ্গালোরে টেসকো কর্মীর দৈনিক আয় ১১৫-১২৫ টাকা (সিসিসি রিপোর্ট)। ওয়ালমার্ট তার নিজের দেশেই বেতন-কৃপণতার জন্য সমালোচিত। আমাদের দেশে সংকট মোচনে তারা কী সাহায্য

করবে, তা একমাত্র মনমোহন সিং এবং তাঁর ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই জানেন। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি রাজ্য মাল্টি-ব্রান্ড খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগে সম্মতি দিয়েছে। তার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ৮টি কংগ্রেস শাসিত রাজ্য। গণতন্ত্রের এই মনমোহিনী রূপেই দৈত্যরাজ আকৃষ্ট। চাঁদের অন্ধকার পিঠে যারা আছে, আহ্লাদে তারা ভাসছে। টু-জি হয়েছে, কোলগেট হয়েছে, এবার হয়তো প্রকাশ পাবে রিটেল কেলেঙ্কারি।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যবসায়িক বিদ্যুৎ নীতি প্রসঙ্গে

সঞ্জিত বিশ্বাস

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুতের বিষয়টি স্থির করার জন্য গত ১৭ জুলাই '১২ দিল্লীতে যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সভা ডাকা হয়েছিল। সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় জাতীয় যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার ভাষণের কিছু অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

সেই সভায় মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বলেছেন, আমাদের দেশের বিদ্যুৎ মাশুল আন্তর্জাতিক বাজারের সমান (গ্লোবালাইজ্ড ট্যারিফ) করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন যে, বিদ্যুতের ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি ঘটলেও বৃহৎ শিল্প, কলকারখানা, বিগবাজার, মল ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাশুল কমাতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকে বিদ্যুতে ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, ভর্তুকি দিতে চাইলে রাজ্য সরকারগুলির উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবায় ভর্তুকি দেওয়া। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই একমাত্র রাজ্য সরকার যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকর করে চলেছে। তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

প্রসঙ্গত, যোজনা কমিশনের এই ভাইস- চেয়ারম্যান সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে বিশ্বাসী একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। তিনি ভারতীয় যোজনা কমিশনের দীর্ঘদিনের ভাইস চেয়ারম্যান ও কর্ণধার। ভারতে খোলাবাজার অর্থনীতি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তিনি এনডিএ ও ইউপিএ, দুই সরকারের সময়ই যোজনা কমিশনের কর্ণধার হিসাবে কাজ করে চলেছেন। সেই কারণেই বিশ্বায়নের পূজারী এই যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলুওয়ালিয়ার বক্তব্যই যে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য এবং বিশ্ব আর্থিক সংস্থা বা বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য এ কথা সহজেই বোঝা যায়। এখন দেখা দরকার, ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্য কী?

একথা সকলেই মানবেন যে, বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ জনজীবনের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। কতখানি, তা আমরা ১ আগস্ট (২০১২) উপলব্ধি করতে পেরেছি। ঐদিন গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ টেনে নেওয়ার বা চুরি করার ফলে অর্ধেক ভারত অন্ধকার, স্তব্ধ বা অচল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান যুগকে শক্তি বা power-এর যুগ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা পেট্রল, ডিজেল, বিদ্যুৎ নির্ভর যুগে আছি। তাই পেট্রল-ডিজেলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু স্বর্ণমূল্যের এই পেট্রল ও ডিজেল একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বিদ্যুৎ শেষ হবে না। ফলে বিদ্যুৎ-নির্ভরতা বাড়তেই থাকবে। সেই কারণে বিদ্যুৎকে আজ আর পরিষেবা বলা চলে না। বুঝতে হবে যে বিদ্যুৎ হলো উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেকথা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার কথাতেও পরিষ্কার। একথা সকালেই মানবেন যে এই গুরুত্বকে উপলব্ধি করেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯১ সালে খোলা বাজার অর্থনীতি চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সৃষ্ট বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ বাতিল করে নতুন বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করার চিন্তা করেছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ আইন ২০০৫ চালু করার পেছনে কাজ করেছে খোলাবাজার অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে বিদ্যুৎ বাজার সৃষ্টি করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৭ সালে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর তার সামনে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় পুঁজিবাদকে সংহত করা, জাতীয় উন্নয়নের নামে জনসাধারণের দেশপ্রেমকে ব্যবহার করে দ্রুত শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠা। তাই এই সময় প্রকৃতপক্ষে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থকে বাস্তবায়িত করতে চালু করা হয়েছিল মিশ্র অর্থনীতি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তখন বিদ্যুৎশিল্পকে গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ আইন-১৯৪৮ এবং সাপ্লাই কোড-১৯৫৬ সৃষ্টি করা হয়েছিল। যে আইনের মূল বক্তব্য ছিল, বিদ্যুৎ পণ্য নয়। বিদ্যুৎ উন্নয়নের মাধ্যম। সে কারণেই তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। বড় লগ্নির শিল্প বিদ্যুৎশিল্প তখন ভারতের পুঁজিপতিদের দ্বারা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই প্রয়োজন ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণের। আবার ভারতীয় পুঁজিপতিদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হলেও প্রয়োজন ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণের। এতদিনে ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় পুঁজিবাদ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অংশে পরিণত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন ঘটায়

ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে ১৯৯১ সালে মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে নয়া অর্থনীতি বা খোলা বাজারের অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। এই বাজার অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করা হয়েছে। কী আছে এই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ? এই আইনের মূল কথাই হলো ভারতীয় পুঁজিবাদকে বাজার সংকট থেকে মুক্ত করতে একটি বৃহৎ একচেটিয়া বিদ্যুৎ বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

এই বিদ্যুৎ বাজারটি তুলে দেওয়া হবে, খোলা বাজার অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের কাছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের পয়সায় গড়ে তোলা শিল্পকে হয় জলের দরে তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি মালিকদের হাতে অথবা সরকারি নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলা হবে বিদ্যুৎ কোম্পানি বা কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। বিদ্যুৎ হবে পূর্ণাঙ্গ পণ্য। বাণিজ্যিক নীতিতে তার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। বিদ্যুৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া হবে বৃহৎ শিল্পকে। পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতিকে কার্যকর করে ক্রমশই বড় গ্রাহকদের দাম কমানো ও ছোট গ্রাহকদের দাম বাড়ানো হবে। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর যাতে কোনোভাবেই লোকসান না হয় তার জন্য ১৪ থেকে ১৬ শতাংশ রিজিনেবল রিটার্ন (বর্তমানে ইকুইটি রিটার্ন)-এর নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়েছে আইনে।

কিন্তু এই চরমতম ব্যবসায়িক জনস্বার্থবিরোধী আইনটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ করতে পারে নি কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ কর্মচারী, গ্রাহক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আর গৃহস্থ জনসাধারণ মাশুল বৃদ্ধির ধাক্কায় আন্দোলনে সোচ্চার হতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির ওপর আছড়ে পড়েছে আন্দোলন। আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকারগুলো না না কৌশল অবলম্বন করেছে দুকুল রক্ষা করার জন্য। কোনো কোনো রাজ্য সরকার ব্যাপক হারে ভর্তুকি দিচ্ছে বিদ্যুৎ মাশুলে। যেমন, তামিলনাড়ু সরকার, অন্ধ্র সরকার প্রায় দু হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। কোনো কোনো রাজ্য সরকার আবার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে প্রতি বছর APR-র ভিত্তিতে মাশুল বৃদ্ধি করা থেকে বিরত রাখছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলো কোনো কোনো রাজ্যে APR জমা না দেওয়ায় বহুজাতিক সংস্থা ও লগ্নিকারী শিল্পপতিদের চাহিদা অনুযায়ী মাশুল বৃদ্ধি ঘটানো যাচ্ছে না। এর ফলে বিদ্যুৎ শিল্পে বিদেশি লগ্নি আসতে পারছে না।

এই সব সমস্যার সামনে পড়ে যোজনা কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ শিল্পে লগ্নি করতে ইচ্ছুক বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা, দেশীয় লগ্নিকারী এবং বৃহৎ শিল্পকে সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত বন্ধু মনমোহন সিং এবং মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ারা সেই কারণেই দাওয়াই দিয়েছেন- ১) প্রতি বছর প্রতিটি বিদ্যুৎ কোম্পানিকে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করতে দিতে হবে। যদি রাজ্য সরকারগুলো এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে না দেয় তা হলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে কমিশন নিজে উদ্যোগ নিয়ে মাশুল বাড়িয়ে দেয়; ২) এই বর্ধিত মাশুলের বেশিটাই ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থ এবং কৃষি গ্রাহকদের বহন করতে হবে; ৩) এই মাশুলবৃদ্ধির লক্ষ্য হলো গ্লোবাল ট্যারিফ। এই ট্যারিফ যাতে কার্যকর হয় তার জন্য বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ লিখিত থাকলেও রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ দিয়ে বিদ্যুতে ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে। তা না হলে বিদেশি লগ্নি কার্যকর হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে বিগত বামফ্রন্ট সরকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় রূপকার। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গই হলো একমাত্র রাজ্য যেখানে কোনো বিদ্যুৎ কোম্পানিরকোনো লোকসান না থাকা সত্ত্বেও মাশুল বেড়েছে প্রতি বছর, দ্রুত গতিতে। গড় মাশুল ৭০ পয়সা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ২০১০-১১ সালে দাঁড়িয়েছিল ৪ চাকা ২৭ পয়সা। এই মাশুলবৃদ্ধির সিংহভাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সংকটগ্রস্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও গরিব কৃষকদের ওপর। অন্যান্য বহু রাজ্যে সরকার যখন কৃষিকাজে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিয়েছে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ইউনিট প্রতি ৩৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ২৪৩ পয়সা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও পুঁজিবাদের একান্ত অনুগত হিসাবে বামফ্রন্টের এই ভূমিকার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল। আর জনবিক্ষোভকে দমন করতে একদিকে দমনপীড়ন, অন্যদিকে প্রচুর মিথ্যা প্রচার, যেমন কয়লার দাম বেড়েছে, কয়লা খারাপ, ভেজা কয়লা ইত্যাদি করেছে। বিনা টেন্ডারে কোল ব্লক বিক্রি, ভাল কয়লা কমদামে বেচে দিয়ে বেশি দামে খারাপ কয়লা কেনা ইত্যাদি বহু দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। ভর্তুকির অবসান ঘটিয়ে নামমাত্র ১২০ কোটি টাকা করা হয়েছে। রক্তস্নাত আন্দোলনের মাধ্যমে জনতার আন্তরিক ভালবাসার মধ্য দিয়ে এসেছে পরিবর্তনকামী সরকার। কিন্তু বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে জনস্বার্থে কোনো পরিবর্তন হয় নি। একটি দুর্নীতিরও বিচার হয়নি। এই শিল্পে পূর্বতন সরকারের নীতিই নিয়ে এগিয়ে চলেছে বর্তমান সরকার। সেই কারণে বর্তমান সরকারের ১৪-১৫ মাসের শাসনকালে সিইএসসি-তে তিনবার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে চার বার মাশুল বৃদ্ধি ঘটেছে। সিইএসসিতে গড়ে ইউনিট প্রতি দাম গড়ে ৪ টাকা ৭৩ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ টাকা ৩ পয়সা আর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে গড়ে ৪ টাকা ২৭ পয়সা থেকে ৬ টাকা ৬ পয়সা। একে মাশুলবৃদ্ধির এক রেকর্ড বলা যেতে পারে। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এখানে বলা যেতে পারে যে,

এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ গড়ে ১ টাকা ৯৫ পয়সা মাত্র। এক্ষেত্রে মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে- কয়লার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যুতের দাম তো বাড়বেই। কয়লার দাম কতটা বেড়েছে, তার কতটা প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার কোনো তথ্য কি জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছে সরকার? দুর্নীতিগ্রস্ত 'বেঙ্গল এমটা' কোম্পানির কাছ থেকে ২ কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ডোনেশন নেওয়া হয়েছে। মাশুল বৃদ্ধির চাপে যখন গৃহস্থ, কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পে নাভিশ্বাস উঠছে তখন কিন্তু বর্তমান সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি— ২০১১-১২, ২০১২-১৩ সালের মাশুল বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাশুলবৃদ্ধি যাতে একদিনের জন্যও কেউ আটকাতে না পারে সেটাই চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণে বিগত বামফ্রন্ট সরকার MVCA (মান্থলি ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) নামক রেগুলেশনটি চালু করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য মাশুল নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার। এই সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী রেগুলেশনটি প্রতাহার বা প্রয়োগ বন্ধ করা হয়নি। হাইকোর্টে এই বেআইনি রেগুলেশনের বিরুদ্ধে মামলা করা হলে বর্তমান সরকার তার বিরোধিতা করছে। এর ফলে দুই/তিন মাস অন্তর অন্তরই একতরফাভাবে মাশুল বাড়ানো হচ্ছে। পূর্বতন সরকারের মতোই বিদ্যুতে ভর্তুকি বন্ধ হয়েছে। ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে জনসাধারণ। পেট্রল ডিজেল একদিন শেষ হয়ে যাবে, থাকবে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের বাজার বাড়বে ছাড়া কমবে না। একথা মনে রেখে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিশ্ব বিদ্যুৎ বাজার গড়ে তুলতে চাইছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় পুঁজিপতির স্বার্থের প্রতিভূ যোজনা কমিশনের বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে চলেছে বলেই পশ্চিমবঙ্গকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা দরকার মনে করি। তা হলো, যে গ্লোবাল ট্যারিফ করার জন্য এত চেষ্টা চলছে এবং রাজ্য সরকার তাকে সমর্থন করছে, তার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে তা একটি তথ্য দিলেই পরিষ্কার হবে। ২০০৫-০৬ সালে যখন আমাদের রাজ্যে বিদ্যুতের গড় দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা ইউনিট তখন মার্কিন ডলারের হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনে বিদ্যুতের দাম ছিল ইউনিট প্রতি ১৮.২৫ সেন্ট, টাকার হিসেবে ১০ টাকার মতো। ধরা যেতে পারে যে বহুজাতিক সংস্থার লগ্নিকারীদের খুশি করার জন্য আমাদের বিদ্যুতের মাশুল ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি করার নামই গ্লোবাল ট্যারিফ। এই আক্রমণকে মেনে নেওয়া হবে, না ঘাড় গুঁজে ভেড়ার পালের মতো মেনে নেওয়া হবে, তা গ্রাহকদেরই ঠিক করতে হবে। পার্লামেন্টারি রাজনীতির কুৎসিত দিকটিকে আয়ত্ত করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে বামফ্রন্টও নেমে পড়ছে দেখে একথা বলতেই হবে, দ্বিচারিতাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

লেখক ABECA-র সভাপতি

নিউক্লিয়ার শক্তি-কেন্দ্র— কেন বিরোধিতা

সৌম্য দত্ত

১৯৮৮তে স্থির হওয়া একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘিরে তামিলনাড়ু সহ প্রায় সারা ভারত আবার বিক্ষোভে উত্তাল। কোদানকুলাম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু রাজ্যের তিনটি দক্ষিণ দিকের জেলার (কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি এবং তুতকোঘোড়ি) সাধারণ মৎস্যজীবী, কৃষক এবং স্থানীয় মানুষ গত এক বছর ধরে তীব্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশেও আলোড়ন তুলেছে। কোনো মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলের মদত ছাড়াই সাধারণ মানুষ সারাদিন ব্যাপী ধর্না, বিক্ষোভ-সমালোচনা, দফায় দফায় অনশন চালিয়ে আসছেন। প্রবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সত্ত্বেও আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি, বরং তা আরও নতুন নতুন মানুষের যোগদানের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমের একাংশ রাষ্ট্রের কুৎসার সুরে সুর মিলিয়ে এই আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। কিন্তু এই সব কিছু উপেক্ষা করে পুরো তামিলনাড়ু এবং প্রতিবেশী রাজ্য কেরলেও এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই বছরের ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ঐ দিন একদল স্থানীয় মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে এই নিউক্লিয়ার চুল্লির একদিকে পাঁচিলের পাশে ধর্নায় বসেন। স্থানীয় পুলিশ নিরস্ত্র মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক পুরুষদের ওপর নৃশংসভাবে লাঠি চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ভারত সহ পৃথিবীর নানা দেশে ধিক্কার ধ্বনি ওঠে।

কোদানকুলম-এর জন্মকথা

১৯৮৮ সালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সঙ্গে এক চুক্তির ফল হিসেবে এই নিউক্লিয়ার চুল্লির প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তখন থেকেই, বিশেষত ১৯৮৯ থেকে, স্থানীয় মানুষরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যাবেন। তখন বিক্ষোভ অতটা সরব বা ব্যাপক ছিল না। মনে রাখা দরকার যে এই প্রস্তাবের ঠিক দুবছর আগেই তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটেছে চের্নোবিলের মতো দুর্ঘটনা, যদিও কিছু শহুরে বুদ্ধিজীবী

বা সক্রিয় কর্মী ছাড়া বেশি কেউ বিষয়টি নিয়ে ততটা অবহিত ছিলেন না। কিন্তু ২০১১ সালের জাপানের ফুকুসিমা নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনার সময় অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। দূরদর্শনের কল্যাণে এই দুর্ঘটনার যাবতীয় বিবরণ ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। চুল্লি দুর্ঘটনার ভয়াবহতা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে কোদানকুলম-এর মানুষরা আবার আন্দোলনের আগুন তীব্র মাত্রায় জ্বালিয়ে দেন। ফুকুসিমা-র দুর্ঘটনা যেমন সারা পৃথিবীর নিউক্লিয়ার-চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনকারীদের তাদের ন্যায্য দাবি সামনে আনার আন্দোলনকে প্রাণ দেয়, ঠিক তেমনি একই ঘটনা ঘটে ভারতের ক্ষেত্রেও।

রাজ্যে রাজ্যে

কোদানকুলম-এর নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তাবিত নতুন চুল্লি বা পুরনো নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে নতুন চুল্লি বসানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি অঞ্চলের জৈয়তাপুর অঞ্চলে ৯৯৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্বের এতাবৎকালে সবচেয়ে বড় চুল্লির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আন্দোলন গড়ে উঠেছে হরিয়ানা রাজ্যের ফতেহাবাদ জেলার গোরাখপুর অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের চুটখাতে, গুজরাতের মিথিভিরদিতে। অন্ধ্রপ্রদেশের কোভাড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের হরিপুরের আন্দোলনও জাগ্রত আছে। এগুলো সবই প্রস্তাবিত চুল্লির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন। রাজস্থানের বানসারাতে প্রস্তাবিত চুল্লির বিরুদ্ধে বা রাওয়াতভাটাতে চুল্লির প্রসারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাড়ছে।

মেঘালয়ের নতুন ইউরেনিয়াম খনির বিরুদ্ধে খুব শক্তিশালী আন্দোলন চলছে। তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম বা কাড়াপা অঞ্চলের ইউরেনিয়াম খনির বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে ব্যাপক আকারে।

কাইগা, রাওয়াতভাটাতে নতুন চুল্লি বা নতুন নিউক্লিয়ার জ্বালানি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলন তৈরি হচ্ছে।

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ— ভারত সরকারের অবাস্তব পরিকল্পনা

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রেক্ষিতে ভারত সরকার এই দেশটার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে চতুর্দিকে পরমাণু চুল্লি বা চুল্লি-গুচ্ছ দিয়ে তথাকথিত 'নিউক্লিয়ার শক্তি উদ্যান' বানাতে চাইছে। ভারতে 'পরমাণু শক্তি' সংক্রান্ত বিষয়টির পত্তন হয় ১৯৪৮ সাল নাগাদ। এই ৬৪ বছরের পুরানো প্রকল্প তার জীবনকালের শেষ ৪৩ বছর ভারত সরকার তথাকথিক বাণিজ্যিকভাবে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ২০১১ সালে জাপানের ফুকুসিমায় যে প্রজাতির নিউক্লিয়ার চুল্লির বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, ১৯৬৯ সালে ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন চুল্লি, তারাপুর-১, সেই প্রজাতির ছিল। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতার পরিমাণ হলো ২০৫,০০০ মেগাওয়াট। এই উৎপাদন ক্ষমতায় নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের অংশ মাত্র ৪৭৮৫ মেগাওয়াট, বা মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ২.৩ শতাংশ! ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাজেটের সর্ববৃহৎ অংশটি কব্জা ক'রে, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে, ৬০ বছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র ২ শতাংশ উৎপাদন ক'রে ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের কর্ণধারবৃন্দ ২০৩২ সালের ভেতর ৬৩,০০০ মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করার এক অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এখানেই শেষ কথা নয়, কল্পনার ঘোড়া আরও দূর পর্যন্ত ছুটিয়ে দিয়ে তাঁরা ২০৫০ সালের মধ্যে ২৫০,০০০ মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চান। (পাঠক! শূন্যের বহর দেখে ভাববেন না ছাপার ভুল। তথ্যগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁর ভাষণে লিখিতভাবে প্রদান করেছেন!)

এই সমস্ত গগনচুম্বী এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আপাতত সরিয়ে রেখে আমরা ভারত সরকারের নিউক্লিয়ার চুল্লি এবং শক্তি সংক্রান্ত আশু পরিকল্পনা নিয়ে একটু আলোচনা করি। নিউক্লিয়ার চুল্লি নিয়ে এই সমস্ত অতি বড় মাপের ভয়াবহ পরিকল্পনাগুলো ওপর থেকে স্থানীয় জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে এখন পর্যন্ত চালু অপেক্ষাকৃত ছোটো মাত্রার নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলোর বিপদ সম্পর্কে চুল্লির আশেপাশে বসবাসকারি জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে এই সমস্ত চালু ছোটো চুল্লি গুলোর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। যাঁরা এতদিন ভাগ্যের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, ছোটো চুল্লির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁরাও সচকিত হয়ে প্রস্তাবিত বড় চুল্লিগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে আজ ফেটে পড়েছেন। ফুকুসিমার বিপদ আজ তাঁদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে!

কেন বিরোধিতা?

দুর্নীতিতে ভরপুর, ঘুষ আর দালালির টাকায় বড় বড় বরাত হাতানোয় অভ্যস্ত ভারতের দুর্বৃত্ত করপোরেট দুনিয়া বড় বরাতের গন্ধ পেয়ে এই আন্দোলনকে কুৎসা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। তারা বলতে চাইছে এই আন্দোলনে বিদেশি হাত আছে, এই আন্দোলন অযৌক্তিক। ক'টা অশিক্ষিত চাষা আর জেলেকে বিদেশি টাকায় পুষ্ট কিছু ''সন্দেহজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টাকা দিয়ে আন্দোলন করাচ্ছে যাতে ভারতের 'উন্নয়ন' ব্যাহত হয়''। কিন্তু আন্দোলনরত মানুষদের যুক্তি, বিচার আর অনুভব প্রচারের সুযোগ সীমিত। এখন আমরা আন্দোলনের যুক্তিগুলো পরপর

সাজাবো।

১। কোদানকুলম-এর ১ এবং ২ নম্বর ইউনিটটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে, দেশের আইন ভেঙে তৈরি হয়েছে। ভারতের পরিবেশ আইন মোতাবেক এই জাতীয় চুল্লি বসানোর আগে পরিবেশের ওপর এই চুল্লির প্রভাব সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে পরিবেশ মন্ত্রকে জমা দিতে হবে। কিন্তু এই দুটি ইউনিট স্থাপিত হওয়ার পর প্রায় চালু হওয়ার মুখে সেই সমীক্ষা অতি দায়সারা ভাবে করা হয়েছে। আইন মতে এই প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গকে সেই সমীক্ষা রিপোর্টের পুরোটাই দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণ সেই সমীক্ষা-রিপোর্টের সম্পূর্ণ নকল পাননি।

২। যে কোনো নিউক্লিয়ার চুল্লি কোথায় বসবে, ভারতে তা নির্ধারণ করে অ্যাটমিক এ্যানার্জি রেগুলেটরি বোর্ড নামক পরমাণু মন্ত্রকের অধীনে একটি সংস্থা। কিন্তু এই সংস্থা যে যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, কোদানকুলম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার কোনোটাই পালন করেনি। যেমন এই কেন্দ্রের থেকে মাত্র ১ কিমি দূরে ৪৫০টি পরিবারের (মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০) 'সুনামি কলোনি' রয়েছে (২০০৪-এর সুনামি আক্রান্ত পরিবার-গুলির একাংশ এখানে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন)। অথচ নিয়ম মতে, কেন্দ্র থেকে ২ কিমি দূরত্বের মধ্যে কোনো লোকালয় বা বসতি থাকতে পারে না। নিয়ম আরো বলছে যে ৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে ১০,০০০ জন বাস করতে পারবে। অথচ এই অঞ্চলে পড়ছে আন্দোলনের মূল প্রাণকেন্দ্র, ইদিনটাকারাই, যে অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনেক বেশি। ফুকুসিমা দুর্ঘটনার সময় দেখা গিয়েছিলো যে ক্ষতিগ্রস্ত চুল্লিটির চারপাশের ৩০ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে বসবাসকারীদের সরিয়ে নিতে হয়েছিলো। কোদানকুলম অঞ্চলে এই ৩০ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে ১৪ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। এত মানুষকে সরানো বাস্তবত অসাধ্য। তার ওপর, নিয়ম মতে চুল্লিতে জ্বালানি দণ্ড লাগানোর আগে বিপদ ঘটলে যেমনভাবে লোকজন সরিয়ে নেওয়া হবে সে বিষয়ে আগাম প্রশিক্ষণ সহ, বিপদ ঘটে গেছে ধরে নিয়ে মহড়া সংগঠিত করার মারফত লোকজন সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি কয়েকবার করে নিয়ে বিষয়টি সড়গড় করার কথা। কিন্তু জ্বালানি দণ্ড চুল্লিতে চালান করার আগে পর্যন্ত সেই প্রশিক্ষণ এবং সরিয়ে নেওয়ার মহড়া না ঘটায় স্থানীয় মানুষদের ধারণা, এমন কোনো আপৎকালীন পরিকল্পনা হয়ত আদৌ করা হয়নি। এতে স্থানীয় অধিবাসীরা ভীত হয়ে পড়েছেন।

৩। স্থান হিসেবে কোদানকুলম মোটেই এত ভারী নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। এই অঞ্চলের চুনা পাথর সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়ে মাটির তলায় ছিদ্র এবং ফাটল তৈরি করে। নির্মাণের সময় এই বিপদটি নজরে আসায় বারে বারে নির্মাণের ভিত-এর তলায় সিমেন্টের স্তর দিয়ে শক্ত করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু নিউক্লিয়ার চুল্লির মতো এত বিপুল ওজনের নির্মাণকে ধারণ করার ক্ষমতা কোদামকুলম-এর মাটির নেই। নির্মাণের ভিত ফুটো হয়ে যাওয়া, মাটি বসে যাওয়া ইত্যাদির মতো ঘটনা নিকটবর্তী রাধাপুরম ও মারুথাকুলাম-এ ঘটেছে। ২০১১তে পান্নায়ুরকুলম-এর ঘটনাও লোকের স্মৃতিতে টাটকা, ফলে স্থানীয় মানুষ নিউক্লিয়ার চুল্লির মতো এত বড় মাপের নির্মাণকাজ দেখে যথার্থই প্রমাদ গুণছেন।

৪। একে তো মাটি এত ভার বহনে অক্ষম, তার ওপর আবার এই চুল্লি থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্ব ইন্ডিয়া সিমেন্ট সংস্থা চুনাপাথরের খনি চালাচ্ছিল ২০০৫ সাল পর্যন্ত। এর ফলে নিউক্লিয়ার চুল্লির ভিত দুর্বল হযে যাবে। নিয়ম মতে কোনো নিউক্লিয়ার চুল্লির নির্মাণস্থল থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে খনি থাকতে পারবে না। অথচ এই খনির কাজ বন্ধ হলো ২০০৫ সালে, আর এই চুল্লি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ২০০১ সালেই। ফলে খনির কাজ চলেছে যখন নির্মাণের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

৫। পুরো কেন্দ্রটি ভূমিকম্প-প্রবণ। ২০০৬ এবং ২০১১-এই দুবছরে খোদ নির্মাণ অঞ্চলেই ভূমিকম্প হয়েছে। এই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি-জাতীয় কার্যকলাপের আভাষ পাওয়ায় তা ভূমিকম্পের প্রবণতা নির্দেশ করে। ১৯৯৮ থেকে এখন পর্যন্ত মোট চারবার এই আভাষ মিলেছে। তা-ও আবার নিউক্লিয়ার চুল্লির থেকে ৭৫ কি.মি. দূরত্বের মধ্যেই।

৬। এই অঞ্চলে সুনামির বিপদ একটি অতি বাস্তব বিষয়। এই ২০০৪ সালেই এক ভয়াবহ সুনামিতে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় মানুষ বিভিন্ন উচ্চতায় মন্দির, মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ ইত্যাদির কতটা জলমগ্ন হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলছেন যে, সুনামির জল তখন ২০ মিটারের বেশি উচ্চতায় উঠেছিল। আবার চুল্লি-র কর্তাদের মতে সুনামির সময়ে জল উঠেছিলো মাত্র ৮ মিটার! তাই এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সুনামি-নিরোধক দেওয়ালের উচ্চতা দেখা যাচ্ছে মাত্র ৮ মিটার! অনেক জায়গায় তাও নয়। সুনামি ঘটলে সুনামির জলোচ্ছাস যখন ৮ মিটার দেওয়াল ছাপিয়ে নিউক্লিয়ার কেন্দ্রে ঢুকবে, তখন একটি নতুন ফুকুসিমা ঘটবে। স্থানীয় মানুষরা তাই এই সম্ভাবনার জন্য ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন। শুধু এই বিপদই নয়, এই চুল্লির অনেক নির্মাণ সরাসরি সমুদ্র বেলাভূমিতে হয়েছে— যেখানে স্বাভাবিক অবস্থাতেই সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

৭। ফুকুসিমা দুর্ঘটনার পর জানা যাচ্ছে যে চুল্লির দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ক্রমাগত ঠান্ডা করার জলের ভাণ্ডারের অপ্রতুলতা। কোদানকুলমের জন্য এই মিষ্টি জলের ক্রমাগত জোগান যে বেশ সমস্যার বিষয়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখে দু-দুটি রিপোর্ট (এনইইআরও-র করা ইআইএ রিপোর্ট এটি স্থির করেছে, আর মাদ্রাজ হাইকোর্ট এটিকে একটি শর্ত হিসেবে আরোপ করেছে)

বলেছে যে এই চুল্লির জন্য সর্বদা একটি ৬০ হাজার ঘনমিটার আয়তনের জলের ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখতে হবে। ভারতের পরমাণু-মন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত *এইআরবি* নামক যে সংস্থার অধীনে নিউক্লিয়ার চুল্লির সুরক্ষা দেখার বিষয়টি ন্যস্ত, তারাও তাদের রিপোর্টে ঠিক এই পরিমাণ জলের যোগানের কথা বলেছে। ভারত সরকার এই ২০১২ তে চুল্লিটিতে উৎপাদন করবে বলে মনস্থ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁরা সর্বমোট মাত্র ১১ হাজার ঘন মিটার, অর্থাৎ আবশ্যিক প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৬ শতাংশ জলের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তাঁরা নাকি সমুদ্রের নোনা জল নুনমুক্ত করে বাকি জলের ব্যবস্থা করবেন। ফুকুসিমাতেও এমনটাই কথা ছিলো। ভূমিকম্প এবং সুনামিতে প্রথমেই এই নোনা জল শোধন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। ২০০৪ সালের সুনামির পর সমুদ্র সাময়িকভাবে পেছিয়ে গিয়েছিলো। যদি আবার সেরকম ঘটে তবে শোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে নোনা জল মিলবে না!

৮। রাশিয়া ভারতের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে জানিয়েছে যে এই চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে রাশিয়া ভারতের আইন মতে তাদের যে সমস্ত দায় নেওয়ার কথা তার একটাও নেবে না। ভারত সরকার চুপচাপ এই শর্ত মেনে নেওয়ার ফলে আমরা ধারণা করতে পারি যে রাশিয়ার বানানো চুল্লির নক্সাটি এমন যাতে দুর্ঘটনা ঘটা 'অবশ্যম্ভাবী'— তাই আগে থেকে দুর্ঘটনার দায় এড়াতে রাশিয়া এই গোপন চুক্তি করেছে!

৯। এরকম এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তামিলনাড়ুর তিনটি জেলার মানুষ এবং অন্যান্য সচেতন নাগরিকবৃন্দ সরকারের এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন এবং বেঁচে থাকার সংস্থানের জন্য এক ব্যাপক অহিংস আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সরকার যতই এই অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর সন্ত্রাস আর অত্যাচারে বল্গাহীন ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে, মানুষ তত বেশি করে অহিংস আন্দোলন মারফত এই হিংসার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছেন।

আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

নভেম্বর ২০১১ তে চেট্টিকুলাম আর ইদিনটাকারাই গ্রামের মানুষরা একদিন অনশনে সামিল হন। গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলা নিয়ে হয়রানি করানো চলতে থাকে। ইদিনটাকারাই ও আশপাশের গ্রামের প্রায় ৯০০০ গ্রামবাসী যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে অনশন করছেন তখন তাঁদের ওপর পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ নানা অ-জামিনযোগ্য ফৌজদারি মামলা দায়ের করে— এই মামলায় 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' করার অভিযোগ পর্যন্ত ছিলো। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ইদিনটাকারাই গ্রাম পুলিশ ঘিরে রাখে এবং গ্রামের মধ্যে খাবার, বাচ্চাদের দুধ, অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার ওষুধ ইত্যাদিও ঢুকতে দেয় না। গ্রামবাসীদের যুদ্ধবন্দীদের মতো গ্রামে অন্তরীণ রাখার ষড়যন্ত্র করে পুলিশ। গ্রামের বাইরে যাঁরা আসছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যে মামলায় গ্রেপ্তার করাও চলতে থাকে সমান তালে। গ্রামবাসীদের গৃহবন্দী করে রাখার বিষয়টি এপ্রিল ২০১২ থেকে মাঝে মাঝেই ঘটছিলো।

এক সময় র‍্যাফ সহ রাষ্ট্রের নানান সশস্ত্র বাহিনী গ্রামবাসীদের নির্দয়ভাবে পেটায়। পুলিশের এই অত্যাচারের হাত থেকে শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বাদ যাননি। চার্চ কেন এই আন্দোলন মদত দিচ্ছে এই অভিযোগ তুলে পুলিশ বেপরোয়াভাবে চার্চের সম্পত্তি ধ্বংস ও লুঠ করে। আন্দোলনকারীদের বাড়ি ভাঙচুর করা, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করা থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের সমস্ত নৌকো এবং মোটরবোট পুলিশ ভেঙে দেয়। পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজন আন্দোলনকারীদের হত্যা করে, একটি শিশু পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। চার্চ এবং স্বেচ্ছাসেবী যে সমস্ত সংস্থা এই অঞ্চলে বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য প্রকল্প চালাচ্ছিলো, তারা 'বিদেশি মদতদাতা' বলে তামিলনাড়ু সরকার তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রুদ্ধ করে দেয়। আন্দোলনের অন্যতম নেতা উদয়কুমারের স্ত্রীর বিদ্যালয়ের ওপর চড়াও হয়ে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি নষ্ট করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তল্লাসি এবং পরোয়ানা জারি করে।

এত কিছু করেও আন্দোলনকারীদের দমানো যায়নি। তাঁরা পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই নানা রূপে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা তামিলনাড়ুর সমুদ্রে এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে সারাদিন ব্যাপী এক অনন্য ''জল সত্যাগ্রহ'' সংঘটিত করেছেন। জলে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীরা নাকি পুলিশের সঙ্গে ''খণ্ডযুদ্ধ''-এ লিপ্ত হয়েছে এই অভিযোগ রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হিংস্র ভাবে এই অহিংস মহিলা সমাবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও ''পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের'' দেশের হিংসার পূজারীরা একটুও থমকে দাঁড়ায়নি।

জাতির জীবনে এখন এক সংকটকাল উপস্থিত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপ হিংসা এবং সন্ত্রাস দিয়ে ওপর থেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবে। মানুষ তার মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখার জন্য আন্দোলন করবে। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, দেশ বিক্রি করার যে চক্রান্ত চলছে, তার হোমাগ্নিতে দেশের মানুষকেই বলির উপচার হিসেবে শাসকরা করপোরেট দুনিয়াকে উপহার দিতে উদ্যত। এখন সময় এসেছে আমাদের সবার এর প্রতিবাদ করার— সাহসী কাজ করার দিকে এক কদম বাড়ানোর। আজকের সময়ের এটাই দাবি।

BRAI বিল ও জিন প্রযুক্তি

শুভ্রকেতন বসু

ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশ জুড়ে জিন পরিবর্তিত শস্য চাষের তোড়জোড় চলছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে BRAI (বায়োটেকনোলজি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) আইন প্রস্তাবিত হচ্ছে, যে আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছে (ধারা ৬২): "যদি কেউ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে জিন প্রযুক্তির বিরোধিতা করেন তাহলে তার তিন মাস জেল এবং/অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।"[১]

উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে তা এই আইনে স্পষ্ট নয়। কারা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপযুক্ততা নির্ধারণ করবে তাও স্পষ্ট নয়। এমনকি, কিসের ভিত্তিতে এই শাস্তি দেওয়া হবে তাও জানানো বাধ্যতামূলক নয়। এই আইন কার্যকর হলে বায়োটেকনোলজি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নামক আমলা-নির্ভর একটি সংস্থা মনে করলেই জৈব প্রযুক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করে দিতে পারে। ভারতের স্বনামধন্য জীববিজ্ঞানী পুষ্পমিত্র ভার্গব এই প্রস্তাবিত আইন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যারা কোনো রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই জিন-পরিবর্তিত চাষের প্রচলন করতে চাইছে, এই আইনে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই, অথচ যারা এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে চাইছে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা পাকা।[২]

জৈব প্রযুক্তির মতো একটা আপাত-নিরীহ 'অরাজনৈতিক' বিষয় নিয়ে এই ধরনের একটি দানবীয় আইনের প্রস্তাব স্বতন্ত্র মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো ঘটনা বৈকি। তবে শুধু শাস্তিদান নয়, জৈব প্রযুক্তি, বিশেষত জিন প্রযুক্তির, প্রসারের বিরুদ্ধে সবরকম প্রতিবন্ধকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই আইনে।

গোলমাল আইনের শুরু থেকেই। এই আইনে জৈব প্রযুক্তি বলতে মূলত বোঝানো হয়েছে জিন প্রযুক্তি (যে প্রযুক্তির সাহায্যে জিন-পরিবর্তিত ফসল বানানো যায়। আইনের প্রথমে যেখানে জৈব প্রযুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে (ধারা ৩, আর) সেখানে স্টেম সেল, টিসু কালচার, ইমিউনো টেকনোলজি, পেপটাইড সংশ্লেষ, ন্যানো-বায়োটেকনোলজি ইত্যাদির মতো জৈব প্রযুক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভ্রান্ত (এলিট) বিষয়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয় যেন আইনপ্রণেতারা কেবল জিন প্রযুক্তি নিয়েই আগ্রহী।[৩]

এই প্রস্তাবিত আইন মোতাবেক একটি সংস্থা গঠন করা হবে যার নাম বায়োটেকনোলজি রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, বা সংক্ষেপে BRAI। সংস্থাটি হবে আমলা-নির্ভর। বর্তমানে ভারতে জিন-পরিবর্তিত শস্যচাষের অনুমোদন দেবার অধিকারী সংস্থাটির নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি বা GEAC।[৪] এই সংস্থাটি কোনো জিন পরিবর্তিত ফসলকে ছাড়পত্র দিলেও কোনো রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যে সেই ফসলের চাষ নিষিদ্ধ করতে পারে। ভারতের কোনো নাগরিক তথ্য জানার অধিকার আইন মারফত GEAC থেকে কোনো জিন-পরিবর্তিত ফসল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার অধিকারী ছিল। নতুন প্রস্তাবিত আইন মারফত BRAI, GEAC-কে প্রতিস্থাপিত করবে।[৪] জিন প্রযুক্তি সংক্রান্ত অধ্যয়ন, গবেষণা ও জিন-পরিবর্তিত ফসল আমদানি, চাষ ইত্যাদি বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবে BRAI। BRAI যদি কোনো জিন-পরিবর্তিত ফসল চাষ করার অনুমোদন দেয় তাহলে ভারতের যে কোনো রাজ্যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই তা চাষ করা যাবে। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সামান্য আনুগত্য থাকলেও এই ধরনের আইনের প্রস্তাব করা যায় না। কারণ কৃষি সম্পূর্ণভাবেই রাজ্য তালিকার বিষয়। তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার রাজ্যেরই। BRAI আইন তাই অসাংবিধানিকও বটে। শুধু তাই নয়, BRAI জিন প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য গোপন রাখতে পারে (ধারা ২৮)। বর্তমান ব্যবস্থায় যেমন কোনো নাগরিক তথ্য জানার অধিকার আইন বলে জিন-পরিবর্তিত ফসল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে, নতুন প্রস্তাবিত আইনে ভারতীয় নাগরিকদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৫]

BRAI আইন প্রসঙ্গে ড: পুষ্পমিত্র ভার্গব বলেছেন, এই আইন লাগু হলে আণবিক জীববিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও গবেষণায় ব্যবহৃত বহু প্রযুক্তির ব্যবহার বেআইনি হয়ে যাবে, যদি না প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তি ব্যবহারের আগে BRAI থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়। ভারতের আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার সমস্ত উদ্যম BRAI-এর মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমলার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।[৬]

BRAI আইনের ৮১,৮৬ ও ৮৭(২) ধারা মোতাবেক BRAI-এর এক্তিয়ারভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে ভারতে প্রচলিত অন্য কোনো আইনে যাই বলা হোক না কেন তা গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে BRAI -কে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন

(BRAI) বা পরিবেশ সুরক্ষা আইন (Environmental Protection Act)- কে পাশ কাটিয়ে যাবার ক্ষমতা দেওয়া থাকল।[৭]

১৯৪৭-উত্তর ভারতীয় কৃষির ইতিহাসে BRAI-এর মতো কোনো দানবীয় আইন আগে কখনও প্রস্তাবিত হয়নি। যদি এত কিছুর পরেও আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ বলেছেন যে BRAI বিল জিন-পরিবর্তিত ফসলের জন্য অবাধ দরজা খুলে দেবে, এটা অতিরঞ্জন মাত্র। বরং এই বিল জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে একটা বড় পদক্ষেপ।

ভারত সরকার BRAI বিলকে আইনে রূপান্তরিত করতে অতি মাত্রায় আগ্রহী। জিন প্রযুক্তিতে মনসান্টো, সিনজেন্টা, কার্গিলের মতো রাক্ষুসে বহুজাতিকরা বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে। ভারত তাদের কাছে বড় একটা বাজার। এই বাজারে তাদের ঢুকতেই হবে। কিন্তু কৃষিতে জিনপ্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই প্রযুক্তির বিপদ বোঝানোর জন্য যদি 'আগুন নিয়ে খেলা' উপমাটি ব্যবহার করি তা ভয়াবহতার সামান্য অংশই বোঝাতে পারবে। আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে ঘরে আগুন লেগে গেলে ক্ষতি হয় ঠিকই, কিন্তু মানুষ আগুন নিয়ন্ত্রণের কৌশল জানে। তাই আগুনের ক্ষতি করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু জিন পরিবর্তিত ফসল চাষ করলে প্রকৃতিতে কী জাতীয় বিপর্যয় নেমে আসবে, জনজীবনে কী দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসবে তার কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। মানব জ্ঞান এখনও সেই উচ্চতায় পৌঁছায় নি। দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাবে। ভারতে বর্তমানে বিটি-শস্য নিয়ে বিতর্ক চলছে। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস নামক এক ব্যাক্টেরিয়ার বিশেষ জিন কোনো ফসলের কোষে প্রবেশ করলে বিটি-ফসল তৈরি হয়। বিটি (Bt) কথাটি ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিসের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই বিটি-জিনগুলি ফসলের প্রত্যেকটি কোষে কয়েক ধরনের বিষাক্ত প্রোটিন উৎপন্ন করে, যা খেলে পতঙ্গ মরে যাবে।[৮] অর্থাৎ ঐ ফসলের কোনো একটি অংশও যদি পোকাতে খায়, পোকার মৃত্যু নিশ্চিত। মনস্যান্টো কোম্পানি তাই বিটি-তুলোকে সর্ব-পতঙ্গ প্রতিরোধী বলে বর্ণনা করেছিল। তারা প্রচার করেছিল যে এই বিটি-তুলো চাষে পোকা লাগবে না, তাই কীটনাশকের খরচ লাগবে না। ২০০০ সালের প্রথমদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের তুলোচাষিদের কাছে মনস্যান্টো কোম্পানি সাধারণ তুলোবীজের থেকে বহু গুণ বেশি দামে এই বিটি-তুলোর বীজ বিক্রি করেছিল। চাষি ঋণ করেও তা কেনে, কারণ কোম্পানি তাদের লাভের আশা দেখিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বিটি-তুলোর খেত রোগ ও পোকার আক্রমণে উজাড় হয়ে যায়। ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষিমন্ত্রী স্টার টিভি- কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তার রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার প্রধান কারণ বিটি-তুলোর ব্যর্থতা।[৯]

বিটি-তুলোর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, এই 'পতঙ্গ-প্রতিরোধী' তুলো তুলোগাছের সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা পিংক বোল ওয়ার্ম প্রতিরোধ করতে পারছে না। এর কারণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরা দ্বিবিধ সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এমন হতে পারে যে পিংক বোল ওয়ার্মের তীব্রতম আক্রমণের সময় ও কোষের অভ্যন্তরে বিটি-বিষের সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় এক নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, পিংক বোল ওয়ার্মের কোনো জাত প্রাকৃতিক কারণেই (জিন মিউটেশনের ফলে) বিটি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। বিজ্ঞানী মোরিনের (২০০৩) গবেষণা থেকে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির স্বপক্ষে জোরদার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[১০] তথাকথিত সর্বপতঙ্গ-প্রতিরোধী বিটি-তুলোর খেতে তাই প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। বিজ্ঞানী বি ই টাবাশিনিকের গবেষণা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে পিংক বোল ওয়ার্ম কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই বিটি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। তাঁর গবেষণাগারে তিনি এমন পিংক বোল ওয়ার্ম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, বিটি-বিষের বিরুদ্ধে যারা সাধারণ পিংক বোল ওয়ার্মের তুলনায় ২৪০ গুণ থেকে ৪২০ গুণ বেশি প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তুলেছে।[১১]

জিন প্রযুক্তি আর যাই পারুক, পতঙ্গের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যে ভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে পতঙ্গ আর পাঁচটা বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে, সেই ভাবে বিটি-বিষের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। এই সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যটা স্বীকার করে নিলে বিটি-শস্যের মাধ্যমে পতঙ্গ প্রতিরোধ করার দাবির অসারত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু বিটি-তুলো নয়, বিটি-বেগুন, বিটি-ঢ্যাঁড়স, ও বিটি-ধান ইত্যাদি বহুবিধ বিটি-শস্য আমাদের দেশে ঢোকানোর ষড়যন্ত্র চলছে।

বিটি-শস্য চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা বহুবিধ। বিটি-শস্যের মূল থেকে নির্গত বিষাক্ত নির্যাস মাটির বহু উপকারী অণুজীব নষ্ট করে দেয়। যার ফলে মাটির উর্বরতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২] বিটি-শস্যের পরাগ খেয়ে অন্যান্য অ-ক্ষতিকারক পোকা যেমন প্রজাপতি মারা পড়ে, যা পরিবেশের অন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।[১৩] বিটি ফসলের দেহাবশেষের পচনের ফলে প্রকৃতিতে বিটি-বিষ মুক্ত হয়। বিজ্ঞানী রোজি মার্শেলের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে মুক্ত বিটি-বিষ ঝরনার জলে মিশলে বহু জীবের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে এবং পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে।[১৪]

বিটি-শস্যবীজ উৎপাদক কোম্পানিগুলির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, বিটি-বিষ মানুষের শরীরে কোনো ক্ষতিকারক

প্রভাব ফেলে না। কারণ মানুষ বিটি-শস্য খেলে বিষাক্ত বিটি-প্রোটিন মানুষের পৌষ্টিক অন্ত্রে হজম হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, এই দাবি বৈজ্ঞানিক নয়, নিছকই বাণিজ্যিক। কানাডায় বিটি-শস্যের বহুল প্রচলন রয়েছে। সম্প্রতি সে দেশের শেরব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি সমীক্ষায় ৯৩ শতাংশ মা ও ৮০ শতাংশ ভ্রূণের রক্তে বিটি-বিষের সন্ধান পেয়েছেন।[১৬] রক্তে এই বিষের উপস্থিতি অ্যালার্জি, গর্ভপাত, এমনকি ক্যান্সারও ঘটাতে পারে। বিটি-বেগুন, বিটি-ঢ্যাঁড়স, বিটি-ধান বাজারে এলে জনস্বাস্থ্যের কী হাল হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ক্যান্সার রোগির সংখ্যা বাড়লে বহুজাতিকদের তৈরি ক্যান্সারের ওষুধ বিক্রিও বাড়বে সন্দেহ নেই।

জিনপ্রযুক্তি-জাত শস্য চাষ করতে গিয়ে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মহামারী দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানী ডন হুবার, যিনি বিগত ৩৫ বছর ধরে পারদু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে অবসর নিয়েছেন, সম্প্রতি 'রাউন্ড আপ রেডি' নামক এক ধরনের জিন-পরিবর্তিত ফসলের জমিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক অতি-ক্ষুদ্র জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন। এই জীবটির নামকরণ করা হয়েছে 'মাইক্রোফাংগাল-লাইক অর্গানিজম'। ডন হুবারের মতে এটি মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের মধ্যে মারাত্মক মহামারী ঘটাবার ক্ষমতা রাখে।[১৬] রাউন্ড আপ রেডি শস্য চাষ করার সময় জমিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইফোসেট জাতীয় আগাছানাশক ব্যবহার করা হয়। তাতে জমির অন্য সব উদ্ভিদ মারা যায়, শুধু রাউন্ড আপ রেডি ফসল বেঁচে থাকে। এই ভাবে গ্লাইফোসেট জাতীয় বিষ ব্যবহার করে রাউন্ড আপ রেডি ফসল চাষ করার জন্যই এই মারাত্মক রোগবীজাণুটির উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জিন পরিবর্তিত শস্যের হরেক রকম অনিষ্টকারী প্রভাব থাকার জন্য ইউরোপীয় জনগণ এই শস্য চাষের বিরুদ্ধে। তাদের চাপে ইউরোপের বহু দেশের সরকার জিন পরিবর্তিত শস্যচাষ নিষিদ্ধ করেছে। আমেরিকা ও কানাডাতেও জিন-পরিবর্তিত শস্যচাষের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হচ্ছে। অতএব ভারতের বাজার ধরতে হবে। মনস্যান্টো, সিনজেন্টা, কার্গিলের মতো কোম্পানি এদেশে কোটি কোটি টাকার জিন-প্রযুক্তিজাত বীজ বেচার স্বপ্নে মশগুল। তাতে পরিবেশ জাহান্নমে যায় তো যাবে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হলে তো আরও ভালো, ওষুধ বেচে আরও টাকা কামানো যাবে। কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের গণ-আত্মহত্যা, আর ভারতের কিছু বিবেকবান দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকদের সতর্কবার্তায় অনেকেই নড়ে চড়ে বসছেন। বিটি-তুলো চাষ করতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকদের যে হাল হয়েছিল, বিটি-বেগুন চাষ করতে গিয়ে অন্য কোনো রাজ্যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে (যা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল) রাজ্য সরকারের গদি টলে যেতে পারে। ভারতের পাঁচটি রাজ্য (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, কর্নাটক ও হিমাচল প্রদেশ) তাই ইতিমধ্যেই জিন-পরিবর্তিত ফসল চাষ বা পরীক্ষা নিরীক্ষা নিষিদ্ধ করেছে।

এভাবে বাড়া ভাতে ছাই পড়লে বহুজাতিক কোম্পানির রাগ হবারই কথা। তাদের খুশি করার জন্যই ভারত সরকার BRAI নামক এই দানবীয় আইনের প্রস্তাব করেছেন। যাতে সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে অবাধে জিন-পরিবর্তিত ফসলের চাষ করা যায়।

ভারতের হতভাগ্য কৃষক গণ-আত্মহত্যায় সামিল হয়েছে। তারা যদি দেশব্যাপী গণবিক্ষোভে ফেটে না পড়ে তবে এই চক্রান্তের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়।

নির্দেশিকা

১। Bhargava P M, 'Unconstitutional, Unethical, Unscientific', The Hindu article 2752711.ece. 28.12.11
২। www.cipra.in/paper/ BRAI.html
৩। ঐ
৪। Akter Shabin, 'Super Crop or Super Flop', The Telegraph, 25.01.12
৫। ঐ
৬। ঐ
৭। ঐ, এবং ২
৮। Basu S K, 'Look Before You Leap', CARE, SINP, Kolkata, 2012
৯। Deb Debal, 'Industrial Vs Ecological Agriculture', Navdhanya, RFSTE, New Delhi, 2004
১০। Morin Shei et al, 'Insect Resistance to Transgenic Bt Crops; Lessons from Laboratory and Field', 2003, Entomological Society of America
১১। www. pras.org/.../ 0901351106, short
১২। Wallimen : Bt toxin : Assessing G M Strategies, Science, 287:41, 2000
১৩। Meissle J M & Rigler F, Nature Biotechnology, 24:63-71, 2006
১৪। Marshell Rosi, PANS, October 9, 2007, Vol 104, No 41, pras 0707177104
১৫। Aziz A & Leblenc S, Reproductive Toxicology, 10 Feb 204
১৬। Haber Don et al, Interview, 'GMO and Infertility', Feb 2012, Meditation Expert

ঘটনাপ্রবাহ

বাথানীটোলার রায় ও বিহারের সাম্প্রতিকতম রাজনীতি

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের সময়কাল বা প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই বলা যায় ভারতীয় সমাজবিপ্লবের স্তর সংক্রান্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে।

যারা আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক বর্গটি আক্ষরিকভাবে বা যান্ত্রিকভাবে না হলেও বহাল রাখতে চান, তারা মনে করেন যে ভারতে সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশ এখনও বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যমান— যদিও বহিরঙ্গের দিক থেকে অনেক কিছুই পাল্টে গিয়েছে, পুরনো বৈশিষ্ট্যগুলির জায়গায় যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু নতুন দিক। ভারতবর্ষের যে সমস্ত রাজ্যে এই বিশেষ দিকগুলি লক্ষণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বিহার রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়ে যখন এখানকার সচেতন নাগরিক সমাজ জঙ্গলমহলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, চলছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক বিতর্ক ও মতামতের আদানপ্রদান (দ্রষ্টব্য: 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা), ঠিক সেই সময়ই প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে ১৯৯৬ সালে ঘটে যাওয়া বাথানীটোলা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত বিহার হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হল। আদালতের রায় ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। তবে এই রায় যে সে রাজ্যের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে এনেছে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

২০১০ সালে আরা-তে জেলা আদালত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মোট ২৩ জন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির বিধান দিয়েছিল।[১] দু-বছর বাদে পাটনা ওই ২৩ জনকেই নির্দোষ আখ্যা দিয়ে মুক্তি দিয়েছে।[২] কী ঘটেছিল ১১ জুলাই ১৯৯৬ বাথানীটোলাতে? ১৬ বছর আগে ঘটে যাওয়া এই গণহত্যার মূল ঘটনাবলীকে আরও একবার স্মরণে আনা যেতে পারে।

প্রেক্ষাপট

সেদিন মধ্য-বিহারের ভোজপুর জেলার বাথানীটোলায় ২১ জনকে— যাদের বেশিরভাগই ছিল নারী ও নাবালক— এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও— দিনের আলোয় কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই সমগ্র দেশবাসী এই অখ্যাত ছোট গ্রামের অস্তিত্ব এবং রণবীর সেনার মত সামন্তপ্রভুদের বাহিনী সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।

বাথানীটোলা ঘটার সময় অনেকেই ভেবেছিলেন, এটা বোধহয় বিহারের জাতপাত-জনিত আর একটি গণহত্যার ঘটনা, যার উৎসে রয়েছে জমিসংক্রান্ত বিবাদ। কিন্তু এই সাধারণ ধারণার বিপরীতে বাথানীটোলা ছিল স্পষ্টতই এক রাজনৈতিক গণহত্যা। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল নকশালপন্থীদের এক উচিত শিক্ষা দেওয়া। দিনের আলোয় সংগঠিত এই গণহত্যার যে নৃশংস বর্বরতা দেখা গিয়েছিল তা কেবলমাত্র জনজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশে সংগঠিত গণহত্যাতেই দেখা যায়। মহিলাদের নিশানা করা হয়েছিল, কারণ তারা 'নকশালপন্থীর জন্ম দেবে'। শিশুদের চিহ্নিত করা হয়েছিল, কারণ তারা 'নকশালপন্থী হয়ে যাবে'। আবার কেউ কেউ এও মনে করেন যে জমি ও মজুরির প্রশ্নে নকশালপন্থীদের আন্দোলনের বাড়াবাড়ির সামাজিক প্রতিক্রিয়াতেই নাকি বিহারে রণবীর সেনার মত ভাড়াটে সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছে।

১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সামন্ত-মৌলবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে সাহার ব্লকের খারাঁও পঞ্চায়েতের মুখিয়া নির্বাচিত হন মহম্মদ ইউনুস। এই জনপ্রিয় মুখিয়ার নেতৃত্বে খাঁরাও এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের গরিব মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই বিপুল সংখ্যায় সিপিআই(এমএল)-এ যোগ দেন। ১৯৯৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাহার (তপসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত) ও পার্শ্ববর্তী সন্দেশ বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে প্রথমবারের জন্য বিজয়ী হয় সিপিআই(এম এল)। বিজয়ী প্রার্থীরা ছিলেন ১৯৬৭-তে সিপিআই(এম)-এর হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেই রামনরেশ রাম, যিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন বিহারে সিপিআই(এমএল)-এর প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং রামেশ্বর প্রসাদ, যিনি ছিলেন আরা থেকে নির্বাচিত আইপিএফ-এর প্রাক্তন সাংসদ।

ভোজপুরের সামন্তপ্রভুরা এতে শঙ্কিত ও রীতিমতন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বিহারের মাটি থেকে সিপিআই(এমএল)-কে মুছে ফেলবার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয় রণবীর সেনা। ইমামবাড়া এবং কারাবালা জমির ওপর মুসলিম জনগণের চিরাচরিত অধিকারকে অস্বীকার করে খারাঁও-তে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক জমায়েত। জমি ও অধিকার রক্ষার লড়াই চালাতে গিয়ে অনেক মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হয় এবং তারা খারাওঁয়ের দলিত অধ্যুষিত বাথানীটোলায় বসবাস শুরু করে। দলিত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের এই গ্রামীণ গরিব মানুষগুলোই ১৯৯৬-এর ১১ জুলাই আক্রান্ত হয়েছিল।

বাথানীটোলার পর দ্রুতই ঘটে গেল লছমনপুর বাথে-র গণহত্যা। শোন নদীর দু-ধারের অজানা ছোট জনপদ বাথানি এবং বাথে জাতীয় সংবাদ হয়ে ওঠে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন বাথানীটোলার ঘটনাকে 'জাতীয় লজ্জা' বলে বর্ণনা করেন। জয় গোস্বামী লিখেছিলেন এক অনবদ্য রচনা—

'মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে'। কবির চোখে আরওয়াল, বাথানীটোলা আর লছমনপুর সেদিন একাকার হয়ে গেছিল।

পট-পরিবর্তন

এই প্রেক্ষিতেই লালুপ্রসাদ বাধ্য হলো রণবীর সেনার পেছনে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক মদতের অনুসন্ধানের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট বিচারপতি আমির দাসের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করতে। ২০০০ সালের নভেম্বরে বিহারে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। এবং বিজেপির সমর্থনপুষ্ট হয়ে নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হন। সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম ছিল আমির দাস কমিশনকে বাতিল করা। জেডিইউ ও বিজেপি নেতাদের অনেকেই, এমন কি আরজেডি বা কংগ্রেসের অনেক নেতাও, এতে গভীর স্বস্তিবোধ করেছিলেন, কারণ তদন্তের জন্য এই কমিশন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

নীতিশের দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজত্বের প্রারম্ভেই জামিন পেয়ে যান রণবীর সেনার মূল পাণ্ডা ব্রহ্মেশ্বর সিং, যিনি ২০০২ সালে সরকারের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করেছিলেন। তারপর এখন বাথানী গণহত্যায় অভিযুক্তদের হাইকোর্টমুক্তি দিয়ে দিলেন।[৩] নীতিশকুমারের দ্বিতীয় দফার প্রথমেই সাংবাদিক অমিতাভ গুপ্ত লিখেছিলেন: "জানতে চাইলাম, বিহার সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর একটা রাজ্য। এই রাজ্যে নব্বই শতাংশ মানুষ গ্রামে থাকেন, কৃষি তাদের মুখ্য জীবিকা। তা হলে, মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম পাঁচ বছর কেন রাস্তাই তাঁর উন্নয়নের প্রধানতম অভিমুখ হয়ে থাকল? কেন কৃষি অগ্রাধিকার পেল না?..." বিহার সরকারের কৃষিনীতিতে বৃহৎ সেচের উল্লেখ নেই। ভূমি সংস্কারের প্রশ্নেই বা কোথায় দাঁড়িয়ে নীতিশ কুমার সরকার? বিহারে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ভূমিহীন অথবা অতি সামান্য জমির মালিক। যে রাজ্যের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে এই হিসেব মারাত্মক— দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ এই অসম ভূমিবন্টন। কৃষির উৎপাদনশীলতাও যথেষ্ট কম। সমস্যাগুলো নীতিশ কুমার খুব স্পষ্টভাবে জানেন। ২০০৫ সালে যখন ক্ষমতার এসেছিলেন তিনি, তখন ভূমি সংস্কারের কথা তাঁর প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কমিশন তৈরি হয়েছিল। কমিশন রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাও প্রায় দেড় বছর হল। কিন্তু ভূমি সংস্কার এগোয়নি। ".....ভূমি সংস্কারের প্রকল্প বিশ বাঁও জলে। কেন, বোঝা কঠিন নয়। নীতীশ কুমারের উন্নয়নের রথ এত দিন যে পথে চলেছে, সেই পথটি 'শ্রেণী-নিরপেক্ষ', তাতে বড়লোক-গরিব নির্বিশেষে সবার লাভ। রাস্তা তৈরিতে যেমন। ভূমি সংস্কারের গল্পটা ঠিক তার বিপরীত— তার শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট। অর্থবান এবং ক্ষমতাবান শ্রেণীকে চটিয়ে ভূমি সংস্কারের পথে নীতীশ হাঁটতে পারেন কি না, সেটা বড় প্রশ্ন। এখনও পর্যন্ত সেই পথে হাঁটতে চাওয়ার বিশেষ লক্ষণ নেই।"[৪]

রণবীর সেনা

বাথানীটোলাই হোক আর লছমনপুর বাথেই হোক— এই গণহত্যাগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে রণবীর সেনার সামাজিক-রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কংগ্রেস-শাসিত বিহার ১৯৭০, ১৯৮০-র দশকে বেশ কিছু প্রাইভেট সেনাবাহিনীর উত্থান দেখেছে। এই সমস্ত সেনাবাহিনীগুলি স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থেকেছে— একটি বা দুটি জেলায় এগুলির বিস্তৃতি ঘটেছিল, যেমন পাটনা এবং জেহানাবাদে ভূমি সেনা, পালামৌতে সানলাইট সেনা, নালন্দাতে লোরিক সেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামীণ গরীবদের সঙ্গে উত্তপ্ত শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে বিলীন হয়ে যায়। রণবীর সেনার উত্থান কংগ্রেস রাজত্বের পরবর্তীতে লালু প্রসাদের আমলেই— যখন তিনি সামাজিক ন্যায় আর দরিদ্রের মর্যাদা শ্লোগান তুলে জন-মোহিনীবাদের মায়াজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন।

বিহারের জোতদার-পুষ্ট এই সব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী উচ্চ বর্ণ এবং প্রশাসনের স্নেহধন্য ছিলো। রণবীর সেনা এক লিখিত বিবৃতি মারফত বিজেপি-র প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে।

ব্রহ্মেশ্বর সিংহের বিদায়

ইতিমধ্যে ঘটে গেল রণবীর সেনার মূল পাণ্ডা ব্রহ্মেশ্বর সিংহের নিহত হওয়ার ঘটনা। (১ জুন ২০১২) বাথানীটোলা ঘটনার পরিবর্তীতে পুলিশ ব্রহ্মেশ্বর সিংহ ও তার তিন সহযোগীর নামে কোনো এফআইআর করেনি। লছমনপুর বাথের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। যখন আরা আদালত ২৩ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল (মে ২০১০) তখন ব্রহ্মেশ্বর-কে ঘোষণা করা হয়েছিল 'পলাতক' হিসেবে। যদিও ২০০২ সালে অন্য মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মেশ্বর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তখন থেকে আরা জেলেই বন্দী ছিল। জুলাই ২০১১ তিনি মুক্ত হন, কারণ বিহার সরকার তার জামিনের আবেদন অস্বীকার করেন নি।

ব্রহ্মেশ্বর সিংহের নিহত হওয়ার ঘটনায় বাংলায় সর্বাধিক বিক্রীত পত্রিকার সম্পাদকীয়— 'পরিণতি'। বক্তব্য: "রণবীর সেনা বিহারের উচ্চবর্ণীয় ভূমিহার জাতের ভূস্বামীদের নিজস্ব মিলিশিয়া বা বেসরকারি ফৌজ, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল মূলত নিম্নবর্গীয় খেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকদের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সশস্ত্র এই বাহিনীর হাতে বিহারের লছমনপুরবাথে, জাহানাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, নওয়াদা, মিয়াপুর, বাথানীটোলায় গত শতকের... নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত অগণিত দলিত গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে দলিত মহল্লা ভস্মীভূত করার বর্বরতায় গোটা দেশকে স্তম্ভিত করিলেও রণবীর সেনার সংঘটক ব্রহ্মেশ্বর সিংহের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই হত্যাকাণ্ড, দুর্ভাগ্যজনক হইলেও 'অহেতুক'

নয়।" (নিম্নরেখা আমার)[৮]

একই সঙ্গে চলছে বাথানীটোলা হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচারের দাবীতে ব্যাপক গণসংগ্রাম। খোদ আরা জেলাতেই ১১ জুলাই ২০১২ সংগঠিত হয়েছে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ। ১৫ জুলাই দিল্লীর কনস্টিটিউশন ক্লাব-এর স্পিকার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বাথানীটোলার (১৯৯৬) জন্য ন্যায়বিচার— দোষীদের শাস্তি চাই' শীর্ষক এক কনভেনশন। বাথানীটোলা ঘটনার অভিযুক্তদের মুক্তির এই সাম্প্রতিক ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রথিতযশা বিচারক; আইনজীবী, বিদ্বৎজন এবং গণআন্দোলনের কর্মীরা গড়ে তুলেছেন 'বাথানীটোলার জন্য নাগরিকবৃন্দ' নামের এক নাগরিক সমন্বয়। কনভেনশনে উপস্থিত বক্তা ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি রাজিন্দর সাচার, ইতিহাসবিদ উমা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা নন্দিনী সুন্দর, অধ্যাপক কমল মিত্র চেনয় প্রমুখ।[১৩] যথার্থ ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়ে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছেও একটি পিটিশন পেশ করেছেন।[১৪] সামাজিক ন্যায়, সুষ্ঠু বিচারের ব্যবস্থা, দলিত ও নিপীড়িত মানুষদের মর্যাদা ও ইজ্জত রক্ষা করা এবং সামগ্রিক ভাবে গণতন্ত্রের দাবিতে দেশজুড়ে এই সংগ্রাম অব্যাহত।

তথ্যসূত্র

১। এর জন্য দ্রষ্টব্য— Except from Ara Session Court Verdict, 12.05.2010

২। দেখুন— Excerps from Bihar HC : Verdict of April 16, 2012
উপরোক্ত দুটি রায়ের জন্য দ্রষ্টব্য— Appendices stand by Bathani Tola : In the Battle for a New and Just Bihar (CPIML Publication, May 2012)

৩। *আজকের দেশব্রতী*, ২১ জুন ২০১২

৪। নীতিশের উন্নয়নের সড়ক কোন গন্তব্যে পৌঁছবে— অমিতাভ গুপ্ত (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৭ জানুয়ারি, ২০১১)
এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য— Lost Oppurtunity in Bihar – D. Bandyopadhyay (*EPW*, Nov 21-27, 2009)

৫। বাথানীটোলা হত্যাকান্ড : সরকারী প্রচার বনাম রূঢ় সত্য, ১৯৯৬

৬। *The Indian Express*, June, 4, 2012

৭। Ranaveer Sena Revisited : Feudal Kulak Power and Lalu-Nitish Continuum (*Liberation*, August, 2012)

৮। 'পরিণতি'— সম্পাদকীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪ জুন ২০১২
আরও দ্রষ্টব্য: ৫ জুন ২০১২-তে *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় Jamal Kidwai-এর প্রবন্ধ

৯। 'সরকার কাজ করবে, বিহারে এখন বিশ্বাসের হাওয়া', অমিতাভ গুপ্ত (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৬ জানুয়ারি, ২০১১)

১০। *Outlook*– June 18, 2012

১১। *বর্তমান*, ২৪ মে, ২০১২

১২। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫মে, ২০১২

১৩। *আজকের দেশব্রতী*, ১৯ জুলাই, ২০১২

১৪। *Liberation*, June, 2012

গ্রন্থ সমালোচনা

মমতার মুখোশ উন্মোচনে নজরুল সফল, কিন্তু মুসলমানদের সঠিক দিশা দিতে ব্যর্থ

গিয়াসুদ্দিন

নজরুলের 'মুসলমানদের করণীয়' বইটা মমতা সম্প্রতি ঘুরপথে (পুলিশ দিয়ে) নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রবল প্রতিবাদের জন্য পারেন নি। বইটিতে অবশ্যই মমতার রুষ্ট হবার যথেষ্ট উপাদান আছে। লেখক লিখেছেন, মমতা মুসলিমদের উন্নতির নামে যা যা করছেন তাতে তাঁদের কোনো কল্যাণ হবে না, এবং কল্যাণ করার জন্য তিনি সে সব করছেনও না— করছেন কেবল ভোট পাবার জন্য। এটা যে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা, যেমনটা সিপিএমও করেছে, তা বলাই বাহুল্য। মমতার এই প্রতারণার মুখোশটি লেখক উন্মোচন করতে চেয়েছেন, এবং দক্ষতার সঙ্গে করেছেনও। হজে ভরতুকি, ইমাম ভাতা, মাদ্রাসা, সংরক্ষণ, রোজা এফতারের পার্টিতে যাওয়া প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্ন ধরে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, মমতা কীভাবে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করছেন।

হজে ভরতুকি তুলে দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট, তবু সরকার প্রত্যাহার করছে না, কারণ তাতে নেতা-নেত্রীদের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক ইসলামের বিধানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যাঁদের সামর্থ্য আছে কেবল তাঁদের জন্যই হজ করার বিধান। তাই হজে ভরতুকিতে সাধারণ মুসলমানের স্বার্থ নেই। ইমামদের ভাতা দেওয়াকে তিনি তাঁদের সঙ্গে মমতার 'আরো বড় প্রতারণা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''খলের ছলের অভাব হয় না। কয়েকটি মামলা তো হয়েই আছে। দরকার হলে আরো কয়েকটি হবে। সে মামলার রায় হয়ে যাবে, সরকারি অর্থে ইমামদের ভাতা দেওয়া যাবে না। তখন ইমামদের আমও যাবে, ছালাও যাবে।'' (পৃ. ৮০) তিনি আরো লিখেছেন, ''দু-চারজনকে ভাতা দেওয়া হবে। বাকিরা সেই দু-চারজনের মধ্যে ঢোকার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবেন। মামলায় জড়িয়ে আবার শাসক দলের নেতাদের পেছন পেছন ঘুরবেন।''

দশ হাজার মাদ্রাসার অনুমোদন দেবার ঘোষণাকে শুধু মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি নজরুল। তিনি এটাকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''তাঁরা চান, মুসলমানরা... খারিজি মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে বেশিসংখ্যায় মসজিদের ইমাম বা এরকম খারিজি মাদ্রাসার মাসে দু-তিন হাজারের চাকরি নিয়ে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকুক। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সন্তানরা নেতা-মন্ত্রী হোক, আইএএস, আইএফএস, আইপিএস, আইআরএস প্রভৃতি জীবিকায় গিয়ে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি, সিপি, ডিএম, এসপি হোক।'' নজরুল আরো লিখেছেন, মমতা মুসলমানদের কত বোকা ভাবেন এবং কীভাবে মাদ্রাসার সুড়সুড়ি দিয়ে তাঁদের ভোট আদায় করা সম্ভব। লিখেছেন, ''আবার ভোটের জন্য মুসলমান এলাকায় স্কুল তৈরি না করে দুয়েকটা মাদ্রাসাকেই অনুমোদন দেব। বলব, ''ওরা ৩৪ বছরে মুসলমানদের জন্য কিছুই করে নি। আমরা করব।'' তারপর ক্ষমতায় এসে কিছু না করেই কয়েকদিনের মধ্যেই বলে দেব, ''৯০ শতাংশ কাজই করে দিয়েছি, তা মানতেই হবে।'' মুসলমানরা এসব কিছু বোঝে নাকি যে মুসলমানদের জন্য কিছু করতে হবে?'' (পৃ. ৮২, ৮৩)

মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়াটাকেও একটা বড় ধাপ্পা বলেছেন নজরুল। বলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে চাকরিতে সংরক্ষণ পেলে মুসলমানদের কোনো লাভ হবে না। তিনি এ প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, তারা মরার সময় হরিনাম করার মতো মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা করে গেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মমতার আন্তরিকতা নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রদর্শন করেছেন, এমনকি তিনি মমতাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীনও বলেছেন। তিনি লিখেছেন, মুসলমানদের সংরক্ষণ নিয়ে যখন মামলা চলছে সে সময় একটি জনসভায় (১৯.০৪.১২) তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের অর্ডার বের করে দেবেন। তিনি লিখেছেন, মমতা যথারীতি কথা রাখেন নি— ''কোন আদেশ বের হয় নি। তাঁর ঘোষণা দেওয়ার দরকার ছিল। দিয়ে দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।'' (পৃ. ৮৮)

নজরুল বোধহয় সবচেয়ে বেশি চটেছেন মমতা এফতার পার্টিতে গিয়ে 'খোদা হাফেজ' 'ইনশাল্লাহ' ইত্যাদি বলার জন্য। এজন্য মমতাকে তিনি ক্ষমতাখোর বলে তীব্র কশাঘাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঐ শব্দগুচ্ছগুলোর মানে-মতলব কিছু না বুঝেই শুধু ভোটের জন্য ওসব করেন মমতা। তিনি এটাকে মুসলমানদের নেশাগ্রস্ত করে ভোট নেওয়ার ছল বলতে চেয়েছেন। লিখেছেন, ''নেশাখোরেরা যেমন মাদকতার মাত্রা বাড়ানোর জন্য নেশার দ্রব্যের সঙ্গে ধুতুরার বিচি মিশিয়ে দেয়, তেমনি এই ক্ষমতাখোররা ক্ষমতা লাভের জন্য বক্তৃতার মাঝে ভুলভাল জায়গায় উচ্চারণ করছেন, ''খোদা হাফেজ ইনশাল্লাহ''। এটা ন্যক্কারজনক।'' (পৃ. ৯২, ৯৩)

'মুসলমানদের বন্ধু সেজে থাকাটা একটা মুখোশ'— মমতার

মুসলমানদের করণীয়: নজরুল ইসলাম। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। দাম ১০০ টাকা।

এই মুখোশটা উন্মোচন করা এই বইটার একটা উদ্দেশ্য, যেটা খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছেন নজরুল। এছাড়া আরো দুটি অংশ আছে বইটিতে। একটি অংশ হলো মুসলমানরা কেন পিছিয়ে সেদিকটায় আলোকপাত করা এবং আর একটি মুসলমানদের কী করণীয় তা বলা। প্রথম অংশে নজরুল যতটা সফল, বাকি অংশ দুটিতে তিনি ততটাই ব্যর্থ। বইটির এই দুটি অংশই আমি মনে করি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মূল ফোকাস মমতার সৌজন্যে চলে গিয়েছে মুসলিমদের প্রতি প্রতারণার দিকে। মানুষ জানতে চায় কী এমন লিখেছেন নজরুল মমতার বিরুদ্ধে।

নজরুল লিখেছেন, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই মুসলমানদের পিছিয়ে দিয়েছে এবং পিছিয়ে রেখেছে। হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথাকেই মুসলমানদের 'শোষণের নির্মম যন্ত্র' বলে চিহ্নিত করেছেন। লিখেছেন, ''ঋকবেদ থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধান আমাদের পিছিয়ে রেখেছে।'' (পৃ. ৩৮) নজরুলের এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক। তিনি মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। তার ফলেই একটা গুরুতর ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের যে দিশা দেবার চেষ্টা করেছেন তাতেও রয়েছে গুরুতর ত্রুটি ও ভ্রান্তি।

যে কোনো সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক নীতি ও ভিতের ওপর। জাত-পাত, বর্ণপ্রথা এসব সমাজের উপরিকাঠামো। এই উপরিকাঠামো একেক সমাজে একেক রকম হয়। আসল হলো অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থা। সেই নীতিটা ঠিক হয় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, জাতপাতের ভিত্তিতে নয়। হয় শোষক শ্রেণীর (পুঁজিবাদী বা সামন্ত শ্রেণী) পক্ষে, না হয় শোষিত শ্রেণীর পক্ষে। এই নীতিই ঠিক করে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কীরকম হবে। প্রত্যেকটি দেশের সরকার পরিচালিত হয় সেই নীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে। সরকার তাই আপাতদৃষ্টিতে আমজনতার মনে হলেও সে আসলে কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থ বহন করে। প্রতিটি সরকার তথা রাষ্ট্রের তাই শ্রেণীচরিত্র থাকে। থাকেই। আমাদের দেশের সরকার পরিচালিত হয় মূলত বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা, তাতে কিছুটা সামন্ত শ্রেণীরও ভাগ আছে। প্রণব-মমতা ও বুদ্ধ-বিমানরা উচ্চ শ্রেণীর লোক হলেও শোষক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করেন, করতে হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে এর অন্যথা হবার জো নেই। উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের লোক হলেও ঐ নেতা-নেত্রীরা বুর্জোয়াশ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করেন। মনে রাখা দরকার, বুদ্ধ-বিমানরা নামেই কমিউনিস্ট। না তাঁরা গরিব মানুষের লোক, না উচ্চবর্ণের লোক। ওঁরা যদি উচ্চবর্ণের সরকার চালাতেন তবে উচ্চবর্ণের কোনো মানুষ দরিদ্র থাকতেন না। কিন্তু এই বাস্তবটা স্বীকার করতেই হবে যে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ উচ্চবর্ণের মানুষও আছেন। এর বিপরীত ঘটনাও আছে। নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যেও সংখ্যায় কম বা নগণ্য হলেও কোটিপতি বা পুঁজিপতিরা আছেন। আছেন সব থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের মধ্যেও। পতাকা বিড়ি, হাওড়া বিড়ি, শিব বিড়ি প্রভৃতি বিড়ি কোম্পানির মালিকরা সবাই মুসলমান। এরা সবাই উদীয়মান পুঁজিপতি ও শিল্পপতি। বুর্জোয়া সমাজে এরকম হয়েই থাকে। শিল্পপতি বা পুঁজিপতিরা শিল্প বা বৃহৎ ব্যবসা পরিচালনা করেন অতি মুনাফার (শোষণ) লালসায়, তাঁরা নিজে কোন্ জাতের লোক, যাঁদের শোষণ করছেন তাঁরা কোন জাতের লোক, সেসব দেখতে চান না।

নজরুল ইসলাম মুসলমান ও শূদ্রদের ডাক দিয়েছেন জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলার ও উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। এটা করলে যে তাঁরাও ক্ষমতা দখল করতে পারবেন তার প্রমাণ হিসাবে লালুপ্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিং যাদব, অখিলেশ সিং যাদব, মায়াবতীদের দৃষ্টান্ত টেনেছেন। কিন্তু অর্থনীতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে ভোটে জিতে সরকারে গেলেও পুঁজিপতি শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করতে হয় এবং গরিব মানুষদের গরিবি মোচন করা যায় না— এই বাস্তব সত্যটা নজরুলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের নিম্নবর্ণের মানুষরা যে তিমিরে ছিলেন সে তিমিরেই রয়ে গেছেন, তাঁদের অবস্থা ও অবস্থানের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। গরিব মানুষের ভোটে যাঁরা ক্ষমতায় গিয়েছেন তাঁদের মধ্যেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কোটিপতি হয়েছেন।

নজরুল আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেছেন। মুসলমানরা তাঁদের পশ্চাদপদতার জন্যে নিজেরাই যে অনেকটা দায়ী সে প্রসঙ্গে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। মুসলমানদের উন্নতির পথে একটা মস্ত বড় বাধা হলো মোল্লাতন্ত্র। শরিয়তি আইনের দ্বারা মুসলিম সমাজ আজও পরিচালিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করার অবকাশ নেই এখানে। শুধু এটুকুই বলবো, মোল্লাতন্ত্রকে পরাস্ত করতে না পারলে মাদ্রাসা শিক্ষা ও শরিয়তি আইন ও সংস্কৃতির (যা মুসলিমদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়) বেড়াজাল ছিন্ন করা অসম্ভব। শুধু সরকারকে দোষারোপ করে লাভ হবে না, মুসলমানদের সব আগে আত্মসমীক্ষা ও আত্মসংশোধন করতে হবে। আশ্চর্যজনকভাবে নজরুল মোল্লাতন্ত্র সম্পর্কে নীরব থেকে গেছেন। নজরুল কি গরিব হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে যে সংগ্রাম করার ডাক দিয়েছেন তাতে মোল্লাতন্ত্রকেও সামিল করতে চান? বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের মানুষদের সংগ্রাম করার যে ডাক দিয়েছেন নজরুল তা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক ডাক। এতে মুসলিম মৌলবাদীরাই উৎসাহিত হবে।

নাট্য-আলোচনা

অনাগত

দীপংকর চক্রবর্তী

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে চমৎকার পরিচালনা ও নাট্যভাবনা, মঞ্চায়ন, আলো ও অবশ্যই অভিনয়ের দক্ষতায় চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া একের পর এক নাটক প্রযোজিত হচ্ছে, দলে দলে মানুষ আসছেন নাটক দেখতে— আমাদের নাট্যজগতে যেন জোয়ার এসেছে। অবশ্য নতুন করে নাটকের প্রতি মানুষের এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত সদ্য-ক্ষমতাচ্যুত বাম জমানার শেষ দিকে, যখন ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের ধারাবাহিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে ব্যাপক মানুষের ক্ষোভ ও অবরুদ্ধ ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটছিল ব্যঙ্গ ও তির্যক কটাক্ষের আকর বেশ কয়েকটি নাটকে। কিন্তু প্রথমে কিছুটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও ক্রমশ ধরা পড়ছিল, সেই সব নাটকের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল অধঃপতিত বামরা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে বামপন্থী মতাদর্শ। আর এর পাশাপাশি, অনেক দিন আগেই যার সূচনা হয়েছিল, মাথা তুলছিল অন্য এক ধারার নাটক, যেগুলি তেমন চক্চকে বা বিপণন-ধন্য না হয়েও, সততার সাথে 'আমরা-তারা'-র উর্ধ্বে থেকে রাজ্যের বা দেশের প্রকৃত বাস্তবতাকে, তার অভিমুখকে বা অনাগত সম্ভাবনাকে ইঙ্গিতবহ ভঙ্গিতে, ঠিক যেন হাজার পাওয়ারের হ্যালোজেন আলো যেখানে পৌঁছোয় না সেখানে আলো ছড়ানো ছোট্টো মাটির প্রদীপের মতো, প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে চলেছিল। আমরা যারা যথেষ্ট প্রবীণ, ষাটের দশকের বামপন্থী গণআন্দোলনের বা সত্তরের দশকের আত্মদানকারী অকুতোভয় বিপ্লবী লড়াইয়ের আবহে যৌবনের দিনগুলি কাটিয়েছি, 'কল্লোল' ছাড়াও 'মারীচ সংবাদ' বা 'কলকাতার হ্যামলেট' দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তারা কিন্তু আজও সেই ধারার নাটকেরই প্রতীক্ষায় থাকি। কৌশিক সেনের কয়েকটি নাটক ছাড়াও অতিসম্প্রতি মঞ্চস্থ এরকমই অন্যতম একটি নাটক 'অনাগত', 'চোখ' নাট্যসংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত। নাটকটি কলকাতায় প্রযোজিত হচ্ছে বেশ কয়েক মাস ধরে, স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়া একে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি।

নাটকের কাহিনী যেন পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন বাস্তবতা থেকেই প্রায় অবিকল তুলে আনা হয়েছে। অধঃপতিত বাম জমানার অবসানে পরিবর্তিত জমানার পটভূমিকায় মারাত্মক আহত এক মাওবাদী বিপ্লবীকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয়েছে, কিন্তু তার গোপন আশ্রয় পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। পরিবেশ ইত্যাদি আন্দোলনে সক্রিয় এবং বর্তমান চলমান সশস্ত্র লড়াইয়ের সমর্থক সত্তরের দশকের আন্দোলনের এক নেত্রী তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে দেশ-বিদেশে লেখায় ও বক্তৃতায় আগুন-ঝরানো এক বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সমর্থকের বাড়িতে। তার এই ঝুঁকি নিতে প্রচণ্ড আপত্তি থাকলেও, বিপ্লব সম্পর্কে রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন তার তরুণী স্ত্রী তৃণার অতি আগ্রহে বাধ্য হয় সেই আহত বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেলে-আসা টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে বিগত কয়েক দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার এক চলমান ছবি। মধ্যবিত্তের বিপ্লবীয়ানার প্রকৃত ছবিটি জীবন্তভাবে মূর্ত হয় কফিহাউসের কয়েকটি দৃশ্যে, যেখানকার অনেকগুলি মুখই যেন ভীষণ চেনা চেনা লাগে দর্শকদের। এদিকে একদিকে স্বামীর উদ্‌ঘাটিত ভণ্ডামিতে রচিত দূরত্ব (কিষেনজির মৃত্যুর খবর আসার দৃশ্যে যা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে), অন্যদিকে বাড়িতে আশ্রয়-নেওয়া বিপ্লবীর সান্নিধ্য ও তার সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি গড়ে-ওঠা শ্রদ্ধার ও সমভাবনার মানসিকতা তৃণার গতানুগতিক জীবনকে অনেকটাই তছনছ করে দেয়। সে সন্তানসম্ভবা হয়, কিন্তু কে তার অনাগত সন্তানের পিতা সেটা দর্শকদের অজানাই থেকে যায়। ঠিক যেমন অজানা থেকে যায় কী হবে সেই সংশয়ে আকীর্ণ বিপ্লবীর ভবিষ্যৎ? কেননা তার চেতনাতেও ধরা পড়ে সুস্পষ্ট ঝড়ের পূর্বাভাস, তার ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ততা, গণআন্দোলন-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিহত্যার সশস্ত্র পদ্ধতি নিয়ে সংশয়, চিরায়ত মার্কসবাদী রচনার অধ্যয়ন তো বটেই, পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতিতে জনগণকে সমবেত ও সক্রিয় করার ব্যাপারে গান্ধীর অপরিসীম সাফল্য থেকেও শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। এ সব কিছুর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তার নতুন পথের অন্বেষণের আর্তি। সব মিলিয়ে সমকালের অসম্ভব রকমের জীবন্ত এক প্রতিচ্ছবি বিবেকী দর্শকদের ভাবতে বাধ্য করে, বাধ্য করে সব কিছুর নতুন করে মূল্যায়ন করতে। নাটকটিতে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই অনেক রকম ত্রুটির তালিকা বানানো যায়, কিন্তু সে সবকে ছাপিয়ে যায় শুধু রূপকের মাধ্যমে জীবনজিজ্ঞাসা তুলে ধরা গতানুগতিক নাটকসমূহের পটভূমিকায় সরাসরি জীবনকে তুলে ধরার ব্যতিক্রমী সৎসাহস।

নাটকের পরিচালনা (অভিজিৎ করগুপ্ত), আবহ সঙ্গীত, অভিনয় (বিশেষত তৃণার ভূমিকায় নিবেদিতা করগুপ্ত) সব কিছুই ভালো। তবু সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটু প্রফেশন্যালিজমের অভাব। সত্যি কথা বলতে কি, অন্যের কথা জানি না, প্রফেশন্যালিজমের চূড়ান্ত দক্ষতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত আমার মতো দর্শকের কাছে এটাই কিন্তু নাটকটির অতিরিক্ত প্লাস-পয়েন্ট।